আত্মসমর্পণের সাক্ষী

সিদ্দিক সালিক

অনুবাদ

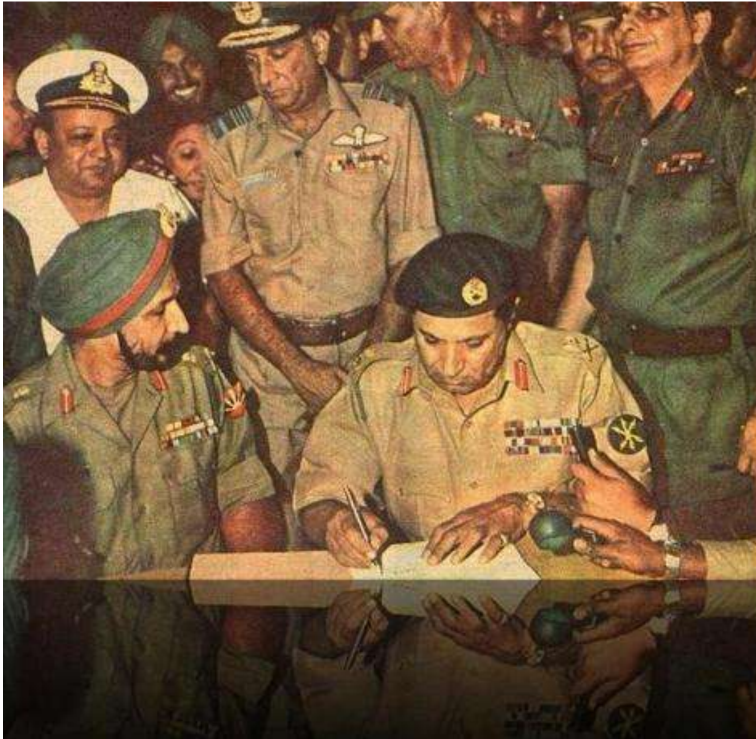
দারুচিনি লবঙ্গ



আত্মসমর্পণের সাক্ষী

সিদ্দিক সালিক

(ভূমিকা)





মূল বইটি লেখক উৎসর্গ করেছেন সংযুক্ত পাকিস্তানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।



মুক্তিযুদ্ধ



আর্কাইভ



সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়া যুদ্ধের তান্ডবে ফেটে পড়েছিল। ঘটনাবহুল এই বছরটায় সিদ্দিক সালিক ঢাকায় ছিলেন, একজন অদ্বিতীয় পর্যবেক্ষণকারীর সুযোগ পেয়ে এবং একটি রাজনৈতিক ও মানবিক নাটকের অংশগ্রহণকারী হিসেবে যার কাহিনী শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গড়ায় আর বাংলাদেশ নামে একটা দেশের জন্ম হয়। দুই বছরের যুদ্ধবন্দীকালীন সময়ে, তিনি এই বিশাল নাটকের পেছনের সত্যতা যাচাই ও বিচার করার আর জটিল খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তিনি নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল, আবেগহীনভাবে সত্যগুলো দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনিই প্রথম আমাদের সামনে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ের সঠিক চিত্রগুলো একসাথে করে যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানের এক নিভৃত গ্রামে জন্মগ্রহণকারী সিদ্দিক সালিক, লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। প্রভাষক হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করলেও অল্প সময়ের মধ্যে সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে গিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭০-এর জানুয়ারীতে দায়িত্বপালনের অংশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আসেন যা ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ ঢাকা পতনের সাথে শেষ হয়। ভারতে দুই বছর যুদ্ধবন্দী হিসেবে থাকার পর সিদ্দিক সালিক পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পুনরায় যোগ দেন। ১৯৮৮ সালে বাহাওয়ালপুরের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।



ভূমিকা

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১। চারদিন আগে ঢাকার পতন হয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমান আমাদের চরম লজ্জার দুই প্রতীক - লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী আর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে কোলকাতায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে নিয়ে যাবার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছে। তাদের সাথে যাবার জন্য আর তাদের কলঙ্কের ভাগীদার হবার জন্য তাদের অধীনের স্টাফ অফিসাররাও ছিলেন। ক্যারিব্যু বিমানটির অন্ধকার গহ্বরে সবাই এসে গাদাগাদি করে বসলেন। দুর্বল যন্ত্রটা আর্তনাদ করে উঠল, কিছুক্ষণ গর্জন করল, আর অবশেষে উড়তে শুরু করল। ওটাতে আমিও ছিলাম।

দুই বছর আগে, পিআইএ-র একটি বোয়িং বিমান আমাকে ঠিক এই পিচঢালা জায়গাতেই নামিয়ে দিয়েছিল। সময়টা তখন একেবারেই অন্যরকম ছিল। সকালের উজ্জ্বল রোদের আলোয় বিমানবন্দরটি সেদিন ঝলমলে এক রূপ ধারণ করেছিল। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা তখন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নির্ধারিত গণতান্ত্রিক গন্তব্যের লক্ষ্যে দেশটিকে পরিচালনা করতে ব্যস্ত ছিল, যা তিনি ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ জাতির প্রতি তার প্রথম বক্তব্যেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

সেদিন যাদের হাতে লাগাম ছিল, আজ তাদের হাতে শৃঙ্খল। বিরাট এক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেশ আর পারেনি। ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ করা ছিল বেদনাদায়ক; কিন্তু ভুলে যাওয়া অসম্ভব। এই সুতীব্র যন্ত্রণার সময়ে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখব। স্মৃতিচারণ করার



সময় আমি ব্যক্তির চেয়ে ঘটনার উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছি। শয়তানকে দরবেশ থেকে আলাদা করার দায়িত্ব আমি ইতিহাসের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার কিংবা পাকিস্তান সরকার, কেউই আমাকে ১৯৭১ এর সঙ্কটকালের সরকারী নথিপত্র দেখবার অনুমতি দেয়নি, আমি এতে বরং খুশিই হয়েছি। এতে করে আমি ঢাকা পতনের ব্যাপারে আমার নিজস্ব ধারণার উপর অটল থাকতে পেরেছি। (শেষ অংশে সরকারী নথিপত্রের সেগুলোই দেয়া হয়েছে যেগুলো ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর পর ঢাকায় এমন কি ভারতীয়দের জন্যও সহজলভ্য ছিল।) যে কোন সরকারী তথ্য যা আমার সিদ্ধান্তকে অনুপূরণ, সংশোধন বা বিরোধিতা করবে, আমি তাকে স্বাগত জানাই।

সিদ্দিক সালিক
১৪ই আগস্ট, ১৯৭৬।



অনুবাদকের কথা

হঠাৎ করেই একজনের কাছে সিদ্দিক সালিকের Witness to Surrender বইটা পাই। পরে ছোট ভাইয়ের জন্য বইটা কিনে ফেলি। কিন্তু ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়ার আগে বইটা নিজেই আবারও পড়তে বসি। পড়ার পর থেকেই এর অনুবাদ খুঁজছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু প্রকাশিত হয়নি। ওদিকে যার জন্য বইটা কেনা সেও চাইছিল যেন আমি বইটার বক্তব্য ব্যখ্যা করে জানাই। ব্যাখ্যা করা কঠিন ব্যাপার, তাই নিজেই অনুবাদ করার একটা অপচেষ্টা করছি। উদ্যোগটা হয়ত নিজের জন্যই, কিন্তু জানা দরকার সবার। যার উৎসাহে অনুবাদের কাজে হাত দিলাম , তাকেই উৎসর্গ করছি - আমার ছোট ভাই অনন্ত দিগন্ত।

দারুচিনি লবঙ্গ



সূচীপত্র





আত্মসমর্পণের সাক্ষী

সিদ্দিক সালিক

১ম অংশ: রাজনৈতিক

১ম অধ্যায়: বাস্তবতা ও শংকা

পাকিস্তানের দ্বিতীয় মার্শাল ল-এর প্রথম বর্ষপূর্তি চলছিল। (২৬শে মার্চ, ১৯৬৯-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান দেশব্যাপি মার্শাল ল জারি করেন। বিস্তারিত ও রাজনৈতিক নেপথ্যকাহিনী জানতে পরিশিষ্ট-১-এ ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ দেখুন।) শেখ মুজিবর রহমান একটি নির্বাচনী র‍্যালিতে যোগ দিতে পূর্ব পাকিস্তানের একটি মফস্বল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। তার ভটভটি গাড়ির পেছনের সিটে তার সাথে ছিলেন একজন অবাঙালী সাংবাদিক যিনি তার নির্বাচনী কর্মকাণ্ডগুলো নিয়ে প্রতিবেদন করছিলেন। তিনি কিছু সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর শেখ মুজিবকে উসকে দিয়ে চুপি চুপি তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই অমূল্য সংগ্রহটি তার বন্ধুদের সামনে পরিবেশন করেন। আমাকেও শুনিয়েছিলেন তিনি এটি। মুজিবের উচ্চ কণ্ঠস্বরে পরিষ্কারভাবেই স্বাধীনতার চেতনা ঝরে পড়ছিল। তিনি বলছিলেন: "যে কোন ভাবেই হোক, আইয়ুব খান আমাকে জনপ্রিয়তার এমন এক উচ্চতায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে কেউ আমার কোন কথায় 'না' বলতে পারে না। এমন কি ইয়াহিয়া খানও আমার দাবী প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।"

তার দাবীগুলো কী ছিল? ইয়াহিয়া খানের গোয়েন্দা বিভাগের দ্বারা ধারণকৃত আরও একটি টেপে এর কিছু আভাস পাওয়া যায়। বিষয়টি ছিল ৩০শে মার্চ ১৯৭০-এ সরকার কর্তৃক



নির্ধারিত 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এলএফও) নিয়ে। বাস্তবে এটি ছিল একটি সংবিধানের খসড়া যেখানে মুজিবের ছয় দফা বাস্তবায়নের ক্ষমতা ক্ষুন্ন করা হয়েছিল। তিনি তার জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সাথে এলএফও-এর ব্যাপারে তার মতামত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এটি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে তার কথাগুলো টেপ করা হচ্ছে ইয়াহিয়াকে শোনানোর জন্য। রেকর্ডে মুজিব বলেছিলেন: "আমার লক্ষ্য হল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্র আমি এলএফও ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলব। নির্বাচন হয়ে গেলে আর কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।" এটা যখন ইয়াহিয়াকে শোনানো হয়, তিনি বলেছিলেন, "সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তো আমি তাকে দেখে নিব।" (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ-৯৮)

১৯৭০-এর জানুয়ারীতে আমি হালকা মালপত্র নিয়ে ঢাকায় গেলাম, কিন্তু আমার মনের ভিতর চিন্তার ভার বয়ে নিচ্ছিলাম। আমার আশংকা তখন সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসন নিয়ে ছিল না; বরং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে হচ্ছিল। অন্য সব পশ্চিম পাকিস্তানীদের মত আমাকেও এমনটাই বলা হয়েছিল যে মুজিবর রহমানের ছয় দফা শুধুমাত্র রাষ্ট্র থেকে আলাদা হবার একটা গোপন পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই না, আর ১৯৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিল এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটা বাস্তব পদক্ষেপ। এই দুই অভিযোগের কোনটারই পেছনের সত্যিটা আমার জানা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম বাঙালী দেশবাসীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই এই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঢাকায় আসতে আসতে আমি ২৫,০০০ সৈন্য দিয়ে তৈরী সেনাবাহিনীর কথা ভাবছিলাম যাদের সাথে আমি যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম ১৮০০ কিলোমিটার ভারতীয় এলাকার কথা, যার উপর দিয়ে আমি যাচ্ছি। ভারত যদি কখনও পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমাদের এই বিচ্ছিন্ন গ্যারিসন কি সেই আগ্রাসনের মোকাবিলা করতে পারবে? একজন বিশ্বস্ত পাকিস্তানী হিসেবে এ ধরণের চিন্তা আমার জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। বরং কিছু মধুর স্মৃতিচারণ করে আমি নিজেকে আশ্বস্ত করলাম এই ভেবে: যে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ঢাকাতেই হয়েছে আর ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন একজন বাঙালী। সেহেতু পাকিস্তানের উপর বিপদের কোন আশংকা নেই!



এখন তেজগাঁও বিমানবন্দরে আমি অবতরণ করলাম। বিমানবন্দরটি সবুজ মাঠ আর রুপালী মেঘের চাদরে মোড়া ছিল। মেঘ অনেক থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সূর্যের হাসিকে তারা ঢেকে দেয়নি। আবহাওয়াটা ছিল খুবই কোমল আর আরামদায়ক। একই বিমানে কয়েকজন মার্শাল ল অফিসারও এসে পৌঁছেছিলেন। তারা ভিআইপি লাউঞ্জে গিয়ে বসলেন আর তাদের মালপত্র গভর্নমেন্ট হাউজের রূপালী চিহ্ন খচিত গাড়ীতে তোলা হল। বাঙালী কুলিরা গাড়ি বারান্দায় এই কাজটা দ্রুতই করে ফেলল আর অফিসাররা গাড়িতে করে ফুরফুরে মেজাজে প্রস্থান করলেন। গাড়ীর পেছনে উড়তে থাকা ধূলোগুলো এক সময় থিতিয়ে এল।

আমি ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য একটা সুবিধাজনক বাহনের অপেক্ষায় বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। (পিআইএ-র ট্রাইডেন্ট বিমান যেটায় করে রাওয়ালপিন্ডি থেকে আসছিলাম সেটি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমাকে লাহোরে নামিয়ে দিয়েছিল। আমি বিমান পরিবর্তন করে একটি বোয়িং-এ উঠেছিলাম কিন্তু ঢাকায় আমার বন্ধুদের তা জানাতে পারিনি।) অবশেষে একটি সামরিক গাড়ি আমাকে লিফট দিতে চাইল। ড্রাইভার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক বাঙালী ছেলেকে আমার স্যুটকেস জীপে তুলে দিতে বলল। শতচ্ছিন্ন কাপড় পরা ছেলেটি এমন আদেশ মোটেই পছন্দ করল না, কিন্তু তার 'মালিক' এর দিকে আক্রোশপূর্ণ একটা দৃষ্টি দিয়ে আদেশ মান্য করল। তার সাদা চোখগুলো আমার দিকেও ঘুরেছিল, কালো গায়ের রঙের মধ্যে সেই দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ম হয়ে ফুটেছিল। আমি তাকে কয়েকটা পয়সা দিতে গেলাম কিন্তু ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল, "এই হারামজাদাগুলোকে এত প্রশ্রয় দিবেন না।" ছেলেটি আবারও একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল। আমি জীপে চড়ে বসে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা দিলাম। টার্মিনাল ভবনে জাতীয় পতাকা তার চাঁদ-তারা প্রতীক নিয়ে মাথা উঁচু করে পত পত করে উড়তে থাকল।

যারা বিমানবন্দরে আমাকে বরণ করতে আসতে পারেননি তারা সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে চলে এলেন। আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা বিমানবন্দরে আমার যে অসুবিধা হয়েছিল তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। যখন কি না পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠছে এমন এক সময় পূর্ব পাকিস্তানে আমার পদায়ন নিয়েও তারা সমবেদনা ব্যক্ত করলেন। কয়েকজন তো আমাকে সর্বশেষ পরিস্থিতির ব্যাপারে 'জ্ঞানদান শুরু করে' উপদেশ বিলাতে থাকলেন: "বাস্তবে এখানে মার্শাল ল বলে কিছু নেই"; "ভারী গৃহস্থালী জিনিসপত্র কিনতে যেও না, কখন কিভাবে যে তোমাকে তল্পি-তল্পা গুটাতে হবে কেউ বলতে পারে না"; "তোমার



অ্যাকাউন্ট শহরের কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্থানান্তর না করে ন্যাশনাল ব্যাংকের ক্যান্টনমেন্ট শাখায় করো"; "তোমার পূর্বতনের বরাদ্দকৃত বাসাটাই ধরে রাখতে চেষ্টা করো, সেটা হবে বাক্সের মত নিরাপদ, কেউ সেখানে বোমা ফেলতে পারবে না।"

আমার বাড়িতে কোন বাঙালী কেন বোমা ফেলতে যাবে? আমি মনে করেছিলাম আমার প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষগুলোর ভীতির বেশির ভাগই তাদের মনপ্রসূত। আমি তো সেরকম আচমকা আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখলাম না। আমি আমার অধীন সেনাসদস্যদের আর আমার পরিবারকে তার করে দিলাম যেন তারা আমার এখানে চলে আসে, যদিও আমার বন্ধুরা এটাকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পরিবার চলে এল আর বাক্সের মত বাড়িতে অবস্থান গেড়ে নিল। একটু পরেই এক দঙ্গল বাঙালী আমাদের বাড়িতে এসে চড়াও হল। তবে তারা কোন বোমা নিক্ষেপকারী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল না। তারা ছিল চাকুরী প্রার্থী আয়া (মহিলা গৃহকর্মী), যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাড়িতে কাজ করতে আগ্রহী ছিল, ঠিক যেমন স্বাধীনতার আগে ভারতীয় গৃহকর্মীরা বৃটিশদের বাড়িতে আশ্রয় খুঁজত। পরদিন জানতে পারলাম আমার স্ত্রী দু'জন আয়া রেখেছেন। এটা খুবই অমিতব্যয়ীর মত কাজ হয়েছে, কিন্তু তিনি বোঝালেন যে রাওয়ালপিন্ডীতে একজন গৃহকর্মী রাখতে যে খরচ, এই দু'জনের পেছনে মোট খরচ তার চেয়ে কম যাবে।

ঢাকায় আমার স্ত্রী আসার পর আমি ঢাকা থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে টঙ্গীতে পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে কিছু তৈজসপত্রের অর্ডার দিলাম। যাবার পথে, বাস্তবের এক নতুন চিত্র আমার সামনে উদয় হল। দারিদ্র্যের এমন সব দৃশ্য আমি দেখলাম যে আয়াদের চাকুরীর এই বিপুল চাহিদার কারণটা বুঝলাম। মহিলাদের লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্য এক টুকরো কাপড়ও বলতে গেলে নেই। পুরুষরা সব খাটো আর অভুক্ত। চলন্ত গাড়িতে বসেও তাদের পাতলা কালো চামড়ার নিচে পাঁজরের হাড়গুলো গোণা যায়। বাচ্চাদের অবস্থা আরও করুণ। তাদের কারুর কারুর কোমরে বাঁধা ঘুনসি টুংটুং করে ঝুলছে। এটাই তাদের একমাত্র খেলনা। যখনই গাড়ি থামিয়েছি, ভিক্ষুকরা মাছির মত আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমি এটাই বুঝলাম যে বাংলার গরীবেরা পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে গরীব মানুষটির চেয়েও গরীব। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের যে অভিযোগ, তার অর্থগুলো আমি বুঝতে শুরু করলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হল।



আমাকে জ্ঞানদানকারী সেই বন্ধুদের উপদেশের কথা আবার মনে পড়ল। হ্যাঁ, এই ক্ষুধার্ত জনতা যদি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, তবে তারা দোকানপাট লুট করতে পারে, ক্যান্টনমেন্টে প্রচন্ড আক্রমণ চালাতে পারে, এমন কি আমার বাড়িতে বোমাও ফেলতে পারে।

কারখানার সদর দরজায় পাজামা-কোট পরা একজন লম্বা সুঠামদেহী লোকের সাথে দেখা হল। তিনি ছিলেন জনাব নিয়াজী, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী, কারখানার নিরাপত্তা সহকারী হিসেবে নিয়োজিত। আমাদের দুজনের মধ্যকার মিলই ছিল আমাদের একমাত্র পরিচয়। তিনি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে আস্থার সাথে কথা শুরু করলেন। আমি যখন তাকে আমার কারখানায় আসার উদ্দেশ্যের কথা বললাম, তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "দয়া করে আপনি নিজে অর্ডার দিবেন না। এখানকার বাঙালী শ্রমিকেরা পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের প্রতি খুবই শত্রুভাবাপন্ন। তারা ইচ্ছা করে তাদের অর্ডারের জিনিস নষ্ট করে দিবে। ..... এটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

ঢাকা থেকে ফিরে আমি পাঞ্জাবের এক পুরনো বন্ধু, ক্যাপ্টেন চৌধুরীর কাছে আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। আমার দেখা চরম দারিদ্র্যের বর্ণনায় সে সামান্যই তাড়িত হল। বরঞ্চ, সে বাঙালীদের অলস স্বভাবের জন্য তাদের গালি দেয়া শুরু করল। "তারা শুধু একটা ব্যাপারেই সক্রিয়, সেটা হল পরিবার পরিকল্পনার উপদেশ অমান্য করা। ..... আমি তোমাকে এই দৃশ্যের উল্টোপিঠটা দেখানোর জন্য শহরে (ঢাকায়) নিয়ে যাব।"

প্রথম সুযোগেই সে আমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে চমৎকার সব স্থাপনা ঘুরে দেখাল - স্টেট ব্যাংক, গভর্নমেন্ট হাউজ, হাইকোর্ট, ইঞ্জিনিয়ারস ইনস্টিটিউট, রেল স্টেশন, রেডিও পাকিস্তান, প্রাদেশিক সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বায়তুল মুকাররম, স্টেডিয়াম, নিউ মার্কেট আর আরও অনেক ব্যক্তি মালিকানার বাড়ি। সে রাগে গজ গজ করতে করতে বলল, "এখানে কিছুই ছিল না। ১৯৪৭-এর পর প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় আর টর্নেডো হওয়া সত্ত্বেও এগুলো তৈরী হয়েছে। কাউকে তো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আর বিনিয়োগের পরিমাণটা খুঁজে বের করতেই হবে যাতে অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে মুজিবের দাবীকে উড়িয়ে দেয়া যায়।"

আমি চিন্তা করলাম, বাস্তব যদি মুজিবের বিপক্ষেই যায়, তাহলে তিনি জনগণকে তার দিকে টেনে নিলেন কিভাবে? আবার, ভাসানী যেখানে সমান্তরালভাবে একটা দলের



নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর ডানপন্থীরা দুই অংশের মধ্যে ইসলামী বন্ধনের উপর জোর দিচ্ছেন, সেখানে মুজিব কিভাবে পথ বের করে নিচ্ছেন? নির্বাচনই বলে দিবে যে তিনি সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন উপভোগ করছেন কি না।

১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়ার পর নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বামপন্থী ছাত্ররা মধ্যরাতে মশাল মিছিলের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নিল, সেই সাথে লাল বিপ্লবের পক্ষে স্লোগান দিয়ে গেল। পরদিন তাদের বিরোধী দল, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন) গণ সমাবেশের আয়োজন করে ঘোষণা দিল: "ছয় দফাই হল স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ।" অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো যারা জামায়াত-ই-ইসলামীদের মত ডানপন্থীদের ছত্রছায়ায় ছিল বলে জানা যায়, তারা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য কিছুই করল না।

নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়ার সাথে সাথে কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি), পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ (পিএনএল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জামিয়াতুল উলামায়ে ইসলামের মত কিছু দল আর মুসলিম লীগের অন্তর্গত কিছু ক্ষুদ্র দল খুড়িয়ে খুড়িয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাদের পেশী-প্রদর্শন শুধুমাত্র তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করেছে। তারা কোনভাবেই হৃদয়গ্রাহী ছিল না।

শীঘ্রই প্রদেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করল। ১১ই জানুয়ারী আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে তাদের সভা করল, এক সপ্তাহ পর জামায়াত-ই-ইসলামী এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে, এবং ১৯শে জানুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী দল) টাঙ্গাইলের কাছে সন্তোষে এক কৃষক র‍্যালীর আয়োজন করে।

যে কোন দিক দিয়ে বিচার করলে আওয়ামী লীগের সভা ছিল সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। সুন্দরভাবে আয়োজিত এই সভায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। সাংবাদিকদের ভাষায় এটি ছিল এক 'ম্যামথ' সভা। চিন্তা করে দেখলে, এ ছিল এক অবিস্মরণীয় সভা। শেখ মুজিবর রহমান তার এই প্রথম নির্বাচনী ভাষণে বলেছিলেন যে ১৯৫৬-এর সংবিধানে সমতা মেনে নিয়ে বাঙালীরা ভুল করেছিল। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০।) তিনি আরও বললেন যে কেউ যদি বাংলাদেশের উপর এটি জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়, তবে তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবেন।



প্রয়াত তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়ার (ঢাকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক, ইত্তেফাকের মালিক ও সম্পাদক। তিনি সোহরাওয়ার্দির একজন সহযোগী ছিলেন। ১৯৬৯-এর ৩০শে মে তিনি মারা যান) সুযোগ্য পুত্র ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন পরবর্তীতে আমাকে বলেছিলেন যে তার পিতার জীবিতাবস্থায় ১৯৫৬-এর সংবিধান বাঙালীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব ছিল, "কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।" জনাব হোসেনের এই দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি যখন বয়স্ক প্রহরীদের সাথে কথা বললাম, তারা বলল, "হ্যাঁ, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মানিক মিয়াই ছিল মুজিবকে সংযতভাবে প্রভাবিত করার মত একমাত্র ব্যক্তি।" (পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও মুজিবের রাজনৈতিক জন্মদাতা জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে বৈরুতের এক হোটেলে মৃত পাওয়া যায়।)

পরের রোববার, একই ময়দানে জামায়াত-ই-ইসলামী তাদের প্রথম নির্বাচনী সভার আয়োজন করে। জামায়াত এই সভার গুরুত্ব অনুধাবন করে একে পূর্ণ সফল করার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত দাঙ্গায় রূপ নেয়। দুইজন নিহত ও পঞ্চাশজন আহত হয়, তাদের মধ্যে পঁচিশ জন ছিল গুরুতর আহত। দলের আমীর, মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, যিনি বিশেষভাবে এই সভায় যোগদানের জন্য লাহোর থেকে এসেছিলেন, দ্রুত সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দাঙ্গার মধ্য দিয়ে জামায়াত একটি তিরস্কৃত ও অক্ষম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

জামায়াত এই রক্তাক্ত সংঘাতের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে কারণ দাঙ্গা-ক্ষেত্র 'জয় বাংলা' (বাংলাদেশ চিরজীবী হোক) স্লোগানে ভরপুর ছিল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে এই আক্রমণের পেছনে তাদের হাত ছিল না যেহেতু এটি তাদের প্রত্যাশিত ভোট প্রাপ্তির জন্য ক্ষতিকর হবে। দুই পক্ষেই তর্কাতর্কি চলতে থাকল, কিন্তু এই দুই রাজনৈতিক দলের প্রারম্ভিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ছিল খুবই অস্পষ্ট। পুলিশ এ সময় কোথায় ছিল? তারা শৃঙ্খলা রক্ষায় এগিয়ে আসল না কেন?

একজন উচ্চপদস্থ মার্শাল ল অফিসার আমাকে বলেছিলেন যে সভার আগে তিনি জামায়াতের প্রতি সরকারী নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। তাকে বলা হয়, "আমাদের নিজস্ব বন্দোবস্ত করা আছে।" ঐ অফিসারের মনে হয়েছিল যে জামায়াত এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে আওয়ামী লীগ



যদি কারও সহায়তা ছাড়াই সফল সভার আয়োজন করতে পারে, তো তারাও পারবে। শুধুমাত্র দুর্বল দলই সরকারী নিরাপত্তা খোঁজে। যখন আমি এই কথাটা জামায়াতের কাছের একজন সাংবাদিককে বলি, তিনি বলেন, "না, জামায়াত নিরাপত্তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেনি। সরকার তার নির্দলীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরপেক্ষ থেকেছে।"

তৃতীয় বড় ঘটনা, কৃষক র‍্যালী, তুমুল তুর্যধ্বনির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। যদিও এটি এনএপি (ভাসানী) আয়োজন করে, তারা অন্য সব দলকেই আমন্ত্রণ জানায়, যা সামাজিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে। সরকার এই র‍্যালী সফল করার জন্য টাঙ্গাইলে বিশেষ ট্রেন চালু করে এবং ঐ স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে। গভর্নমেন্ট হাউজের কিছু রাজনৈতিক হোমরা-চোমরা ব্যক্তি চেয়েছিলেন এনএপি (ভাসানী) থাকুক আর আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক বিপক্ষ হিসেবে বেড়ে উঠুক।

কোন বিপক্ষীয় দল র‍্যালীতে ঝামেলা করেনি। অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণেই এটি ভেঙে পড়ে। এর একমাত্র প্রাপ্তি ছিল কিছু বিপ্লবী স্লোগানের ধারণা, যেমন - "রক্ত আর আগুন - আগুন আগুন", "ব্যালট না বুলেট - বুলেট, বুলেট।"

এনএপি-র সাধারণ সচিব ত্বোহার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের তীব্র বিরোধীতা জানায় এই মর্মে যে এতে সরকার বদল হবে কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। সত্যিকারের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন শুধুমাত্র লাল বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব বলে ত্বোহা বিশ্বাস করতেন।

এর কিছুদিন পর একটি খবরের কাগজের অফিসে জনাব ত্বোহার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। এনএপি (ভাসানী) থেকে তার সরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন: "আমি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছি কারণ এর কোন প্রাণ নেই। এজন্য আমি বিপ্লবী উদ্দেশ্য নিয়ে এনএপি গঠন করি। এটাও তার মতবিশ্বাস হারিয়েছে। আজ এটা আওয়ামী লীগের মতই অনুজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। ..... নির্বাচনের পর আমি আমার নতুন গন্তব্যের চিত্র আঁকব।"

আরও কিছু রাজনৈতিক দল ছিল, যেমন কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, জামিয়াতুল উলামায়ে ইসলাম আর মুসলিম লীগের তিনটি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এই দল থেকে কেবলমাত্র একজনের কণ্ঠই



শোনা গেছে। তা ছিল জনাব নুরুল আমীনের কণ্ঠ, পিডিপি-র দুর্বল নেতা। তিনি সংযম, সহিষ্ণুতা আর নিরপেক্ষ বিচারের আবেদন করেন। কিন্তু এনএপি আর আওয়ামী লীগের রুক্ষ দাবী-দাওয়ার তোড়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বরটি দুর্বল আর অপাংক্তেয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক মূল্যবোধের খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। জাতীয় সংহতির ক্ষতিকারক স্লোগানগুলোই আজকের দিনে আদর্শ হয়ে উঠছিল। কিন্তু কে এই প্রবণতাকে ঠেকাতে পারবে? যাদের ঠেকানোর কথা ছিল তারা হয় এই ব্যাপারটা জানতই না অথবা জেনেও ইচ্ছা করে এতে কান দেয়নি।

রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্রটা বুঝতে পারার পর আমি অর্থনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম যারা একটা দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আগে অর্থনৈতিক দিকটার কথা কিছু বলি।

আমি যখন বাঙালী ব্যবসায়ী রহমান, আহমেদ, ভুঁইয়া - এদের সাথে কথা বলি তারা দৃঢ়ভাবে এই ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করেন যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত অর্থ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগপন্থী প্রকাশনাগুলো অভিযোগ করে যে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে মোট রাজস্বের ৬০ শতাংশ আয় হচ্ছে সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র ২৫ শতাংশ, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান মোট রাজস্বের ৪০ শতাংশ আয় করেও ৭৫ শতাংশ ভোগ করছে। এর পাশাপাশি তারা 'অযৌক্তিক ও অসুবিধাজনক' বাণিজ্য ব্যবস্থার কথাও সবিস্তারে বর্ণনা করেন যার 'ভিত্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে'। তারা বলেন, "একটা জাহাজে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন পণ্য আনা হলে (ধরা যাক - রাবার) যেটা আরও পূর্ব থেকে আসছে - আমাদের বগলের তলা দিয়ে সেটা যাচ্ছে করাচীতে, সেখান থেকে আবার জাহাজে করে মালগুলো চট্টগ্রামে আনা হচ্ছে। এর ফলে অতিরিক্ত চালানের খরচই শুধু দিতে হচ্ছে না, অতিরিক্ত সময়ও নষ্ট হচ্ছে।" স্বদেশী পণ্যের ক্ষেত্রেও তারা বলেন, "সেনাবাহিনীর ছদ্ম আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত পাটের জালগুলোর কথাই ধরুন। পাট এবং পাটকল হল এখানে। কিন্তু মালগুলো অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানে নেয়া লাগে, পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত সেনাবাহিনী ইউনিটের জন্য বরাদ্দের আগে সেগুলো রঙ করার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন কিছুই ব্যবহারযোগ্য না যতক্ষণ না তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের পবিত্র স্পর্শ লাগে। এটা যেমন বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই রাজনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের ক্ষেত্রেও।"



বুদ্ধিজীবীদের শিবিরেও পরিস্থিতি একই রকম কঠোর ছিল। ঢাকায় যাদের সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনের বাঙালী রেসিডেন্ট পরিচালক। তিনি আমাকে লাইব্রেরী ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। শিল্প অংশের সামনে এসে একটা সুন্দর করে বাঁধানো বই টেনে বের করলেন, এরপর রাগত স্বরে বললেন, "দেখ, আমাদের সদর দপ্তর (রাওয়ালপিন্ডি) থেকে এই জিনিস পাঠিয়েছে। জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ আর কি! তোমরা কোনদিন কোন বাঙালী কবির লেখা এমন শৈল্পিকভাবে ছাপিয়েছ? তার রাগের কারণটা ছিল বিশ্বখ্যাত উর্দু কবি গালিবের বিরল এক সৃষ্টির কিছু নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত বই 'মুরাক্কা-ই-চুঘতাই'। তিনি এরপর রাজনৈতিক অংশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই যে, এখানে পুরো শেলফ জুড়ে আছে শুধু তোমাদের কায়েদ-এ-আজমের উপর লেখা বই।" আমি তার তোমাদের শব্দটা বলার ভঙ্গীটা খেয়াল করলাম, এরপর চলে এলাম।

এর কিছুদিন পর আমি ফিল্ম সেন্সরশিপ বোর্ডের এক সভায় যোগ দিলাম। সভাটি ডাকা হয়েছিল আমাদের ছবিতে নকলের প্রবণতা কিভাবে নিরুৎসাহিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। চলচ্চিত্র লেখক, পরিচালক ও প্রযোজকসহ ঢাকা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি কর্তৃক জাতীয় সম্মান ও পরিচয় রক্ষার্থে নকলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ভাষণের পর একজন প্রতিথযশা বাঙালী লেখক যা বলে তর্ক তুললেন তা হল:

"১৯৬৫ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সমস্যাগুলো নিয়ে একটা উচ্চ স্তরের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, এই ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে সরকার কখনই এর বিষয়বস্তুর ঐতিহ্যগত উৎসের মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না। আমি এই প্রস্তাবই দিব যেন মার্শাল ল সরকার তার পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং কোলকাতার প্রতি আমাদের দরজা খোলা রাখে। যত যাই হোক, আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক কাবা-র প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারি না।"

সভার সভাপতি, যিনি সন্দেহজনক বিশ্বস্ততার জন্য খ্যাত ছিলেন, আমার দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে এই আবেদন মঞ্জুর করেন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাঙালীদের সাথে এই প্রাথমিক সাক্ষাতের পর আমার প্রথম ধারণাটা এমনই হল যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ মানসিক মতভেদ রয়েছে। এর কি সেতুবন্ধন



হবে? নাকি এর ফলে দুই অংশের মধ্যে পুরোপুরি ভাঙন হয়ে যাবে? আমার সাথে সাথে আবারও সেই ২৫০০০ সৈন্যের কথা মনে পড়ে গেল যারা আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত - আমাদের জাতির সংহতি রক্ষার শেষ ভরসা।



২য় অধ্যায়: দুই প্রান্তের জোড়ায় টানাপোড়েন

১৯৭০-এর শুরুতেই যদি রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী আর অন্যান্যরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বাঙালী ফৌজ কি এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে পারে? অভ্যন্তরীণ কোন্দল দমন করার জন্য তাদের উপর কি ভরসা করা যেতে পারে? ভারতীয় আগ্রাসনের ব্যাপারে তারা কেমন প্রতিক্রিয়া করবে? মানসিক ও আবেগের দিক দিয়ে কি তারা সেনাবাহিনীর বাকী অংশের সাথে একাত্ম ছিল?

এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হওয়া আমি প্রথম ব্যক্তি ছিলাম না। এগুলো লোকজনকে আগেও তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এই আশংকায় ভুগছেন যে ১৯৬৯-এর নভেম্বরে স্থানীয়-অস্থানীয় দাঙ্গার সময় যে বাঙালী ফৌজকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল, তারা তা পালন করতে ইতস্তত করছিল। এজন্য তিনি জেনারেল হেডকোয়ার্টারে (জিএইচকিউ) সুপারিশ করেছিলেন যাতে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের শক্তি বাড়ানো হয় আর বাঙালী ব্যাটেলিয়নগুলোকে অন্যান্য পদাতিক রেজিমেন্টগুলিতে ভাগ করে দেয়া হয়। জেনারেল হেডকোয়ার্টার দুটো সুপারিশই উপেক্ষা করেছিল কারণ এগুলো ১৯৬৯-এর ২৮শে জুলাইয়ে প্রচারিত জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির দেয়া প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী ছিল যেখানে বলা হয়েছিল, "প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের কোটা দ্বিগুণ করা হবে।" রাষ্ট্রপতি এ-ও ঘোষণা করেছিলেন যে এটা হল বাঙালীদের উৎপীড়নের ক্ষতিপূরণের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

রাষ্ট্রপতি যিনি এই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফও ছিলেন। হয় তিনি তার ফৌজদের মানসিক অবস্থার কথা জানতেন না, অথবা তিনি কোন রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছা করে অন্য ধারায় এগুতে চেয়েছিলেন।

মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন যেহেতু জানতেন তার সুপারিশগুলো জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ছিল, তিনি এগুলো কার্যকর করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। এক সুন্দর সকালে জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে তার নামে এক গোপনীয় চিঠি এল। গভীর আশা নিয়ে তিনি চিঠিটা খুললেন যে তার সুপারিশগুলো হয়ত অনুমোদিত হয়েছে। বরং এতে



কমান্ডার-ইন-চিফের আদেশ ছিল যেন আরও দুইটা ব্যাটেলিয়ন বাড়ানো হয় শুধুমাত্র বাঙালী ফৌজ দিয়ে। (চট্টগ্রামে ৮ ইস্ট বেঙ্গল আর ঢাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল বাড়াতে হবে। জিএইচকিউ-এর কাছে অনুরোধ করা হয় যেন অন্তত এই বৃদ্ধির স্থান পরিবর্তন করা হয় কারণ ঢাকা আর চট্টগ্রাম ছিল প্রধান শহর - যথাক্রমে বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর। কিন্তু এই অনুরোধে কোন ফল হয়নি।) ইতোমধ্যে এরকম সাতটি ব্যাটেলিয়ন ছিল যার চারটিই নিযুক্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং খুবই মনক্ষুন্ন হলেন। এই নতুন আদেশের কার্যকারিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে তিনি রাওয়ালপিন্ডি গেলেন। জিএইচকিউ-কে তিনি বললেন, "শেষ পর্যন্ত বাঙালী সেনাবাহিনী তৈরী করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শুধুমাত্র ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নই বৃদ্ধি করা হোক, কিন্তু যদি সেনাবাহিনী ও দেশের ঐক্য বজায় রাখতে চান - তাহলে দয়া করে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নগুলোকে সেনাবাহিনীর বাকী অংশের সাথে এক করে দিন।"

রাষ্ট্রপতির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনা তাকে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য করছে, যেখানে তার সামনে বসা লোকটি তাকে ইতোমধ্যে গঠিত বাঙালী ব্যাটেলিয়নগুলোকে ক্রমেই ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বহু অনিশ্চিত কমান্ডাররা যা করতেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খানও তেমনি আপোষের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলেন। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে বাঙালী ফৌজের ২৫ শতাংশকে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ দিলেন। এতে যদি বাঙালী ফৌজ অথবা বাঙালী রাজনীতিবিদদের দিক থেকে কোন ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব না হয়, তাহলে এই নীতি কাংক্ষিতরূপে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যাবে। এদিকে নতুন ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধিও চলতে থাকবে।

১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ফোর্ট্রেস স্টেডিয়ামে (ঢাকা শহর) 'অভিষেক কুচকাওয়াজ' অনুষ্ঠিত হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাথে বাঙালী ফৌজের একটি কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ততা চিহ্নিত করা, যেখানে ইতোমধ্যেই সমান সংখ্যক পাঠান ও পাঞ্জাবী সেনারা ছিল। সম্পূর্ণভাবে জনগণের সামনে পরিবেশন করা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজটি সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হল। কিন্তু জিওসি মনে মনে দোয়া করে যাচ্ছিলেন,



কারণ তিনি আশংকা করছিলেন বাঙালীরা যদি নতুন পরিবেশে যে কোন একটা বিষয় নিয়ে বিদ্রোহ করে বসে (যেমন- খাবারের তালিকায় ভাতের বদলে রুটির অগ্রাধিকার), তাহলে এই পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে বুমেরাং হয়ে আঘাত হানবে।

যা হোক, বাঙালী ফৌজ স্বাভাবিক পরিবর্তনের পালায় পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ১৯ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাথে ভালোমতই মিশে যেতে পেরেছিল আর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় একত্রে দায়িত্ব পালন করেছিল। এই ব্যাপারটা জিওসি-কে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তার কৌশলের প্রতি তার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাকে এ ব্যাপারটায় ধীরে-সুস্থে আগানোর নির্দেশ দিলেন। তার সেই কৌশল স্টীলের কাবার্ডের নিরাপদ জিম্মায় গচ্ছিত রইল।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির বাঙালী কোটা দ্বিগুণ করার আদেশ তেজ গতিতে বাস্তবায়িত হয়ে চলল। প্রচার মাধ্যমগুলোও পূর্ণোদ্যমে ঝাড়া দিয়ে উঠল। এর একজন সাদাসিধা সদস্য হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল এ বিষয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য। এজন্য চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার যেখানে বাঙালী রিক্রুটদের সেনাবাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেখানকার কমানডেন্টের সাথে আমাকে মত বিনিময় করতে বলা হল।

কমানডেন্ট, কর্ণেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) মজুমদার ছিলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত একজন গোলগাল ছোটখাট মানুষ। তার সাথে মুজিবর রহমানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, এ কারণে তার মধ্যে গর্ব আর সংস্কারের বিরল সম্মিলন ছিল; গর্ব - বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিয়ে, সংস্কার - পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তার অফিসের ফুলে ঢাকা লনে গিয়ে তার সাথে দেখা করে আমার উদ্দেশ্যের কথা তাকে জানালাম। এক ঘন্টার আলাপচারিতার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে তার যে খ্যাতি, তা ভিত্তিহীন নয়। তিনি গর্বভরে তার নিজের আর বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন, সেই সাথে বাঙালী জাতির উপর যে অবিচার করা হয়েছে সে ব্যাপারেও বললেন। তিনি বললেন, "তোমরা কোটা দ্বিগুণ করা নিয়ে এত ঢাক-ঢোল পিটাচ্ছ কেন? রাষ্ট্রপতির আদেশ যদি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করাও হয়, তাতে মাত্র পনের শতাংশ প্রতিনিধিত্ব বাঙালীদের জন্য বরাদ্দ হবে, যেখানে তারা জাতীয় জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন শতাংশ গঠন করে।"



মজুমদারের সাথে এই 'ব্রিফিং'-এর পর পশ্চিম পাকিস্তানী এক অফিসারের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজ করলাম। আমাদের কথোপকথন অনিবার্যভাবে সেন্টার কমানডেন্টের দিকেই মোড় নিল। কথাপ্রসঙ্গে আমার নিমন্ত্রণকর্তা একটি ছোট ঘটনা জানালেন। বললেন যে রিক্রুটদের শেষ ব্যাচ যখন করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল, তখন কর্ণেল তাদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা এখন গর্বিত বাঙালী সেনা। তোমরা ওখানে পাঞ্জাবী অফিসারদের জুতা পালিশ করতে যাচ্ছ না। শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন তারাই তোমাদের জুতা পালিশ করবে।"

মজুমদার বাঙালী ফৌজদের একমাত্র গুরু ও অগ্রদূত ছিলেন না। তার কার্যভার ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য একজন কর্মরত লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ও একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলও ছিলেন। ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে যখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন, জুনিয়র টাইগারস-কে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান করা হয় তখন ঐ দুই অফিসারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সরকারীভাবে সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্ণেল কমানডেন্ট লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের দায়িত্ব ছিল কালার প্রদান করা এবং স্যালুট গ্রহণ করা, কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন কর্ণেল এম এ জি ওসমানী যিনি তখন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছিলেন। (পরবর্তীতে তিনি জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি আসন জেতেন এবং মুজিবর রহমানের বাংলাদেশ ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রী হন।)

অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে আমাকে এই দুই অফিসার ১৪ ডিভিশন অফিসার্স মেসে যাবার জন্য তলব করলেন, সেখানে তারা অনুষ্ঠানের জন্য জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের বক্তৃতা চূড়ান্ত করছিলেন। এই বক্তৃতার একটা কপি আমাকে দেয়া হয়েছিল যেখানে কর্ণেল ওসমানীর কর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয় সংকটের সময় বাঙালী ফৌজের উচিৎ হবে সব সময় তার উপদেশ মত চলা। পরবর্তীতে, এই বক্তৃতার ছাপানো কপি দুই অংশের সকল বাঙালী ফৌজের কাছে সরবরাহ করা হয়।

কর্ণেল ওসমানী ছিলেন একজন কৃষকায় শ্রান্ত ছোটখাট মানুষ। তার ঐ রোদে পোড়া মুখে সাদা জিনিস বলতে ছিল শুধু ঐ ঠোঁটের উপর সাদা গোঁফ। সহকর্মী এক অফিসার প্রায়ই



তার বর্ণনা দিতেন এভাবে, "এক জোড়া গোঁফের সাথে সংযুক্ত একটা মানুষ।" (সংকটের সময়ে তার ভূমিকা পরবর্তীতে বইয়ে দেয়া হয়েছে।)

ফৌজের কমান্ডার হিসেবে মেজর-জেনারেল খাদিম আঁচ করতে পেরেছিলেন যে ফৌজের উপর জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন, কর্ণেল মজুমদার ও কর্ণেল (অবঃ) ওসমানীর একটা সম্ভাব্য প্রভাব থাকবে। এটা ছাড়াও তিনি জানতেন যে চলমান রাজনৈতিক প্রভাব থেকে ফৌজকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা কখনই সম্ভব না। তার মনে ছিল যে অবিভক্ত ভারতে কায়েদ-এ-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি মুসলিম সেনাদের একটা আবেগের সমর্থন ছিল। ফৌজগুলোকে রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়ার কারণে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নীতিতে ধ্বস নামার আগেই যে পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এর অর্থ এই নয় যে বাঙালী ফৌজ নিষ্ক্রিয় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে কবে শান্তিপূর্ণভাবে স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি আশংকা করছিলেন একদিন তারা বিদ্রোহ করে বসবে। তার এই আশংকা দৃঢ় হয়েছিল যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইউনিট অস্ত্রাগার (কোট) লুন্ঠন, পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজকে নিরস্ত্র করা আর ক্যান্টনমেন্ট দখল করার চিন্তা করা হয়েছিল। এজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে সকল (অবাঙালী) ব্রিগেড কমান্ডারদের ডেকে এনে বলেছিলেন যেন তারা তাদের অস্ত্রের সবটুকু কোট-এ না রেখে কিছু অংশ ইউনিট লাইনে রাখে। তিনি বলেন, "এগুলো অবশ্যই জরুরী সময়ে কাজে লাগবে।" তিনি এ ব্যাপারে কোন লিখিত আদেশ দেননি, পরে আমাকে বলেছিলেন, "কারণ এই ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর।"

জিওসি কি তার এই কাল্পনিক আশংকা নিয়ে ঘোরের মধ্যে ছিলেন? এরকমটা যদি ইতোমধ্যে না হয়ে থাকে তাহলে কি এটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি করবে না? হয়তো এগুলো সবই শুধুমাত্র কল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু আমরা এতে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম যে প্রতিটা ঘটনাই আমরা এই আলোকে দেখতাম। উদাহরণ হিসেবে বলি, একবার আমি আমার এক বাঙালী সহকর্মীর অফিসে গিয়ে দেখি তিনি আরেক বাঙালী অফিসারের সাথে আলোচনায় মশগুল। আমি রুমে ঢোকার সাথে সাথে তারা আলোচনা থামিয়ে দিল। মুহূর্তটা কিছুটা অস্বস্তিকর ছিল। আমি বললাম, "কী হচ্ছে?" ততক্ষণে আমার সহকর্মী আমার আচমকা আগমন সামলে উঠেছেন। তিনি বললেন, "আমরা আগামী রোববার মাছ ধরতে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করছি।" বললাম, "আমিও কি যোগ দিতে পারি?" তিনি একটু থেমে বললেন, "না, পরিকল্পনাটা



এখনও চূড়ান্ত হয়নি।" আমার মনে হল তারা মুজিবের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিল।

কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে পরবর্তী সাক্ষাতে আমি জানিয়ে দিলাম বাঙালী আর পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন আর নেই। তিনি যেহেতু আমার চেয়েও বিজ্ঞ ছিলেন, আমার অভিজ্ঞতাকে তিনি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেন না। তিনি আমাকে আরও সূক্ষ্ম জ্ঞানদীপ্ত যুক্তির প্রতি আলোকপাত করতে বললেন। আমি আমার অফিসে ফিরে এলাম।

জেনারেল আর আমি মনে হয় দুই ধরণের অফিসারের প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা জুনিয়ররা যেখানে তাদের সীমিত ধারণা নিয়ে তিলকে তাল করি, সেখানে সিনিয়ররা, তাদের গভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে তালকে তিলে পরিণত করে। যদিও সত্যিকার অর্থে এই ব্যাপারটা তাল ছিল না তিল ছিল তা পরিষ্কার জানা যায়নি। সবকিছুই সেনাবাহিনীর নিয়মনীতির শক্ত খোলসের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ আর সমর্থকদের হাতে পুরো একটা নির্বাচনী বছর ছিল এই খোলস ক্ষয়ে ফেলার জন্য।



৩য় অধ্যায়: মুজিবের শিখর আরোহণ

আওয়ামী লীগের ছড়িয়ে দেয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনা বাঙালী ফৌজের সাথে সাথে সাধারণ জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল, যদিও জনগণের উপরই এটা বেশী স্পষ্টভাবে ও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছিল। এই চেতনাকে আরও উজ্জীবিত করে তুলতে আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল যেন জাতীয় দিবসগুলো যেমন পাকিস্তান দিবস (২৩শে মার্চ), স্বাধীনতা দিবস (১৪ই আগস্ট), কায়েদ-এ-আজম-এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী (২৫শে ডিসেম্বর, ১১ই সেপ্টেম্বর) - এগুলোকে পালন না করে বরং প্রাদেশিক দিবসগুলো যেমন সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী, ভাষা দিবস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী - এই দিবসগুলোকে পালন করা হয়।

সার্জেন্ট জহুরুল হক, যিনি ১৯৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবর রহমানের সাথে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৯৬৯ সালে সামরিক হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন। মূলত আওয়ামী লীগের আদেশেই ১৯৭০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার সতেরটিতে তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ঢাকায় যেন নতুন জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে। তার ছবি ও জীবনী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় শোভা পায়। বিভিন্ন জনসভায় তার কর্মের উচ্চ প্রশংসা করে বলা হয়, "তার রক্ত বৃথা যাবে না।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।) এমন এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, "জহুরুল হক ছিলেন এমন এক মহান দেশপ্রেমিক, যার নাম লোকে তিতুমীর আর সূর্যসেনের মত বড় বড় দেশপ্রেমিকের নামের সাথে মনে রাখবে।" (মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।)

এক সপ্তাহ পরেই ছিল ভাষা দিবস - বাঙালীদের জন্য এক বিরাট আবেগময় গুরুত্বপূর্ণ দিন। দিনটি পালিত হয় 'অনুপ্রেরণার দিবস' হিসেবে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের সম্মানে খবরের কাগজগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। আজিমপুরে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত করতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। চারুকলার ছেলে মেয়েরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত পুরোটা রাস্তা সুন্দর করে আলপনার সাজে সাজায়। শেখ মুজিবর রহমান মধ্যরাতের প্রভাত ফেরীতে যোগ দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এর আগে এক সভায় তিনি দাবী



তোলেন যেন সরকারের সকল স্তরে সকল বিভাগে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করা হয়। (মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।)

এরপর এল ৮ই মে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী, একজন বাঙালী কবি, যার সকল লেখা সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কারণ সেগুলো 'ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ করে'। ঢাকা প্রেস প্রথম পাতায় তার ছবি বড় করে প্রকাশ করে, তার সাহিত্যিক অর্জনগুলোর স্তুতি গায় আর তার লেখার অনুবাদ প্রকাশ করে। বাঙালী যুবজনতা আনন্দ উৎসবের সাথে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে। তারা তার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে সঙ্গীত জলসার আয়োজন করে। মুজিব নিজেও ঘরে বাইরে তার গানের কলি গুনগুনিয়ে গাইতেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক বন্ধনকে দুর্বল করে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতি জোর দেয় এমন প্রতিটি ব্যাপারেই আওয়ামী লীগ পক্ষালম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ, ছাত্ররা সরকারের নির্দেশে প্রকাশিত একটি বই 'দেশ ও কৃষ্টি' - এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠায় কারণ বইটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আদর্শগত বন্ধনের কথা বলা হয়। তারা কামারউদ্দিনের 'Social History' বইটির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কারণ এই বইটিতে কোলকাতার সাথে কৃষ্টিগত বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। এই ছাত্র আন্দোলনের সাথে সকল বিখ্যাত কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা একাত্মতা ঘোষণা করেন। মুজিব তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, "অতীতেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে (১৯৫২) সকল শক্তিকে আন্দোলন করে রুখে দেয়া হয়েছে এবং এখন বাঙালী কৃষ্টি-সম্পদের উপর এই আক্রমণকেও বাধা দেয়া হবে।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০।)

আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য বিরোধীপক্ষের প্রতিটি উদ্যোগেই আওয়ামী লীগ আঘাত হানে। তারা জানুয়ারীতে জামায়াত-ই-ইসলামীর সভা ভঙ্গ করে দেয় মূলত এইজন্য যে এখানে দুই অংশের মধ্যকার ইসলামী বন্ধনের উপর জোর দেয়া হয়েছিল। লীগ তাদের নির্বাচনী প্রচারণার বাকী সময়টুকুতে এই একই স্বেচ্ছাচারী কৌশল চালিয়ে যায়। তারা ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকায়, ২৮শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ও ৭ই মার্চ সৈয়দপুরে পিডিপি-র সভা এবং ১০ই মার্চ কুমিল্লায়, ১৫ই মার্চ বরিশালে ও ১২ই এপ্রিল ঢাকায় কনভেনশন মুসলিম লীগের সভা ভন্ডুল করে দেয়। এছাড়া আরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক সভা তারা ভন্ডুল করে।



মুজিবের বিরোধীরা, যেমন - ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ সবুর খান, জনাব নুরুল আমীন, প্রফেসর গোলাম আযম ও মৌলভী ফরিদ আহমেদ - এদের সেই রাজনৈতিক পেশীশক্তির অভাব ছিল যে তারা মুজিবকে জনসম্মুখে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। একজনই ছিলেন যিনি পল্টন ময়দানে সমান বাগাড়ম্বরে গর্জন করতে পারতেন, তিনি হলেন সেই বৃদ্ধ ভাসানী যিনি বিশ্বাস করতেন না যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিরত প্রচারণা গড়ে তুলতে হবে। তিনি জনসমক্ষে গর্জন করতে পারতেন কিংবা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি প্রথমে ১লা আগস্ট একটা গণ আন্দোলন শুরু করার হুমকি দিলেন। যখন ১লা আগস্ট এল, তখন তিনি তা পিছিয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর নিলেন, এরপর ২রা অক্টোবরে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। এভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার অসামান্য উপস্থিতির প্রভাব হারিয়ে যেতে দিলেন।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রচারণায় মুজিবের উত্থান আর তার রাজনৈতিক বিরোধীদের পতনের ফলে আমাদের মনে ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সামান্যই সন্দেহ রইল। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ভোটের দিন আসতে আসতে মুজিব তার ছয় দফার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন অর্জন করবেন। ছয় দফার বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান কি তার বর্তমান চেহারাতেই থাকবে? তার যদি সত্যিই বিচ্ছিন্ন হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে তাদের এই ইচ্ছাকে কিভাবে বেঁধে রাখা যাবে?

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সভাপতিত্বে এক কেবিনেট সভায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান জাতীয় সংহতি বনাম ছয় দফার এই ব্যাপারটির কথা তোলেন। তিনি বলেন, "সভার কার্যক্রম শুরু করার আগেই একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। ছয় দফার প্রচার কি মার্শাল ল আইন ১৬-এর লংঘন? (যে আইনে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে কিছু বলা নিষিদ্ধ।)" তাকে বলা হয়, "দুশ্চিন্তা করো না।" কিন্তু দেশের অনেকেই তা করছিল। মনে হয় জনগণের ভীতি কমাতেই রাষ্ট্রপতি তার পদাধিকার বলে ব্যস্ততার মাঝেও ৩০শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময় বের করলেন এবং ঘোষণা করলেন, "আমাদের জাতীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করে এমন কোন কিছু আমি বরদাশত করব না।" (পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিন্ডি, ৩১শে মার্চ, ১৯৭০।) পরের দিন তার এই ঘোষণা অনুযায়ী তিনি লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) জারি করলেন যেখানে ভবিষ্যৎ সংবিধানের মূলনীতিগুলো সন্নিবেশিত হয় যেগুলো "জাতীয় সংহতির অক্ষুন্নতা" ও "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র" নিশ্চিত করে। আমি এলএফও পড়ে স্বস্তি পেয়েছিলাম



কারণ এটি আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ও কার্যত স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশের রাজনীতিকে খর্ব করে।

এই লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার মুজিবকে নিদারুণ কষ্ট দিল। বিশেষ করে ২৫ ও ২৭ নং অধ্যায়ে তিনি খুবই বিরক্ত হলেন যেখানে ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রতিপাদনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর সম্যকভাবে ন্যস্ত করা হয়। এর মানে এই দাঁড়ায় যে মুজিব যদি জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যান, তবু তিনি তার ছয় দফা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, যদি না তার সংবিধানের বিল রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন। এই প্রসঙ্গেই মুজিব বলেন, "নির্বাচন শেষ হবার সাথে সাথে আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।"

পরিস্থিতি সামলাতে রাষ্ট্রপতি নিজেই ঢাকায় চলে এলেন। তিনি ৪ঠা এপ্রিল বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মুজিবকে আমন্ত্রণ জানালেন। মুজিব যখন এলেন, আমি সেখানে ছিলাম। তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সৌজন্যের মাধ্যমে বরণ করা হয়। যখন তারা ব্যক্তিগত আলাপের জন্য সুস্থির হয়ে বসলেন, আমি তখন সেখান থেকে সরে এলাম। এক ঘন্টার আলাপের পর আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে খুঁজে আনা হল কেবিনেট ডিভিশনের পক্ষ থেকে প্রেস নোটের খসড়া করার জন্য যেখানে মুজিবের আপত্তি অনুসারে এলএফও-র সেই অধ্যায়গুলোতে (২৫ ও ২৭) সংশোধনী আনা হয়। আমি নোটের খসড়া তৈরী করে তাদের হাতে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এটি প্রকাশিত হয়নি, ইতোমধ্যেই কেউ একজন ইয়াহিয়া খানকে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া খান যখন ১০ই এপ্রিল পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন এলএফও-র বিতর্কিত অংশগুলো নিয়ে তাকে ঢাকা প্রেসের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। 'জনগণের প্রতিনিধিদের পাশ করা সংবিধান বিলে রাষ্ট্রপতির ভেটো দেবার' ক্ষমতার প্রসঙ্গ নিয়ে যখন তাকে প্রবলভাবে চাপ দেয়া হল তখন ইয়াহিয়া খান বললেন, "ওটা শুধুই পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা। এটা কাজে লাগানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই।" আমার কাঁধের উপর দিয়ে একজন আওয়ামী লীগপন্থী সাংবাদিক ফিস ফিস করে বললেন, "তিনি শেখ সাহেব (মুজিব)-কে নিশ্চিত করেছেন যে এই ক্ষমতা তিনি কাজে লাগাবেন না। ইংল্যান্ডের রাণীর উপরও নাকি এমন কিছু সাংবিধানিক আনুষ্ঠানকতা ন্যস্ত আছে।"



আমি জানি না মুজিবের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করার পরিবর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কী 'আশ্বাস' পেয়েছেন। আমি শুধু জানি যে, এতে মুজিবের সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে তিনি জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন যেখানে, "এমন কি ইয়াহিয়া খানও আমার দাবীতে 'না' করতে পারেন না।"

ইয়াহিয়া-মুজিবের এই সমঝোতার দুই মাসের মধ্যে মুজিব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অনুভব করলেন এবং নিজের ক্ষমতা আরও একটু খোলাসা করে দেখানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ৪ঠা জুন তিনি ঘোষণা করলেন, "আমার দল আসন্ন নির্বাচনকে ছয় দফা দাবী উপর গণভোট ধরে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করবে।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৫ই জুন, ১৯৭০।) পিডিপি নেতা জনাব নুরুল আমীন পরদিন এটাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে এই নির্বাচন যদি ছয় দফা দাবীর উপর গণভোটই হয় আর যদি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সমর্থন না পায় 'সেক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাবে'। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৬ই জুন, ১৯৭০।) এই বক্তব্য মুজিবকে আরও খেপিয়ে তুলল, তিনি পরদিন আরও সুস্পষ্টভাবে বললেন, "গান্ধী, নেহরু আর তাদের বৃটিশ অধিপতিদের বিরোধীতা সত্ত্বেও আমরা ১৯৪৬-এর গণভোটে জয়ী হয়েছিলাম এবং আমরা এই গণভোটেও জয়ী হব, জনাব নুরুল আমীন আর তার অধিপতিদের (পশ্চিম পাকিস্তান) বিরোধীতা সত্ত্বেও।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১৯৭০।)

মুজিবের এই ঐতিহাসিক তুলনা করাটা খুবই অমঙ্গলজনক ছিল। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছেন যিনি ১৯৪৬-এর গণভোটে জয়ী হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। মুজিবও কি একই পরিণতির জন্য কাজ করছিলেন? ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধিদের একজন তাকে এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ইঙ্গিত অস্বীকার করেন। এটা তার প্রথম রাজনৈতিক ডিগবাজী ছিল না, শেষও না। এরকম বেশ কিছু ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যেখানে তিনি জনসমক্ষে আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হলেও নিভৃতে নিরীহ হয়ে থেকেছেন। এই দ্বৈতসত্ত্বা তাকে জনগণকে নিজের হাতের মুঠোর রাখতে যেমন সাহায্য করেছে, সেই সাথে তার ধার্মিক অভিপ্রায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসও অর্জন করিয়েছে। দক্ষতার সাথে রাজনীতির সার্ফবোর্ডে চড়ে তিনি জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান।



৪র্থ অধ্যায়: সামরিক শাসনের পরিহাস

ঢাকায় বেসামরিক ও সামরিক আইনের হোতারা পরোক্ষভাবে রাজনীতির জোয়ার-ভাটা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল - আওয়ামী লীগের জোয়ার আর এর বিরোধীদের ভাটা। চলমান ঘটনাপ্রবাহের উপর এর সামান্যই প্রভাব পড়েছিল শুধুমাত্র কিছু আইন বাতিল ছাড়া যার ফলে মুজিব মুক্ত হস্তে নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে জোরপূর্বক উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এটা মনে হয় এই বাঙালী নেতার প্রতি ইয়াহিয়া খানের নম্র আচরণের জন্যই হয়েছিল।

ইয়াহিয়া খানের মতলব নিয়ে নানান রকমের জল্পনা কল্পনা ছিল। অনেকেই অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে একজন একনায়ক কেন এমন একজন রাজনীতিবিদকে এত বেশী সুযোগ দিবে (উদাহরণস্বরূপ, 'এক মানুষ, এক ভোট') যাকে তার পূর্বতনরা দেশদ্রোহিতার অভিযোগে দন্ডিত করেছে। এই অনুমানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ছিল এটা যে ইয়াহিয়া খান মুজিবের মন জয় করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি মার্শাল ল উঠে যাবার পরও রাষ্ট্রপতি হিসেবে থেকে যেতে পারেন। যা হোক, ইয়াহিয়া খান এর একটা ভিন্ন কারণ দেখিয়েছিলেন। আমার সামনে তিনি অনেক বার বলেছেন, "আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমার সাথে নিয়ে চলতে হবে। মুজিব না হলে আর কে এই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করবে?"

ইয়াহিয়া খান যাই ব্যাখ্যা করুন, সত্য এটাই যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে কোন রকম বাধা ছাড়াই সব ধরণের ন্যায়-অন্যায় কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার ও গভর্নমেন্ট হাউজের প্রধান, যথাক্রমে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সাহাবজাদা ইয়াকুব খান এবং ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহসান আওয়ামী লীগের ঘোড়াকে লাগাম দিতে বা বিরোধী রাজনৈতিক ঘোড়াগুলোকে দৌড়ে জেতার জন্য তাড়া দিতে কিছুই করল না। এটা মনে হয় এক ইচ্ছাকৃত নীতির জন্য ছিল: নির্বাচনী প্রচারণায় নিরপেক্ষ থাকো।

১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাসহ প্রাদেশিক সকল কাজের জন্য গভর্নর এস এম আহসানকে দায়িত্ব দেয়া হয় (মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়াকুব খানকে না দিয়ে)। মার্শাল ল শুধু তখনই কাজ করবে যখন সাধারণ বেসামরিক শাসনযন্ত্র



ভেঙে পড়বে কিংবা অকার্যকর বিবেচিত হবে। তাদের দুজনকেই ইয়াহিয়া খানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে যিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপতি, চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ।

জেনারেল ইয়াকুবের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী আর নম্র আচরণের কারণে তিনিই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সময় ইয়াহিয়া খানের 'ধীর পদক্ষেপ'-এর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত মনোনীত ব্যক্তি। তার মোহনীয় ব্যক্তিত্ব ছিল তার বাড়তি সম্পদ। ভাইস-অ্যাডমিরাল আহসান, যাকে পাকিস্তান নৌবাহিনীর সম্মানজনক কমান্ডের পদ থেকে সরিয়ে পুরোপুরি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রদেশের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে, এই নতুন কাজের জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত ছিলেন না। ঐ দুঃসময়ের দিনগুলোতে গভর্নরের কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল অসামান্য রাজনৈতিক তীক্ষ্মবুদ্ধি, দৃঢ় শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা আর বহির্মুখী মানসিকতা। অন্যদিকে আহসানের মধ্যে ছিল একজন সন্যাসীর মত দূরে থাকার প্রবণতা, একজন বিদ্বানের মত কোমলতা আর একজন কূটনীতিবিদের মত আনুষ্ঠানিকতা। এই গুণগুলো অন্য কোথাও তার জন্য শক্তিশালী দিক হতে পারত, কিন্তু তার বর্তমান অবস্থানে দূর্বলতম দিক হয়ে রইল।

আরও খারাপ ব্যাপার হল, মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের দুই মেরু - রাষ্ট্রপতি আর সেনাপ্রধান কারুরই ভরসা ছিল না তার উপর। রাষ্ট্রপতির সাথে তার সম্পর্ক ছিল কঠোরভাবে আনুষ্ঠানিক। তিনি দায়িত্বের সাথে চিফ এক্সিকিউটিভকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে তাকে পৌঁছে দিতেন ও নিজে গভর্নমেন্ট হাউজের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে অবসর নিতেন। তিনি শুধুমাত্র কোন সরকারী কাজে তলব পেলেই রাষ্ট্রপতি ভবনে ফিরে যেতেন। এবং এই ঘটনা কদাচিৎই ঘটত।

এর ফলে আহসানকে তার বাঙালী মুখ্য সচিব জনাব শফিউল আলমের প্রতি খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছিল, যে তার বিরল প্রতিভাগুণে একই সাথে আওয়ামী লীগ, মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার আর গভর্নমেন্ট হাউজকে খুশী রাখতে পারত। তাকে দেখতে কচ্ছপের মত লাগত - লম্বা গলা (চট করে বের হবে, আবার চট করে ঢুকে পড়বে এমন), মোটা চামড়া আর ধীর গতির অধিকারী। সে জানত দ্রুতগতির জেনারেলদের সাথে কিভাবে আওয়ামী লীগের দৌড়ে জিততে হবে। তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখতে পেয়ে আওয়ামী লীগ খুশি ছিল। কেউ কেউ এমনও অনুমান করে নিয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি



ইয়াহিয়া খান তাকে প্রাদেশিক শাসনকাঠামোতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এই দুর্বল শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক ফল ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের অভাব। সাধারণ শাসনের জায়গায় আসা মার্শাল ল আরও দুর্বল প্রমাণিত হল। অ্যাডমিরাল আহসান গভর্নর হিসেবে তার ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরে আমাকে বলেছিলেন, "এটা ছিল মার্শাল ল-এর শাসন। সব গুরুতর অপরাধ মার্শাল ল-এর আইন ও ধারায় বিচার হত যেখানে আমার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাই তা করতে পারতেন। আর খেয়াল করে দেখ, তিনি ইয়াহিয়া খানের কাছে জবাবদিহি করতেন, আমার কাছে না।"

শাসনব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা আর মুজিবর রহমানের ক্রমাগত উত্থানের শক্তির কিছু অনিবার্য ফল ছিল। আইন -শৃঙ্খলার সাথে সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা জীবন হয়ে উঠল অনিশ্চিত, অস্থির আর বিশৃঙ্খল। সবচেয়ে বড় আঘাতটা পড়ল কল-কারখানাগুলোর উপর, সেখানে ঘন ঘন ধর্মঘট, তালাবন্ধ ও কর্মবিরতি চলতে থাকল। কখনও কখনও এমন হঠাৎ করে এগুলো বন্ধ হয়ে যেত যে মনে হত কোন জাদুর হাত বুঝি শাটারগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলশ্রুতিতে আদমজী পাটকল, নিশতার পাটকল, খুলনা পাট কল, চট্টগ্রাম স্টিল কারখানা, বিক্রমপুর জাহাঙ্গীর স্টিল কারখানা ও খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানার মত বড় বড় শিল্পকারখানাগুলো মাঝে মাঝে শুধুমাত্র তখনই খুলত যখন সেগুলো শ্রমিকদের দুই বিরোধী দলের কিংবা শ্রমিক ও মালিক দলের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হত। মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সময় সময় কিছু মাথা গরম লোকদের চৌদ্দ শিকের পেছনে পাঠিয়ে দিত কিন্তু এতে পরিস্থিতি মোটেই শান্ত হত না। এগুলো ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের আরও ক্ষিপ্ত করে তুলত। এমন কি ২৯ ও ৩০শে জুন ১০,০০০ এর মত শ্রমিক তাদের কমরেডদের বের করে আনতে খুলনা জেলগেট ভাঙার চেষ্টাও করে। এর এক সপ্তাহ আগে একটা স্টিল কারখানার বাইরে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করায় এক দল শ্রমিক পুলিশের অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব ফজলুর রহমান চৌধুরীকে মেরে ফেলে। তার লাশ টেনে নিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয় কারণ সে 'পশ্চিম পাকিস্তানের দালাল' হিসেবে কাজ করছিল। মুজিব নিহতের জন্য একটি সহানুভূতির শব্দও উচ্চারণ করলেন না। সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে তিনি সমর্থন ব্যক্ত করলেন।



শিল্প-কারখানার এমন বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আমি ইস্কাটন রোডের এক নামকরা কাপড়ের দোকানে গেলাম। তাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উচ্চ মানের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ম্যানেজার সুযোগ পেয়ে তাদের কষ্টের কাহিনী আমাকে শোনালেন। তিনি বললেন, "আমরা সাড়ে বারো মিলিয়ন টাকা খাটিয়ে সবচেয়ে আধুনিক সরঞ্জাম বসিয়েছি। এর বাৎসরিক ১২৫ মিলিয়ন টাকার পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে। দেশে ব্যবহারের জন্য ১৫০,০০০ টাকার পণ্য রেখে বাকীটা আমরা বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে রপ্তানীর বাজারে প্রবেশ করেছি। কিন্তু সীমাহীন শ্রমিক সমস্যার কারণে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার মত অবস্থানে নেই। সিঙ্গাপুরের এক গ্রাহক প্রতিষ্ঠান যারা তাদের ক্রেতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের একজন প্রতিনিধি মালামাল জাহাজে তোলা নিশ্চিত করতে এক সপ্তাহের জন্য শহরে এসেছেন। আমি তার জন্য কিছু করতে পারছি না। তিনি আমাদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে নতুন একটা তারিখ দেয়ার জন্য জোর দিচ্ছেন। আমি তাকে নিশ্চিত একটা তারিখ কিভাবে দিব যেখানে আমি নিজেই জানি না কারখানা কবে খুলবে আর কতদিনের জন্য খুলবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি কর্তৃপক্ষকে আপনাদের সমস্যাগুলো জানিয়েছেন?" "অনেক বার। আমি যখন মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের কাছে যাই, তারা বলে এটা বেসামরিক ব্যাপার। যখন আমি বেসামরিক সরকারের কাছে যাই, তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না। মনে হয় যেন এখন কোন সরকারই নেই। অন্তত আমাদের সাহায্য করতে পারে এমন কোন সরকার নেই।"

শ্রমিকদের পাশাপাশি ছাত্ররাও পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেছিল। গ্রীষ্মের শুরুতে পরীক্ষার সময় ছিল। তারা এটা সেটা অজুহাত দেখিয়ে পরীক্ষা বয়কট করল। এমন কি তারা দায়িত্বরত ইনভিজিলেটর ও পরীক্ষকদের ঘেরাও (আক্ষরিক অর্থে শর্ত মানাতে জোরপূর্বক আটক) , টানা হেঁচড়া বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করল না। তাদের উন্মত্ত আচরণের সময় তারা জানালার কাঁচ, লাইট শেড, ফুলের টব ভাঙচুর করল ও কলেজের আসবাব পত্র পুড়িয়ে দিল।

যখন কোন পরীক্ষা ছিল না, তখন তারা সরকারকে কশাঘাত করতে তাদের এগার দফা দাবী নিয়ে দাঁড়াল। এই দাবীগুলোতে শিক্ষার কোন বিষয় ছিল না, বরং পুরোপুরি রাজনৈতিক দাবী ছিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা আর বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিয়ে।



শিক্ষকদের এই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক ছিল যে, যারা এক সময় পরীক্ষার হলে অশোভন আচরণের জন্য ছাত্রদের বিরোধীতা করতেন, এখন তারাই এটাকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে করে তাদের এগার দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জানালেন।

যে উদ্দীপনা শিল্প শ্রমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে উজ্জীবিত করেছিল দ্রুতই তা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জুলাইয়ের শুরুতে ১৬,০০০-এরও বেশী কর্মচারী তাদের নয় দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য ধর্মঘট শুরু করল। সরকার তাদের ধর্মঘট অবৈধ ঘোষণা করল, কিন্তু মুজিব ধর্মঘটকারী সরকারী কর্মচারীদের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন ও গভর্নরকে টেলিগ্রাম পাঠালেন এই বলে, "তাদের দাবী অনতিবিলম্বে মেনে নিন।" (মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ৬ই জুলাই, ১৯৭০।) এতে কর্মচারীদের মনে এই ধারণা আরও পোক্ত হল যে সরকার নয়, মুজিবই তাদের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল।

দ্রুতই স্বর্ণকার, চামড়া শিল্পের শ্রমিক, সাংবাদিক, পরিবার পরিকল্পনার কর্মচারী আর চা বাগানের শ্রমিকসহ অন্যরাও আন্দোলনকারীদের যাত্রায় যোগ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের দাবীগুলো দফা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল আর তা তিন থেকে শুরু করে পনের পর্যন্তও যাচ্ছিল। ১৯৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এল এক চরম মুহূর্ত যখন ভিক্ষুকরা তাদের পূর্ব পাকিস্তান ভিক্ষুক গোষ্ঠী তৈরী করে বিখ্যাত পল্টন ময়দানে জন সমাবেশের আয়োজন করে তাদের পাঁচ দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করল। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।)

এই ধর্মঘট আর দাবীর দ্বৈত আক্রমণ যেন যথেষ্ট ছিল না, তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করল। স্বভাবতই উদ্বোধনী বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য ৫ই মে তারা তোপখানা রোডস্থ পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন-এর চত্বরকে বেছে নিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এই ঘটনা ঘটল তিনজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে যারা বোমা নিক্ষেপকারীদের নির্দেশ পালন করে লাইব্রেরী খালি করে দিয়েছিল কাজটা করার জন্য। পাঠকরা যখন উদাস দৃষ্টিতে আসবাবপত্রের উড়ে যাওয়া দেখছিল, সন্ত্রাসীরা তখন ধীরে-সুস্থে জীপে উঠে চলে যায়। কেউ তাদের ধরার চেষ্টা করেনি বা পরে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছায় কোন তথ্যও দেয়নি।

বোমা বিস্ফোরণগুলো মেপে মেপে নির্দিষ্ট সময় পরপর ঘটতে থাকল। যখনই শহরে শান্তি ফিরে আসতে শুরু করে তখনই আরেকটা বিস্ফোরণ হয়ে তা ভেঙে খান খান করে দেয়।



খুলনা, চট্টগ্রাম, রঙপুরসহ অন্যান্য শহরেও বিস্ফোরণ ঘটতে থাকল। কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত প্রভাব পড়েছিল প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার উপর - পূর্ব পাকিস্তানের স্নায়ুকেন্দ্র।

শিল্পক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সাথে সাথে এই নিয়ন্ত্রণহীন আচরণগুলো নিরাপত্তাহীনতা আর ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করল। শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা অলিগলিতে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ঘোরাফিরা করার চেয়ে বাড়িতে বসে থাকাই পছন্দ করত। আমার মনে পড়ে, এক উর্দু কবি জনাব জহুরুল হকের বাড়িতে গিয়েছিলাম যিনি পুরান ঢাকায় বাস করতেন। আমার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের একজন কবি ছিলেন। তার বাড়ির লোহার গেটে অনেকক্ষণ ধরে ধাক্কা দেয়ার পর তারা আমাদের শব্দ শুনতে পেলেন। দরজা খোলার আগে লোহার প্রতিরক্ষার ওপাশ থেকে একজন চাকর আমাদের পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিল যে আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছি। একবার প্রবেশ করার পর আমাদেরকে পান ও গজল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল। তার কবিতার ছন্দগুলো ছিল যেন কোন খাঁচায় বন্দি পাপিয়ার বিলাপের কলতান। আমরা যখন চলে আসছি, তখন তিনি আমাকে বললেন, "তোমরা সেনাবাহিনীর লোকেরা তো এই দিকে আসো না। তোমরা আমাদের জান-মালের হেফাজতকারী, কিন্তু শহরটাকে সব ধরণের মানুষের চলাফেরার জন্য বন্ধ করে দিয়েছ। তোমরা জানো না সময় এখন আমাদের জন্য কতটা ভয়ংকর যাচ্ছে।"

ফেরার পথে আমি একটা খবরের কাগজের অফিসে নামলাম, সেখানে এক বাঙালী ব্যারিস্টারের সাথে আলাপ হল যিনি ঐ কাগজে আইন বিষয়ক লেখা লিখতেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনায় সাম্প্রতিক অবস্থার কথা উঠে আসল। তিনি বললেন, "আইন নিয়ে পরিহাস করো না - এমন কি মার্শাল ল নিয়েও না। হয় এটাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ কর, নয়ত তুলে দাও।"

জেনারেল ইয়াকুবের সাথে এক অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতে আমি 'দন্তবিহীন' মার্শাল ল-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি পয়েন্টটা টুকে নিলেন এবং ঢাকার খবরের কাগজের সম্পাদকদের সাথে পরবর্তী মাসিক সভায় কথাটা তুললেন। তিনি এই 'দন্তবিহীন' মার্শাল ল-কে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলেন (আমি নিজের ভাষায় লিখছি):

পাকিস্তানের জনগণের জন্য মার্শাল ল হল সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে মার্শাল ল-এর শাসনই দেশকে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে, গণতন্ত্র আর মার্শাল ল দুটি একে অপরের সাথে বেমানান। প্রচলিত অর্থে মার্শাল ল



গণতন্ত্রকে শিকড় গাড়তে দিবে না। এজন্য এদেশে গণতন্ত্রকে বেড়ে উঠতে দিতে চাইলে মার্শাল ল-কে এর চিরায়ত পন্থা থেকে একটু ছাড় দিতেই হবে। আমাদের অতি-তৎপরতা ও তৎপরহীনতার মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। মাঝে মাঝে আপনারা হয়ত মনে করবেন আমরা তৎপরহীন, কিন্তু আমাদের বিচার করতে হবে সেটাও কি অতি-তৎপরতা হয়ে যাচ্ছে কি না? এর উল্টোটাও সত্যি। বিমান বাহিনী থেকে যদি উপমা দিই, একজন বৈমানিক হয়ত মনে করলেন যে তার বিমান কাত হয়ে যাচ্ছে, সেটা সোজা করতে গিয়ে দুই পাশের পর্বতের গায়ে লেগে বিধ্বস্ত হলেন, অথচ এটা না করলে বিমানটি উপত্যকা দিয়ে নিরাপদে পার হতে পারত।

সম্পাদকরা তার এই যুক্তি আর উপমা দুটোতেই মুগ্ধ হলেন। তারা জেনারেলের বাগ্মীতা ও বিজ্ঞতার প্রশংসা করলেন, কিন্তু তারপরও অনুভব করলেন যে রাষ্ট্রের বিমানটা বিপজ্জনকভাবেই কাত হয়ে গেছে এবং, সময়মত যদি এটি সোজা না করা হয় তো বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ হারাবে।

যা হোক, বেসামরিক আইন বা মার্শাল ল-এর কেউই কোন সংশোধনী পদক্ষেপ নিল না। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকল। শিল্প বাণিজ্যের কোন উন্নতি হচ্ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা প্রদান বন্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের উগ্র জাতীয়তাবাদ বেড়েই চলছিল। এর বিরোধীদের বেশির ভাগই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে এক এক করে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছিল।

এমনই এক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি হল।



৫ম অধ্যায়: সবার জন্য উন্মুক্ত নির্বাচন

বাস্তবে আওয়ামী লীগ ভোটের আগেই নির্বাচন জিতে গিয়েছিল। ৭ই ডিসেম্বর ছিল মুজিবর রহমানের বিজয়কে আইনসিদ্ধ করার একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। নভেম্বরের শেষ থেকে অনেকেই আওয়ামী লীগের সাফল্যের ব্যাপারে তাদের অনুমান নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা শুরু করে দিয়েছিল।

১লা ডিসেম্বর ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বলেন, "আমার অবশ্যই শেখ সাহেবের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করা উচিৎ। মফস্বল (রাজধানী বা প্রধান শহরগুলোর বাইরে) এলাকায় তার জনসভাগুলো আমি কাভার করতে পারিনি, কারণ রাওয়ালপিন্ডি থেকে শুধুমাত্র প্রধান শহরগুলো কাভার করার নির্দেশ দিয়েছিল। শেখ সাহেব এতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যখন তিনি ক্ষমতায় আসবেন, আপনাকে হয়ত কিছু করবেন না (সামরিক বলে), কিন্তু আমাকে তো তিনি ছাড়বেন না।" ঢাকায় পুলিশের একজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টেরও একই আশংকা ছিল। তিনি বলেন, "২২শে মে পোস্তগোলার ঘটনায় মুজিবপন্থী শ্রমিকদের উপর আমি লাঠিচার্জের (জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের ভারী লাঠির ব্যবহার) আদেশ দিয়েছিলাম। তারা নিশ্চয়ই আমার নাম তাকে বলে দিয়েছে; আর শেখ সাহেবের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর।" একজন বাঙালী বেসামরিক ব্যক্তি, জনাব রহমান, জনসাধারণের মনোভাব এক করে বলেছিলেন, "দেশটা বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগকে যদি ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠানো হয়, তাহলে তারা ভিন্ন মতাবলম্বীদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। আর যদি ক্ষমতায় না যায়, তাহলে তারা এমন অত্যাচার শুরু করবে যেন দেশ শাসনের চাবি পুরোপুরি তাদের হাতেই দেয়া আছে।"

এই আশংকাগুলো শুধুমাত্র বেসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সামরিক বিভাগেও এই এগুলো দেখা দিচ্ছিল। আমার মনে আছে, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছিলেন, "ক্ষমতা গ্রহণের পর, শেখ সাহেব যদি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সব কাগজপত্র চেয়ে পাঠান, নিশ্চিতভাবে বেশ কয়েক জায়গায় আমার নাম খুঁজে পাবেন। .... আর মুজিব সবকিছু ভুলে গিয়ে ক্ষমা করার মত অত উদার নন।" সেনাবাহিনীর যে সব অফিসার তাদের পেশার কোন ধাপেই কখনও



মুজিবের বিরোধীতা করেন নি, তারাও ছয় দফার পক্ষে জোরালোভাবে ভোট চাওয়া শুরু করলেন। তারা আওয়ামী লীগের ভালো দিকগুলো গুণে গুণে বের করায় একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামলেন। তবে এরা ছিল সাধারণত তারা, যারা মনে করতেন এই কৌশলে তারা ভবিষ্যৎ শাসনকর্তার নেক নজরে আসতে পারবেন অথবা যারা ছয় দফার সন্দেহজনক অংশগুলোর প্রতি তাদের গভীর বিরূপ মনোভাবকে লুকিয়ে রাখতে চান।

সবাই যখন আওয়ামী লীগের জয় স্বীকার করে নিয়ে এর সাথে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করছে, তখন দলটির নিজেদের ভেতরেই একটা আশংকা তৈরী হয়। নির্বাচন কি আদৌ করতে দেয়া হবে? আওয়ামী লীগ কি তার নির্বাচনী প্রচারণার ফসল ঘরে তুলতে পারবে? এই ভয়গুলো ছিল কাল্পনিক - অতিরিক্ত উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির ফসল। এই ভয় থেকে গুজবও ছড়িয়ে পড়ল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, জেনারেল হামিদ, ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে পূর্ণ ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। তিনি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে নতুন করে সবকিছু শুরু করবেন। ঐ সময়ে দুজনেই ঢাকায় ছিলেন।

আমার কাছে তখন অনেকেই খোঁজ নিচ্ছিল - সোজা-বাঁকা দুই পথেই। তারা অন্য বিভাগগুলোতেও ধর্ণা দিচ্ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোন সন্তোষজনক উত্তর বের করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান যখন রাওয়ালপিন্ডি রওনা হচ্ছিলেন তখন একজন বিদেশী সাংবাদিক তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করেন।

সাংবাদিক বলেন, "জনাব রাষ্ট্রপতি, আপনার হাতে কি আপনার দেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে?" "হ্যাঁ... হ্যাঁ... অবশ্যই..." রাষ্ট্রপতি তার বড় বড় চোখের পাতা নাড়তে নাড়তে বললেন। "কিন্তু এরকম তো জোরালো গুজব আছে যে .....”। রাষ্ট্রপতি এবার ধৈর্য্য হারিয়ে বললেন, "এ সবই আজগুবি কথাবার্তা... যত্তসব মাথামুন্ডু।" এরপর তিনি ঝট করে তার বাম দিকে ঘুরলেন যেখানে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি বললেন, "কে আমার ক্ষমতায় ভাগ বসিয়েছে ... ? যেখানে আমি না নড়া পর্যন্ত কেউ নড়ে না ....." বিরক্তির সাথে লাঠি ঘুরিয়ে ঠোঁট চেপে তিনি পিআইএ বোয়িং-এ উঠলেন। গুজবের সমাপ্তি ঘটল।



নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ঢাকায় শতাধিক দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আর মিডিয়ার লোক এসে জড়ো হল। বন্যা আর সাইক্লোনের মত সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগেও আমি এত লোকের ভিড় দেখিনি। ৬ই ডিসেম্বর তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় এদের সম্মানে হোটেল পূর্বাণীতে এক নৈশভোজের আয়োজন করে, যেখানে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়।

তিনজন পশ্চিমা সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সাথে আমি এক ডিনার টেবিলে বসলাম। আমাদের কথাবার্তার বিষয় স্বাভাবিকভাবেই পরদিন অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন নিয়ে ছিল। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেজর, আপনি কোন দলকে ভোট দিবেন?" আমি বললাম, "দল বলতে তো একটাই আছে, আর সেটা হল আওয়ামী লীগ।" তিনি আমার কৌতুক সত্যি ধরে নিলেন বলে মনে হল।

নৈশভোজের পর আমি মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে নেমে অ্যাসেম্বলী চেম্বারে গেলাম যেখানে নির্বাচনের দিন ১৪৪ ধারা জারি করা নিয়ে বিতর্ক চলছিল (যে ধারায় চারজন বা তার বেশি মানুষ একসাথে জড়ো হওয়া বা অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।) কোন কোন অফিসার এর পক্ষে বলছিলেন যে এমন ঐতিহাসিক দিনে শান্তিরক্ষার জন্য এর দরকার আছে, অন্যরা এর অনুপযুক্ততার ব্যাপারে এর বিরোধীতা করছিলেন। ঐ বিশাল অফিসে আমি প্রবেশ করা মাত্র একজন জোরে চিৎকার করে উঠলেন, "এই যে আমাদের জনমত বিশেষজ্ঞ চলে এসেছেন। তাকেই জিজ্ঞেস করি।" আমি বিশেষজ্ঞের মত ভাব নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, "প্রচলিত জনমত বিশ্লেষণ করে আমি যা পাই তাতে কোন রকম বাধামূলক ব্যবস্থায় যাওয়াকে আমি হুমকীস্বরূপ মনে করি। ইতোমধ্যেই যেখানে অতিরিক্ত উত্তেজনামূলক পরিবেশ তৈরী হয়ে রয়েছে, এই ব্যবস্থা নিলে তাতে উত্তেজনা আরও বাড়বে। আওয়ামী লীগ তো জিতবে নিশ্চিত। সুতরাং তারা শান্তিও বজায় রাখবে।" তারা আমার উপদেশ মেনে নিল। আমি মজা পেলাম এই দেখে যে একজন নবিশও তার মতামত দিতে পারে যদি সে বিশেষজ্ঞের মত ভাব নেয়!

রাওয়ালপিন্ডি থেকে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সশস্ত্র বাহিনী (মূলত সেনাবাহিনী) ভোটগ্রহণ পরিচালনা করবে। কিন্তু ঢাকায় যে নির্দেশগুলো এসে পৌঁছাল তা হল: ক) ভোটগ্রহণের সাথে নিজেকে জড়াবে না; খ) মূল কেন্দ্রগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবে; গ)



পেছনের দিকে থাকবে যাতে তোমার চেহারা কোন ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে; ঘ) শুধুমাত্র দাঙ্গা প্রশমনের জন্য এগিয়ে যাবে।

ভোটগ্রহণের সামরিক পরিচালনার সমন্বয় করতে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে একটা 'অপারেশনস রুম' বসানো হল। সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে চড়ে জেনারেল ইয়াকুব গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করলেন। আমি তার সাথে ছিলাম। সারিবদ্ধ জনতা আর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন।

বাকী দিনটা আমি 'অপারেশনস রুম'-এ কাটালাম। শুরুতে সেখানকার পরিবেশ টান টান উত্তেজনাময় ছিল, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোন কেন্দ্র থেকে কোন সহিংসতার খবর না আসায় সবাই গা ছেড়ে দিয়ে গল্প-গুজব শুরু করল। শুধু একজন স্টাফ অফিসার টেলিফোন আর ওয়্যারলেস কল ধরতে ব্যস্ত থাকল - সব ছিল ভোটের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি নিশ্চিত করার বার্তা। এই অনুযায়ী আশ্বস্ত করে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হেডকোয়ার্টার (রাওয়ালপিন্ডি) থেকে খোঁজ নেয়ার জন্য আসা ফোনের উত্তর দেয়া হচ্ছিল।

সেনাবাহিনী যেভাবে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ পরিচালনায় অংশ নিয়েছিল তা হল তারা ভোটকেন্দ্রগুলো আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে এসেছিল। পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসাররাও তাদের ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাদের বিরক্ত করতে চাননি।

সত্যিকার অর্থে, যারা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল তারাই কঠিন সময় পার করেছে। তাদের না ছিল আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে পাল্লা দেয়ার মত দলীয় শক্তি, আর না ছিল সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার ছাতা। কিছু ক্ষুব্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাবাহিনীর কাছে গিয়েছিল কিন্তু কোন সাড়া পায়নি, কারণ সেনাদের উপর নির্দেশ ছিল কোন বড় ধরণের সহিংসতার সৃষ্টি না হলে তারা যেন ভোটগ্রহণে নিজেদেরকে না জড়ায়। প্রতীকস্বরূপ দুটি ঘটনার কথা বলি।

চৌমুহনীতে (নোয়াখালী জেলায়) বারো বছরের একটা ছেলে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে ভোটকেন্দ্রের দিকে আসছিল। আওয়ামী লীগ-বিরোধী এক দলের একজন প্রার্থী তাকে পাকড়াও করে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর সামনে নিয়ে আসে যিনি তার প্লাটুন নিয়ে ঐ ভবনের পেছনে অবস্থান করছিলেন। ঐ প্রার্থী অভিযোগ করলেন যে, ক) এই ছেলেটার



ভোট দেয়ার মত বয়স হয়নি, এবং খ) সে আইন ভঙ্গ করে ভোটকেন্দ্রের ভিতর শ্লোগান দিচ্ছিল। ক্যাপ্টেন বললেন, "যাও গিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে নালিশ দাও। এইসব ব্যাপারে আমার নাক গলানোর কথা না।"

দ্বিতীয় ঘটনাটা টাঙ্গাইলের, যেখানে কোন এক রহমানকে মেজর খানের সামনে এনে অভিযোগ করা হয় যে সে পোলিং অফিসারের গোপন সহযোগিতায় পঞ্চমবারের মত ভোট দিতে যাচ্ছিল। মেজর বলেছিলেন, "তুমি হয়ত ঠিকই বলছ, কিন্তু এটা আমার মাথা ব্যথা না। বল, কোন দাঙ্গা কি হচ্ছে?" - কোন দাঙ্গা আসলেই হচ্ছিল না, আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের (শক্ত হাতের ছেলেদের) বদৌলতে।

দিনের শেষে, যখন ভোট গ্রহণ শেষ, জেনারেল ইয়াকুব খান মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের বেসামরিক বিষয়ের দায়িত্বে থাকা মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলীর অফিসে গেলেন। গর্বে বুক ফুলিয়ে জেনারেল ইয়াকুব বললেন, "আমি খুশি যে সব কিছু শান্তিপূর্ণ ছিল, ... ভোট ছিল সুষ্ঠু ও মুক্ত।" ফরমান আস্তে করে বললেন, "হ্যাঁ, মুক্তই ছিল বটে, সবার জন্য উন্মুক্ত।"

চার দিন পর (১১ই ডিসেম্বর) রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান, সার্ভিস চিফদের কাছে তার এই বার্তা পাঠান: "আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল র‍্যাংকের অফিসারদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তারিফ করছি যারা তাদের নিরপেক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও দৃঢ়তার সাথে সাধারণ নির্বাচনের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।)

এই 'শান্তিপূর্ণ' পরিবেশের সবচেয়ে বড় উপকারিতা ভোগ করেছে আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে দুটি বাদে সব আসনই তাদের দখলে যায়। বেসরকারী গণনা হয়ে যাবার সাথে সাথে সেই ইউরোপিয়ান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি যার সাথে ৬ই ডিসেম্বর একই ডিনার টেবিলে বসেছিলাম, তার হোটেলের কক্ষ থেকে আমাকে ফোন দিলেন, "অভিনন্দন মেজর! তোমার দল তো সব ভোট ঝেঁটে নিয়ে গেছে।" আমি প্রশংসাটা লুফে নিলাম। বিজয়ী ঘোড়াকে কে প্রত্যাখ্যান করতে চায়!

এখন আওয়ামী লীগের মনোভাব কেমন হবে? জনপ্রিয় আবেগকে মূলধন করার পর কি তারা নমনীয় হবে? এক মাস আগে ডঃ কামাল হোসেনের সাথে এক সাক্ষাতের কথা মনে



পড়ল, তিনি সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মুজিবের প্রধান সহকারী ছিলেন। (পরবর্তীতে তিনি জাতীয় সংসদে একটি আসন জেতেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হন।) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বারে বসে তাকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, "আওয়ামী লীগের জয় যখন অবধারিতই, ভালো হবে যদি এখন আপনারা শেখ মুজিবর রহমানের ভাবমূর্তির উন্নতি করেন, তাকে (প্রদেশের নেতা না বানিয়ে) জাতীয় নেতা বানান। এটা তার আর প্রদেশের দুইয়ের জন্যই ভালো হবে যদি তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে জনসমাবেশে যান এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা পেতে চান।" তিনি বলেন, "এটা একটা ভালো পরামর্শ, কিন্তু আমরা এটা নির্বাচনে জয়ের পরে প্রয়োগ করব। এখন পর্যন্ত আমরা ছয় দফা আর বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে এসেছি। আমরা যদি এখন কথা ঘুরাই তাহলে নির্বাচনে হেরে যেতে পারি। একবার শুধু জনতার আবেগকে ভোটে রূপান্তরিত করি, এরপর আমরা ছয় দফায় সংশোধনী আনব যাতে তা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।"

নির্বাচনের পর তার সাথে আবারও দেখা হলে আমি তাকে তার এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিই। পূর্ব পাকিস্তানের সদাপরিবর্তনশীল আবহাওয়ার মতই তিনিও বদলে গিয়েছেন। তিনি বললেন, "না, ছয় দফায় কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। এগুলো এখন জনগণের সম্পত্তি। এর কোন সংশোধনী আনা হলে সেটা জনগণের আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

তার দলের নেতা, শেখ মুজিবর রহমানও তার মতই একরোখা ছিলেন। ভোটের মাত্র দুই দিন পরেই তিনি ঘোষণা দিলেন: "এই নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সর্বোপরি ছয় দফা ও এগার দফা দাবীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য গণভোট স্বরূপ। ..... এজন্য ছয় দফা নীতির উপর ভিত্তি করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করে একটা সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে ও সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকর করতে হবে।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।)

জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার অভিমত ছিল এটাই। তিনি যদি এটা একাই চালিয়ে নিতে চান, কেউ কি তার পাকিস্তানের অবিসংবাদী শাসনকর্তা হওয়া ঠেকাতে পারবে? সেনাবাহিনী কি সুন্দরমত দেশ নিয়ন্ত্রণের হাল ছেড়ে দিয়ে নির্বাচিত নেতাদেরকে



দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে? এই প্রশ্নগুলো নির্বাচনের পরপরই আমাদের মনে ঘুরপাক খেতে থাকল যারা ঢাকায় ছিলাম।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত একজন জেনারেল ঢাকায় এলে তার কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায়। গভর্নমেন্ট হাউজে এক জমকালো নৈশভোজের পর এক অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার সময় তিনি ঘোষণা করলেন, "চিন্তা করো না ..... আমরা এই কালো হারামজাদাদেরকে আমাদের উপর শাসন করতে দিব না।"

তার এই মন্তব্য এ কান ও কান হয়ে মুজিবর রহমানের কান পর্যন্ত পৌঁছাল। সবার সামনে তিনি যখন ইয়াহিয়া খানকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিলেন তখন তিনি বললেন যে ইয়াহিয়ার অধস্তনদের একটা অংশ এই নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করার জন্য এখনও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এটাও বললেন যে ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন সম্প্রতি ঢাকায় এসে গোপন বৈঠক করছে। তিনি রাষ্ট্রপতিকে সতর্ক করে দিলেন যেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দেয়া হয়, "নয়ত বাংলাদেশের জনগণ বাঁশের লাঠি দিয়ে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১।)

যদিও এই বিরোধীতার মূল উপাদান ছিল আসলে অন্য জায়গায়।



৬ষ্ঠ অধ্যায়: সংকটের ঘনঘটা

আওয়ামী লীগ পূর্বনির্ধারিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে জয়ী হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করল, কিন্তু পশ্চিম অংশে একটি আসনও জিততে পারল না যেখানে জেড এ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (যার পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থী ছিল না) ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টিতে জয়ী হল। এতে এক অভূতপূর্ব কিন্তু অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

জয়ের পর মুজিবর রহমানের একগুঁয়ে মনোভাবের কথা আমি আগেও বলেছি। জনাব ভুট্টো, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানে মূলত পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন, তিনিও নির্বাচন-পরবর্তী ঘোষণায় নমনীয় মনোভাব সামান্যই প্রকাশ করেছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর তিনি লাহোরে বলেন: "আমার দলের সহযোগিতা ছাড়া কোন সংবিধান প্রণয়ন করা যাবে না বা কোন কেন্দ্রীয় সরকার চালনো যাবে না।" তিনি আরও বলেন যে পাঞ্জাব আর সিন্ধু হল পাকিস্তানের ক্ষমতার দুর্গের বুরুজস্বরূপ এবং যেহেতু পিপিপি এই প্রদেশগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, যে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য তার দলের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। একই সাথে তিনি জনগণকে এই বলে আশ্বাস দিলেন, "পিপিপি তার ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে এক ইঞ্চিও নড়বে না এবং ক্ষমতায় গিয়ে তার কার্যক্রম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।)

এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সচিব জনাব তাজউদ্দীনের কাছ থেকে এক কঠিন প্রত্যুত্তর এসে যায়। তিনি বলেন:

"আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে। সেটা অন্য কোন দলের সহযোগিতা থাকুক বা না-ই থাকুক, ঠিকই করা হবে। .... পাঞ্জাব আর সিন্ধুকে এখন আর 'ক্ষমতার দুর্গের বুরুজ' হিসেবে আশা করা যাবে না। আমরা যদি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাই তাহলে এই ধরণের দাবী পরিহার করতে হবে, কারণ এতে অহেতুক ক্ষতিকর বিতর্কের সৃষ্টি হয়।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।)



পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই নির্বাচন-পরবর্তী বিরোধ ছিল ঢাকায় আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ। এমন কি সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার যারা জটিল রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়ায় না বললেই চলে, তাদের উপরও এর প্রভাব আমি অনুভব করলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যারা জনাব ভুট্টোকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ী হিসেবে গণ্য করত, বলেছিল, "একটা প্রদেশ কিভাবে পুরো দেশকে শাসন করবে।" বাকীরা যারা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ঠিকমত আঁচ করতে পেরেছিল, বলেছিল, "আমরা তাদেরকে (বাঙালীদেরকে) পুরো তেইশ বছর ধরে শাসন করেছি। এবার তাদের পালা। সব সময় লাগাম আমাদের হাতেই থাকবে তা তো উচিৎ না।"

আমাদের অনুভূতি যা-ই হোক, যে চূড়ায় গিয়ে আমাদের জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হবে তা ছিল বহু উঁচুতে - আর বরফে ঢাকা। বছর ঘুরে নতুন বছর আসতে আসতে সে বরফ গলার কিছু লক্ষণ দেখা দিল। এর সূচনা এল পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষ থেকে। তিনি আওয়ামী লীগের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় বসতে চাইলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমরা ঢাকায় বসে তার অনুপস্থিতিতেই তাকে স্যালুট জানালাম। তিনি ১৯৭১ সালের ২রা জানুয়ারী মুজিবের নির্বাচনে বিজয় উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকায় তার দূত পাঠালেন এবং ভবিষ্যতে আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তিনি তার ২৭শে ডিসেম্বরের বক্তব্যেও একটা তুষ্টিজনক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন: "আমরা সরকার গঠনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বাগতম জানাই এবং এর প্রতি আমাদের আস্থা জ্ঞাপন করি।" (ডন, করাচী, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।)

মুজিব এসব উদ্যোগে দৃশ্যত সাড়া দিয়ে ঢাকার একটা আনন্দ মিছিলে ঘোষণা করেন, "সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও আমি এটা বলতে চাই না যে সংবিধান প্রণয়নে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাই না। অবশ্যই আমরা তা চাই।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।) এখন মনে হল যে সবকিছু সঠিক পথে আগাচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের ছত্রছায়ায় আশ্রিত এক ব্যক্তি এর পেছনে রাষ্ট্রপতির সহৃদয় প্রভাবের কৃতিত্ব দিলেন যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক খেলার আম্পায়ার ও এই প্রভাবের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। যতক্ষণ বিপজ্জনক বিরোধকে পরিহার করা যাচ্ছে, কে এর কৃতিত্ব নিল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিলাম না।



আমাকে আমার আশাবাদী স্বপ্নগুলো থেকে টেনে বের করে আনা হল যখন দেখলাম ৩রা জানুয়ারী ঢাকায় আওয়ামী লীগের আনন্দ মিছিলে সকল আওয়ামী লীগ এমএনএ ও এমপিএ (৪১৭ জন) ছয় দফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ গ্রহণ করল। তারা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করল:

-"পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে;

- সকল সাহসী শহীদ ও যোদ্ধাদের নামে যারা তাদের জীবন বিসর্জন দিয়ে ও চরম দুর্বিসহ কষ্ট সহ্য করে আমাদের প্রাথমিক বিজয় ঘোষণা করেছে;

- এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, কঠোর পরিশ্রমী জনতা ও সকল শ্রেণীর জনগণের নামে;

আমরা, জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যগণ, শপথ নিচ্ছি যে আমরা ছয় দফা ও এগার দফার দাবীর উপর জনগণের আজ্ঞার প্রতি সর্বান্তকরণে বিশ্বস্ত থাকব।"দেখা গেল আমরা সেই আগের অবস্থানেই ফিরে এলাম। আওয়ামী লীগ আপোষের সকল আশা চূর্ণ করে জনসমক্ষে নির্বাচিত সদস্যদের ছয় দফার সাথে বেঁধে দেয়ার শপথ নিয়েছিল। মুজিবর রহমানের কাছের একজন বাঙালী সাংবাদিককে এ কথা উল্লেখ করে আমি বলেছিলাম, "আমি মনে করি এই সময়টাকে (নির্বাচন ও সংসদ অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়) বছর জুড়ে নির্বাচনী প্রচারণার ফলে জাগ্রত জনতার আবেগকে শান্ত করার জন্য কাজে লাগানো উচিৎ যাতে সংবিধানের বিলের উপর আলোচনা করে একটা চুক্তিতে আসা যায়।" তিনি জবাব দিলেন, "শেখ সাহেব জনতার আবেগকে ঝিমিয়ে যেতে দিতে পারেন না। তোমাদের বন্দুক আর ট্যাংকের মোকাবিলা করার জন্য সেটাই তার একমাত্র অস্ত্র।"

ঢাকায় আনন্দ মিছিলের পরদিন ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের তেইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ছাত্ররা নিজেদের লক্ষ্য উপলব্ধি করার জন্য মুজিবের চেয়েও বেশি অধৈর্য্য মনে হচ্ছিল। তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য জোরালো চাপ দিল, কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বললেন, "প্রয়োজন হলে আমিই বিপ্লবের জন্য তোমাদের ডাক দিব। ততদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিৎ।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০।)



বরফ গলার যে আশা হচ্ছিল আগে, মুজিবের কঠোর মনোভাবে তা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি ভুট্টোর উদ্যোগকে পদদলিত করে দিলেন।

এই অচলাবস্থা ভাঙতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারতেন, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি ঢাকায় এলেন। এই উপলক্ষ্যকে তিনি ছয় দফা সম্পর্কে 'সম্যক ধারণা' নেয়ার কাজে ব্যবহার করলেন। মুজিব ও তার আধ ডজন সিনিয়র সহকর্মীদের ছয় দফা 'পেশ' করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানানো হল। রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এস জি এম পীরজাদা, গভর্নর আহসানকে এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তলব করলেন। আহসান, যাকে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সব সময় উপেক্ষা করা হয়েছে, অনিচ্ছার সাথে এলেন। তার মনে হয়েছিল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সম্পর্কে 'সম্যক ধারণা' নেয়ার চেষ্টা করার জন্য অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। এটা আরও অনেক আগে করা দরকার ছিল, যেটা করলে সময়মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেত। এখন যেহেতু পুরো প্রদেশ তাদেরকে ভোট দিয়ে ফেলেছে, এই পদক্ষেপ এখন কোন কাজে আসবে না।

আলোচনার টেবিলের এক পাশে বসলেন ইয়াহিয়া, পীরজাদা ও আহসান আর অন্যদিকে মুজিব, খন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দিন ও তাদের সহকর্মীরা। আওয়ামী লীগের দিক থেকে মুজিবই বেশির ভাগ কথা বললেন। তিনি এক এক করে তার ছয় দফা পেশ করলেন। প্রতিটি দফা ব্যাখ্যা করার পর তিনি বললেন, "দেখলেন তো, এখানে আপত্তিজনক কিছুই নেই। এখানে সমস্যার কী আছে? এ তো খুবই সহজ কথা।" ইয়াহিয়া ও তার সহকারীরা শুনলেন। জেনারেল পীরজাদা কিছু কিছু জায়গায় মন্তব্য করলেন কিন্তু মুজিব খুব মিষ্টি করে তা অগ্রাহ্য করলেন। সবশেষে ইয়াহিয়া খান বললেন, "আমি আপনার ছয় দফা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো বিদ্বেষ আছে। আপনার উচিৎ হবে পশ্চিম পাকিস্তানকে আপনার সাথে রাখা।" মুজিব তৎক্ষণাৎ বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে আমাদের সাথে রাখব। আমরা তাদের সাথে আলোচনায় বসব। আমরা সংবিধান প্রণয়ন করব। আমরা এটা ছয় দফার উপর প্রণয়ন করব। আমাদের সংবিধানের একটা অনুলিপি আপনাকে দেখাব। সেখানে কোনরকম সমস্যা থাকবে না।" ইয়াহিয়া খান তার বড় বড় চোখের পাপড়ি নাড়িয়ে চোখের পাতা ফেললেন, তার বিদেশী সিগারেটে টান দিলেন আর চুপ করে রইলেন।



এই বর্ণনাটুকুর জন্য আমি ভাইস-অ্যাডমিরাল আহসানের কাছে ঋণী থাকব। এই একই সভার আরেকটা বর্ণনা দেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী প্রফেসর জি ডব্লিউ চৌধুরী যিনি ঢাকায় রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের এই ঐতিহাসিক মিশনের সঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাদের বলেন যে মুজিবের বিশ্বাসঘাতকতায় রাষ্ট্রপতি নিদারুণ মর্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেন:

"এই (মুজিব-ইয়াহিয়া) সভা শেষ হওয়া মাত্র রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আমাকে তলব করা হয় ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করার জন্য আর আমি তার জবাব দিই। আমি গিয়ে দেখি তিনি বিরক্ত ও আশাহত। তিনি আমাকে বলেন, 'মুজিব আমার মাথা হেট করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে যারা আমাকে সাবধান করেছিল তারাই ঠিক ছিল; আমি এই লোকটাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি।' ..... যখন আমি নির্দিষ্ট করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নির্বাচনের আগে মুজিব আপনার কাছে যে প্রতিশ্রুতি করেছিল আপনি কি তাকে সেগুলো মনে করিয়ে দিয়েছিলেন?' গভীর মনোকষ্ট নিয়ে ইয়াহিয়া জবাব দিলেন, 'তুমি-আমি তো আর রাজনীতিবিদ নই - তাদের মন আর চিন্তাধারা বোঝা আমার পক্ষে দুরূহ। এখন শুধু আশা নিয়ে দোয়া করতে পারি যেন সবকিছু ঠিক ঠাক হয়।' " (জি ডব্লু চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৪৯, ১৫১।)

১৪ই জানুয়ারী জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেই একই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে করাচির উদ্দেশ্য রওনা দিলেন। তিনি যখন ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে সব আশা হারিয়ে ফেলেছেন মনে হল। তার কোন জবাব, মন্তব্য বা 'স্বগতোক্তি' তার পরিকল্পনার ব্যাপারে সামান্যতম ইঙ্গিতও দিতে পারল না। মনে হল তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়ার বোঝা মুজিবর রহমানের ঘাড়ে ছুড়ে ফেলার জন্য অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "তাকেই (মুজিব) জিজ্ঞেস করুন, তিনিই তো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তিনি যখন এসে ক্ষমতা বুঝে নিবেন, আমি তো আর থাকব না। শীঘ্রই এটা তার সরকার হতে চলেছে।" (ডন, করাচী, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১।)

তিনি চলে যাওয়ার পর এক বাঙালী সাংবাদিক আমাকে বললেন, "রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মূল কথাটা ছিল, "আমি তো আর থাকব না", কারণ আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাকে রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসানোর নিশ্চয়তা দিতে অস্বীকার করেছে, যদি না তিনি আওয়ামী লীগের সংবিধানের খসড়া অনুমোদন করার প্রতিশ্রুতি দেন।"



করাচীতে একদিন অবসর কাটানোর পর স্বার্থপর দালালটা জনাব ভুট্টোর অতিথি হয়ে লারকানার উদ্দেশ্য রওনা করলেন। পিপিপি-র সভাপতি, যিনি স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, এখন রাষ্ট্রপতি ও তার সহকারীদের প্রতি ঐতিহ্যগত আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাষ্ট্রপতির এই 'হাঁস শিকার' সফরে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল হামিদ। তার উপস্থিতি তৎক্ষণাৎ ঢাকায় ভীতিকর জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিল। আওয়ামী লীগ এক ষড়যন্ত্রের বীজ বোনা হচ্ছে বলে অনুভব করল, যেখানে মুজিবের সাম্প্রতিক আলোচনায় তার একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এরপর ঢাকার পত্রিকাগুলোতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছাপা হল, যেখানে দেখা গেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আল মুর্তজার প্রশস্ত লনে একসাথে হাঁটছেন। ঢাকায় যখন বৈঠক চলাকালীন উত্তেজনাময় পরিবেশের তুলনায় এটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। আওয়ামী লীগের কাছের একজন বাঙালী সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, "দেখ। যখন ইয়াহিয়া এখানে আসে, তার অধীনস্থ কোন অফিসার মুজিবকে, যিনি হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তাকে ফোন করে, যাতে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট করেন, অথচ যখন ইয়াহিয়া ওখানে যান, তিনি নিজে ভুট্টোর কাছে যান, যিনি কি না সংখ্যালঘু দলের নেতা। গণতন্ত্রের প্রতি সেনাবাহিনীর এই কি শ্রদ্ধা?"

আসুন স্বয়ং ভুট্টোর কাছ থেকেই লারকানা আলোচনার সার-সংক্ষেপ শুনি:

"১৭ই জানুয়ারী ঢাকা থেকে ফিরে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ও তার কয়েকজন উপদেষ্টা আমার নিজের শহর লারকানায় এলেন। তিনি আমাদেরকে তার ঢাকার আলোচনার ব্যাপারে অবহিত করলেন যেখানে তিনি মুজিবর রহমানকে বলেন যে আওয়ামী লীগের জন্য তিনটি বিকল্প পথ খোলা আছে, এগুলো হল একাই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, পিপলস্ পার্টির সাথে সহযোগিতা করা অথবা পশ্চিম অংশের ছোট ও পরাজিত দলগুলোর সাথে সহযোগিতা করা; এবং তার মতামত হল, সবচেয়ে ভালো হয় যদি দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একসাথে কোন বন্দোবস্তে আসতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ছয় দফার বাস্তবায়ন নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করলাম এবং এগুলোর ব্যাপারে আমাদের গুরুতর সন্দেহের কথা ব্যক্ত করলাম। তারপরও আমরা তাকে আশ্বাস দিলাম যে একটি



কার্যকর আপোষের জন্য আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকবে, আর বললাম যে অদূর ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে আলোচনায় বসার জন্য আমাদের ঢাকায় যাওয়ার কথা আছে।" (জেড এ ভুট্টোর The Great Tragedy, পৃ: ২০।)

লারকানার এই 'হাঁস শিকার'-এর পর রাষ্ট্রপতি ও উপদেষ্টাগণ রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। রাষ্ট্রপতির আলোচনার প্রেক্ষিতে ও নিজের জ্ঞানের আলোকে ভুট্টো ২৭শে জানুয়ারী ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা দিলেন। তার সাথে তার সহকারীরাও ছিল।

ভুট্টো দেখলেন ঢাকায় 'লারকানা ষড়যন্ত্রের' মেঘ তাকে ঘিরে রয়েছে। এটা মনে হল যে তিনি যদি ইয়াহিয়া ও তার দলকে নিজের শহরে আপ্যায়িত না করে বরং তার দলকে নিয়ে মুজিব ও তার উপদেষ্টাদের সাথে দেখা করতেন তাহলেই ভালো হত। এখন ঢাকার পরিবেশ বদলে গিয়ে খারাপের দিকে চলে গেছে। তারপরও আওয়ামী লীগ এই সাক্ষাতের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করল কারণ এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, ইয়াহিয়ার পর পিপলস্ পার্টির সহযোগিতাই রাষ্ট্রপতির ভেটোর ক্ষমতাকে অকার্যকর করার জন্য দরকার হবে। সাংবিধানিক বিলের ওপর পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের সমর্থন থাকলে তাকে ইয়াহিয়া কিভাবে আইনগত স্বীকৃতি না দিয়ে পারবেন? যদি তা-ই করেন, এতে তার কী সুবিধা হবে?

জনাব রহমান সোবহান আমাদেরকে এই আলোচনা নিয়ে আওয়ামী লীগের বিবৃতি দিলেন। তিনি বলেন, "জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে জনাব ভুট্টো ঢাকায় আসেন। তিনি প্রথমে সরাসরি মুজিবের সাথে আলোচনায় বসেন, এর পর তার 'সংবিধান প্রণয়নের দল' আওয়ামী লীগের ঐ একই দলের সাথে সাক্ষাত করে। আলোচনা চলাকালে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে পিপিপি এখনও তাদের খসড়া তৈরী করেনি, এবং তারা শুধুমাত্র ছয় দফাকেই খুঁচিয়ে যাচ্ছিল যেমনটা তাদের আগে ইয়াহিয়া করে গেছেন। এতে আনুষ্ঠানিক আপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যেহেতু আপোষের কাজ হল বিকল্প অবস্থানসমুহ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করা।" (রহমান সোবহানের Negotiating for Bangla Desh: A Participant's view, সাউথ এশিয়ান রিভিউ, লন্ডন, জুলাই, ১৯৭১।)

এই বিবৃতিটা আলোচনার ছয় মাস পর প্রকাশিত হয়। তবে আমি আলোচনার পরপরই আওয়ামী লীগের এক সূত্রের (ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন) বরাতে একটা মন্তব্য শুনতে পাই। তিনি বলেন, "দেখ, ভুট্টোকে ঢাকায় গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমাদের অত্যন্ত



কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সংবিধানের মূল বিষয়গুলোর প্রতি কোন আগ্রহই দেখান নি। তিনি তার পুরো সময়টা ব্যয় করেছেন তার ক্ষমতার ভাগ আর মন্ত্রীদের পদবন্টন নিয়ে আলোচনা করে।"

প্রফেসর জি ডব্লিউ চৌধুরী এর সাথে আরও যোগ করেন, "তিনি (ভুট্টো) ও তার দল ২৭শে জানুয়ারী সেখানে (ঢাকা) পৌঁছান। আমি সেখানে ছিলাম এটা দেখতে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই নেতার মধ্যে কোন রাজনৈতিক আলোচনা হলে তার ফলাফল কী দাঁড়ায়। তিন দিন ধরে আলোচনা হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে কোন অগ্রগ্রতি হয়নি। ...... আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে যে রকম জেনেছি, মুজিব ভুট্টোকে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ছয় দফা পরিকল্পনার কোন রকম রদবদল করতে প্রস্তুত নন, আর ভুট্টোও এটা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে তার দল এই পরিকল্পনার পেছনে আলাদা হবার প্রচ্ছন্ন কার্যক্রমকে মেনে নিতে পারবে না।" (জি ডব্লু চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৯।)

ভুট্টোর কাছ থেকে এর একটা পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি আমরা পাই, যেখানে তিনি লিখেছিলেন:

"১৯৭১ সালের ২৭শে জানুয়ারী পিপলস্ পার্টির নেতারা ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনায় বসে আমরা দেখি যে তিনি ছয় দফার ব্যাপারে একগুঁয়ে হয়ে আছেন। তিনি সোজা সাপটা জানিয়ে দেন যে তিনি ছয় দফা নিয়ে জনগণের কাছে থেকে আজ্ঞা পেয়েছেন এবং তিনি এখন ছয় দফা থেকে এক ইঞ্চিও সরবার মত অবস্থানে নেই। আমরা আওয়ামী লীগের সভাপতির কাছে এই ব্যাখ্যা দিই যে পিপলস্ পার্টি ছয় দফার উপর কোন আজ্ঞা পায়নি। ..... আমরা সংবিধান নিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ছয় দফা সম্পূর্ণ মেনে না নেয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতারা কোন রকম আলোচনায় যেতে অস্বীকার করে। আমরা মুজিবর রহমানেরর কাছে উল্লেখ করলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত ছয় দফার বিরুদ্ধে। আমরা তাকে বলি যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ধারণা এই যে ছয় দফা পাকিস্তানকে শেষ করে দেয়ার কাজ করছে এবং আমাদের মতে জনগণের এই মত থেকে বাস্তব খুব বেশি দূরে নয়। ..... আওয়ামী লীগের নেতা আমাদের সমস্যাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি সেগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কৌশল পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন এবং আমাদের অনুরোধ তার পরিকল্পনার সাথে খাপ খাচ্ছিল না। তার কৌশল ছিল সময় নষ্ট



না করে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু করা যাতে তার ছয় দফাকে আইনসিদ্ধ করে দেশের উপর ছয় দফা সংবিধান চাপিয়ে দেয়া যায়, পশ্চিম অংশে এবং একই কারণে পূর্ব অংশেও এর প্রভাব নিয়ে পূর্ণ সচেতনতা গড়ে ওঠার আগেই।" (জেড এ ভুট্টোর The Great Tragedy, পৃ: ২২।)

ভুট্টো ও তার সহকারীরা ৩০শে জানুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এলেন। কোন সমাধানের আভাস কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী দেখা দিল যা আগে কোনদিনও ছিল না।

এই বিস্তর ব্যবধানকে আরও বিস্তৃত করতে ভারতেরও হাত ছিল। একটি ভারতীয় ফকার ছিনতাই হবার প্রেক্ষিতে ভারতের উপর দিয়ে ওভারফ্লাইট নিষিদ্ধ করে দেয়া হল। (৩০শে জানুয়ারী দুইজন কাশ্মিরী ফকারটি লাহোরে নিয়ে এসেছিল। বিচারগত তদন্তের মাধ্যমে পরে নিশ্চিত করা হয় যে এই নিষিদ্ধ করার অজুহাত তৈরি করতে এটি ছিল ভারতের একটি ষড়যন্ত্র।) পিআইএ-র ফ্লাইটগুলো যেখানে আগে দুই ঘন্টা লাগত, এখন শ্রীলংকা ঘুরে আসতে গিয়ে ছয় ঘন্টা লেগে যায়। এমন কোন প্রমাণ ছিল না আমার ধারণাকে সমর্থন করার জন্য যে ভারত ৩০শে জানুয়ারীর অনেক আগেই এই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে রেখেছিল, কিন্তু সময় নিচ্ছিল এই কারণে যে ভুট্টো-মুজিবের ব্যর্থ আলোচনার ফলাফলের সাথে একই সময়ে কাজে লাগাতে পারে। যা হোক, পরবর্তী ঘটনাগুলো এই ব্যাপারে আমার ধারণাকে আরও পোক্ত করে তোলে।

জানুয়ারীর শেষ দিকে এসে আওয়ামী লীগ জেনে গেল সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। যেমন জেনে গিয়েছিলেন ইয়াহিয়া আর ভুট্টো। আমরা পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলাম। মুজিব অনতিবিলম্বে অধিবেশন শুরু করার জন্য প্রবল চাপ দিচ্ছিলেন, খুব বেশী হলে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে, অন্যদিকে ভুট্টো আরও সময় নিতে চাইছিলেন যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের প্রভাব বিস্তার করে আওয়ামী লীগের সাথে সাধারণ চুক্তির মত কিছু একটায় পৌঁছানো যায়। ইয়াহিয়া তার উপদেষ্টাদের নিয়ে তার নিজস্ব কৌশল পরিকল্পনা করলেন। দিগন্তে আর কোন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল না।

এমন কালো ঘনঘটার সময় আমি জেনারেল ইয়াকুবের কাছে গেলাম যার অন্তর্দৃষ্টি সব সময় আমার জন্য শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে তার বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "আমি অস্ত্রের পেশায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।



আমার মনের অ্যান্টেনা সব ধরণের সামরিক কাজের প্রতি সংবেদনশীল। যেমন ধর - তারা যদি নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশনকে কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া কী ঘটবে তা আমি সাথে সাথে বলে দিতে পারব, তা হবে: এরা কি ঘোষিত কাজই করতে এসেছে, না কি এদের অন্য কোন ভূমিকা আছে? এরা কি এদের সাথে পাহাড়ী সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে কি আনেনি? এটা কি আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, না কি আক্রমণের জন্য? কিন্তু আমার রাজনৈতিক অ্যান্টেনা একেবারে অনুভূতিহীন। মুজিব যখন রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেন, আমি তার পূর্ণ প্রয়োগ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারি না। ..... আমি আসলেই জানি না। তিনি (মুজিব) আমাকে এক কথা বলেন আর তার লোকদের সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন, আমি জানি না উনি কী বোঝাতে চান।"

প্রায় দশ দিনের উদ্বিগ্ন নিরবতার পর, পশ্চিম অংশে কিছু হচ্ছে বলে শোনা গেল। মেপে মেপে দুই দিনের ব্যবধানে নতুন নতুন অগ্রগতির খবর বের হয়ে আসতে শুরু করল: জনাব ভুট্টো ১১ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে রাষ্ট্রপতির সাথে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন; দুই দিন পর ঘোষণা করা হল যে ৩রা মার্চ ঢাকায় অধিবেশন বসবে; আরও দুই দিন পর পেশওয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে (১৫ই ফেব্রুয়ারী) জনাব ভুট্টো সংসদ অধিবেশনে তার দলের অংশগ্রহণে অপরাগতা জানান যার কারণ হিসেবে ছয় দফা বোঝা, আপোষ করা ও রদবদলের অভাবকে উল্লেখ করেন। "আমি আমার দলের লোকদের দ্বিগুণ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি না (তাদের ঢাকায় পাঠিয়ে)", এই বলে তিনি 'খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত বিপ্লব'- এর হুমকী দেন, যদি পিপলস্ পার্টিকে বাদ দেয়া হয়। (ডন, করাচী, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।)

ভুট্টোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার দুই দিন পর, ইয়াহিয়া খান তার বেসামরিক ক্যাবিনেট বাতিল করলেন। এতে তার শাসন ব্যবস্থায় বেসামরিকদের জড়িত থাকার সমাপ্তি ঘটে এবং নির্ভেজাল মার্শাল ল-তে পরিবর্তিত হয়। দুই দিন পর, তিনি তার সামরিক গভর্নর ও মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সাথে আলোচনা করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ডাকেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ইয়াকুব ও ভাইস-অ্যাডমিরাল আহসানের যাবার কথা ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী তাদের দেখা করার কথা ছিল।



১৯শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল ইয়াকুব অনানুষ্ঠানিক মত বিনিময়ের জন্য আমাকে ডাকলেন। তিনি দুটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন। প্রথমত, তিনি বললেন যে জনাব ভুট্টো তার অবস্থানে নমনীয় আছেন। মুজিব অথবা রাষ্ট্রপতি তাকে যদি এই আশ্বাস দেন যে তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে তাহলে তিনি সংসদ অধিবেশনে যোগ দিবেন। "আমার মনে হয় জেনারেল ইয়াহিয়া তার প্রতিজ্ঞাকে কার্যকর করতে তার লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত আছেন।" দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন যে এই অচলাবস্থা যদি চলতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত সামরিক পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছায়, তাহলে সেটার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এটা মনে হতে পারে যে ইয়াহিয়া খান এই আলাদা হবার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এটি আরও তরান্বিত করবেন। দেখা গেল যে আমরা অনুমানের উপর জোর দিয়েই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, তখন তিনি সামরিক হস্তক্ষেপ যদি অনিবার্য হয়েই যায় সে ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, " এটা একটা সার্জনের ছুরির মতই দ্রুত চালাতে হবে। এবং এরপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য একটা বড় ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।"

রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগে জেনারেল ইয়াকুব ও অ্যাডমিরাল আহসান মুজিবের সাথে দেখা করলেন, যিনি তাদের আশ্বাস দিলেন যে, "ছয় দফার ব্যাপারে আপোষ করা হবে।" কি চালাক লোকটা! নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করার মত প্রতারণার এক অসাধারণ প্রতিভা ছিল তার। কিন্তু, হয়ত এরই নাম রাজনীতি।

আমি জানি না রাওয়ালপিন্ডিতে তারা কী আলোচনা করেছিলেন আর কী সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, কিন্তু তাদের এই সুচিন্তিত আলোচনার কী প্রভাব ঢাকায় পড়েছে সেটা আমি জানি। সেখানে আমাদের কাছে যে খবর এসে পৌঁছাল, তা হল মুজিবকে তার সদিচ্ছা প্রমাণের জন্য আর একবার সুযোগ দেয়া হবে, নয়ত "মার্শাল ল পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হবে (অর্থাৎ চাপিয়ে দেয়া হবে), আর সেটা করা হবে তার চিরায়ত ভূমিকায়।" এতে দুটো জিনিস অনুমান করা গেল। এক, মুজিবের সাথে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য আর একবার নতুন করে চেষ্টা চালানো হবে। দুই, নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সামরিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হবে। জেনারেল ইয়াকুব ও অ্যাডমিরাল আহসান ঢাকায় ফিরে আসার পরপরই এই দুই কাজ একসাথে শুরু হয়ে গেল। আহসান কয়েক দফা মুজিবের সাথে আলোচনা করে তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তার উচিৎ হবে তার



অবস্থান থেকে একটু নিচে নেমে এসে ছয় দফাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। আহসান তাকে বলেন, "আপনি ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানেও তুলে ধরতে চান, অথচ পশ্চিম পাকিস্তান কঠোরভাবে এর বিরোধী। এজন্য আপনার উচিৎ হবে এটার বিরুদ্ধে প্রচলিত যত আবেগ আছে সব ধুয়ে ফেলতে একটা বড় পদক্ষেপ নেয়া।" অ্যাডমিরাল আহসানের কথামত মুজিব এই পদক্ষেপ নিবেন বলে কথা দিলেন। কিছুদিন পর তিনি ঘোষণা দিলেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় দফার প্রয়োগ নিয়ে তিনি জোর দিবেন না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সামনাসামনি ছয় দফার যে অংশগুলো রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে এক ইঞ্চিও নড়লেন না।

জেনারেল ইয়াকুবও তার অধীনস্থদের অপারেশন 'BLITZ'-এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আদেশ দিলেন, যেটা মূলত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার থেকে তৈরী করা হয়েছিল। আমাকেও আদেশ দেয়া হল যাতে পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণ প্রেস সেন্সরশিপের জন্য আমার করা ক্ষুদ্র পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করি। এটি মূল 'BLITZ' পরিকল্পনার সাথে একীভূত করা হবে। ব্রিগেডিয়ার বললেন, "এটাকে এমন করে তৈরী কর যাতে সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্র কোন প্রশ্ন ওঠার আগেই তুমি সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ জারি করতে পারো।" "কিন্তু, এখন কি আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "এই পরিকল্পনার ভিত্তি কী? আমি কি ধরে নিব যে বেসামরিক চাকরিজীবীরা আমাদের পক্ষে আছে? কারণ সাধারণত বেসামরিক প্রেস কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়েই সেন্সরশিপ করা হয়।" তিনি বরং রেগে গিয়ে বললেন, "আমি জানি না। ওদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে তোমার সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করা - সব তোমারই দায়িত্ব। ..... কিন্তু এটি (এই পরিকল্পনা) টাইপ করো না। এর একটা মাত্র অনুলিপি করবে যেটা তোমার হাতে রাখবে এবং আজকেই সেটা আমার কাছে জমা দিবে।"

দুটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন - ২২ বালুচ ও ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স - ২৭শে ফেব্রুয়ারী পিআইএ-তে করে আসা শুরু করল। ১লা মার্চ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলল। স্থানীয় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার (৫৭ ব্রিগেড)-কে বলা হল যেন এই অতিরিক্ত ফৌজকে স্বাগত জানিয়ে নতুন অপারেশন পরিকল্পনায় এদের যোগ করে নেয়। নিরাপত্তার খাতিরে এই বন্দোবস্ত থেকে বাঙালী ব্রিগেড মেজরকে দূরে রাখা হয়। কিন্তু ঢাকা বিমানবন্দরের মত জায়গায়



যেখানে বেশির ভাগ মানুষই বাঙালী, সেখানে শত শত ফৌজের অবতরণ কিছুতেই গোপন রাখা যায় না।

যেহেতু সামরিক পক্ষ থেকে পরিস্থিতি মার্শাল ল-এর পুনর্বহালের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল, আওয়ামী লীগ নড়ে চড়ে উঠতে শুরু করল - এক ভয়াবহ দুর্দিনের আভাস দেখা দিল। মুজিবর রহমানের সহকারীদের একজনের কথায় জানা যায় যে মুজিব তার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে গিয়ে তার রাজনৈতিক উগ্রপন্থী আচরণের জন্য যে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি হবে তার দায়দায়িত্ব মেনে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত তার বিদেশী পৃষ্ঠপোষকরা যারা গোপনে তার কাজে সাহায্য করছিল এখনই শেষ খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এজন্য আওয়ামী লীগ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে যাবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল যাতে অস্ত্রের সম্মুখীন হওয়া এড়াতে পারে কিংবা অন্তত কিছুটা সময় বের করতে পারে নিজেদের অস্ত্র-সরঞ্জামে তেল দেয়ার জন্য।

২৫শে ফেব্রুয়ারী এক প্রভাবশালী দৈনিকের বাঙালী সম্পাদকের কাছ থেকে ফোন পেলাম। তিনি আমার সাথে জরুরীভাবে আলোচনায় বসার জন্য জোর দিলেন। আমি জানতাম যে তিনি আওয়ামী লীগের উঁচু দরের নেতাদের সাথে খুবই সখ্যতা রাখেন এবং এই আলোচনার বিষয় সর্বশেষ পরিস্থিতি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

সকাল ১১টায় তার অফিসে গিয়ে দুজন বাঙালী ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হলাম, পরে জানতে পেরেছিলাম তারা ছিলেন আওয়ামী লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। তারা বললেন যে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে অতি সত্ত্বর ঢাকায় আসার জন্য বলা দরকার। আমি বললাম, "দুঃখিত। রাষ্ট্রপতি কোথায় কখন যাবেন তার নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নেই।" "কিন্তু আপনার কথা তো সর্বোচ্চ মহলে পৌঁছায়। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।" তারপর তারা খোলাসা করে বললেন যে রাষ্ট্রপতি যদি আসেন, তাহলে তার আগমনকে সম্মান জানিয়ে আওয়ামী লীগ বাস্তবেই ছাড় দিবে। তারা বললেন, "প্রকাশ্যে আমরা ছয় দফার প্রতি একনিষ্ঠ থাকব, কিন্তু বাস্তবে আমরা এর সাথে কিছু অনুমোদন যোগ করব যাতে তা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।" তাদের এই পরামর্শের গুরুত্ব বোঝাতে তারা বললেন যে মুজিবের পক্ষ থেকে তারা এই কথাগুলো বলছেন। যে সংশোধনীগুলোর পরামর্শ তারা দিয়েছিলেন সেগুলো হল:



১। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টা থাকবে প্রাদেশিক। বাণিজ্য প্রতিনিধিদের প্রদেশ থেকে পাঠানো হবে। তারা বাণিজ্য চুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা ও আলোচনা করে স্থির করবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত কোন বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হবে না।

২। একটি প্রদেশ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে যা আয় করবে তা ঐ প্রদেশের রিজার্ভ ব্যাংকেই জমা থাকবে, কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকল্পে এই অর্থ খরচ হবে না, যে কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৩। কর নির্ধারণ ও এর সংগ্রহ হবে প্রাদেশিক বিষয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি কর উত্তোলনের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা জারি রাখতে চায়, তবে তা রাখতে দেয়া হবে।

৪। আমরা ভিন্ন মুদ্রার জন্য জোর দিব না।

সবশেষে তারা জানালেন যে এই দফাগুলোর উপর তারা লিখিত শপথ দেবেন। আমি তাদের এই বক্তব্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিব বলে কথা দিলাম আর এই পরামর্শ দিলাম যে এখনও মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তানে ঘুরে আসার সময় আছে। বললাম, "আমি নিশ্চিত এতে উপকার হবে, যদিও এই বিষয়ে আমার কাছে কোন বিবরণ নেই।" তারা কথা দিলেন যে মধ্যাহ্ন ভোজে তারা মুজিবের সাথে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বিকালে এর ফলাফল আমাকে জানাবেন।

বিকাল ৪টার সময় একই অফিসে আমরা আবার দেখা করলাম। আমার প্রস্তাবে মুজিবের প্রতিক্রিয়ার কথা তারা এইভাবে বর্ণনা করলেন: "আমি (মুজিব) সম্প্রতি গভর্নর আহসানের সাথে খুবই সন্তোষজনক আলোচনা করেছি। তিনি এমন কোন আভাস দেননি যে রাওয়ালপিন্ডিতে আমাকে রাষ্ট্রপতির দরকার আছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী দলের সভার বন্দোবস্ত নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত আর আমি এখন কোথাও যেতে পারি না যতক্ষণ না আমাকে নতুন কোন অগ্রগতির আশ্বাস দেয়া হয় যার উপর জরুরী আলোচনা করা প্রয়োজন।"

সন্ধ্যায়, জেনারেল ইয়াকুবের কাছে আমি সারাদিনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করি। তিনি একটা লম্বা টেলিগ্রামের অফিস অনুলিপি তুলে ধরলেন যেটা তিনি এর মধ্যেই



রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওতে রাষ্ট্রপতিকে আর সময় নষ্ট না করে ঢাকায় আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বোঝা গেল যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা আমাকে এতক্ষণ যা বুঝিয়েছেন তার খবর এর মধ্যেই জেনারেল ইয়াকুবের কাছে পৌঁছে গেছে।

আমরা ঐকান্তিকভাবে মরিয়া হয়ে দোয়া ও আশা করছিলাম যেন রাষ্ট্রপতি আসেন। আমরা ভাবছিলাম সংকট এড়ানোর জন্য তখনও সময় আছে। এমন কি কিছু জুনিয়র অফিসারকে দেখেছি রাষ্ট্রপতির আগমনের জন্য তাদের রোজকার নিরাপত্তার কাজ মুলতুবী রাখতে যাতে হঠাৎ যদি তিনি এসে উপস্থিত হন তো আনুষ্ঠানিক আতিথেয়তার কমতি না হয়।

রাষ্ট্রপতি এলেন না। তার বদলে এল আরও অশুভ এক ছায়া।



৭ম অধ্যায়: মুজিবের ক্ষমতা দখল

রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এস জি এম পীরজাদা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী গভর্নর আহসানকে ফোন করে এক অশুভ সংবাদ দিলেন যে রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে করে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ কক্ষের বাইরে বসে সংবিধানের খসড়া নিয়ে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আরও সময় পায়।

পীরজাদার ইচ্ছানুসারে সেই দিনই সন্ধ্যা ৭ টায় মুজিবকে গভর্নমেন্ট হাউজে তলব করা হয়, আর দীর্ঘ প্রস্তুতিমূলক আলোচনার পর আহসান তাকে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্চর্যজনকভাবে, মুজিব আক্রমণাত্মক হলেন না। তিনি তার মিষ্টি যুক্তিপূর্ণ ভাব ধরে রেখে বললেন, "আমাকে যদি একটা নতুন তারিখ দেয়া হয় তাহলে আমি এ নিয়ে কোন ঝামেলা দাঁড় করাব না। দলের মধ্যে উগ্রপন্থীদের সামলানো আমার জন্য খুবই কঠিন। নতুন তারিখটা যদি আগামী মাসের (মার্চের) কোন এক দিন হয়, তাহলে আমি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারব। এটা যদি এপ্রিলে হয়, তাহলে বরং আরও কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু এটা যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য পেছায়, তাহলে তা সামাল দেয়া পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে পড়বে।" গভর্নমেন্ট হাউজ ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি মেজর জেনারেল ফরমানকে বললেন, "আমি আছি দুই তোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনীর হাতে মারা পড়ব, আর নয়ত আমার দলের উগ্রপন্থীদের হাতে। তুমি আমাকে গ্রেফতার কর না কেন। আমাকে শুধু একটা ফোন দিও, আমি চলে আসব।"

সেই সন্ধ্যায়ই মুজিবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাওয়ালপিন্ডিতে অবহিত করা হয়। এরপর রাওয়ালপিন্ডিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয় যেন সময় পেছানোর ঘোষণায় নতুন তারিখ যোগ করে দেয়া হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঠান্ডা জবাব নিয়ে তার আসে, "আপনাদের বার্তা পুরোপুরি বোঝা গিয়েছে।"

ঢাকা থেকে এই বার্তাকে এর প্রস্তাবে মৌন সম্মতি হিসেবে ধরে নেয়া হয় আর নতুন তারিখের আশা করে অপেক্ষা শুরু হয়। ১লা মার্চ দুপুর ১:০৫-এ (পূর্ব পাকিস্তানের সময় অনুসারে) ঘোষণাটি সম্প্রচারিত হয়। প্রত্যাশা আর আবেগ আমাদেরকে বেতার যন্ত্রের



সাথে আঠার মত আটকে রেখেছিল। আমি মনিটরিং সেকশনে বসে ছিলাম যাতে একটা শব্দও শোনায় বাদ না পড়ে। আমাদেরকে ভীতিকরভাবে আশ্চর্য করে দিয়ে ঘোষণায় নতুন তারিখের ব্যাপারে কিছুই বলা হল না। আমার চোখের সামনে নানান বীভৎস দৃশ্য ভাসতে লাগল।

তারিখের ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াও আর যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে, তা হল রাষ্ট্রপতির কণ্ঠস্বরের অনুপস্থিতি, যেটা আগে তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ঘোষণার সময় বেশ কয়েকবার আমাদের কানে বেসুরো লেগেছে। এর মানে কি তিনি এই ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না? প্রফেসর জি ডব্লিউ চৌধুরী অন্তত এটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চান। তিনি বলেন, "ইয়াহিয়া শুধুমাত্র এর স্বাক্ষরকারী ছিলেন।" (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৫৯।) তাহলে এর লেখক কে ছিলেন? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আরও বিস্তারিত খোঁজ নিতে ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের একজন মেজর-জেনারেল "আই"-এর সাথে যখন আমি যোগাযোগ করলাম, তিনি বললেন, "রাষ্ট্রপতি সে সময় করাচীতে ছিলেন। আমরা সবাই নীচতলায় ছিলাম। মেজর-জেনারেল "এইচ" আর মেজর-জেনারেল "ও" উপরে-নীচে ওঠানামা করছিলেন। তারা রাষ্ট্রপতির কাছে এমন একটা চিত্র এঁকে উপস্থাপন করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই তৈরী করা খসড়াতে সম্মতি দিতে বাধ্য হন।" জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জন্য এই আত্মপক্ষ সমর্থন কি যথেষ্ট? ইয়াহিয়া চাপের মুখে ছিলেন বাজপাখীসম জেনারেলদের কাছে, মুজিব তার উগ্রপন্থীদের কাছে আর ভুট্টো নির্বাচকদের কাছে! তাহলে স্বাধীন প্রতিনিধি কে ছিলেন? কে কতখানি চাপ সহ্য করতে পারে, আর কতখানি কাজের স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারে, তা দিয়েই মাপা যায় কে একজন জাতীয় নেতার দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা রাখে।

সময় পেছানোর ঘোষণার ফলে ঢাকায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার উন্নত জ্ঞান মুজিবকে তার প্রতিক্রিয়া গুছিয়ে নেয়ার জন্য সময় দেয়। ঘোষণার আধা ঘন্টার মধ্যেই ক্রুদ্ধ জনতা বাঁশের লাঠি আর লোহার রড ঘোরাতে ঘোরাতে শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে তোলে, ক্রোধ আর বিক্ষোভের শ্লোগান দিয়ে। পুরো শহর ক্রোধে টগবগ করে ফুটতে থাকে। দোকান-পাট, বিশেষ করে যেগুলো অবাঙালীদের, লুট করা হয় আর গাড়ী ভাংচুর করা হয়। সিটি স্টেডিয়ামে বিসিসিপি (বোর্ড ফর কন্ট্রোল অব ক্রিকেট ইন



পাকিস্তান) একাদশ ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচটি পর্যুদস্ত হয় আর খেলোয়াড়রা কোন মতে উদ্ধার হয়ে এমএনএ-র হোস্টেলে পালিয়ে যান।

সেইদিনই বিকালে স্থানীয় এক হোটেলে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসলেন। পরে সন্ধ্যায় এক বিশাল সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিব ঘোষণা দিলেন, "আমরা সবকিছু এমনি এমনিই ছেড়ে দিতে পারি না।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ২রা মার্চ, ১৯৭১।) তিনি ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ সারা প্রদেশে পূর্ণ হরতাল ডাকলেন। পরবর্তী তিন দিন সরকারের 'চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া'-র জন্য সময় দিয়ে তিনি কথা দিলেন যে ৭ই মার্চ জনসমাবেশে তিনি তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের ঘোষণা দেবেন।

জনসমক্ষে কঠোর চেহারা দেখিয়ে তিনি গভর্নমেন্ট হাউজে আরেকবার একটা নতুন তারিখের জন্য অনুরোধ করতে গেলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে এখনও সময় আছে। এখনও যদি আপনারা আমাকে একটা নতুন তারিখ দেন তো আমি আগামীকালই জনরোষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এরপর খুব বেশি দেরী হয়ে যাবে।"

ঢাকার সর্বোচ্চ মহলের সব মাথা সেই রাতেই একত্র হয়ে টেলিফোনে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা শুধুমাত্র পীরজাদা পর্যন্তই পৌঁছাতে পারল যে কিছুতেই ঢাকার কথায় কান দিচ্ছিল না। এরপর তারা জেনারেল হামিদকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল (যিনি তখন রাওয়ালপিন্ডির বাইরে ছিলেন) যাতে তাকে তার পুরনো বন্ধু ইয়াহিয়া খানের উপর প্রভাব খাটানোর জন্য প্ররোচিত করা যায়। জেনারেল হামিদ সংকটের বিষয়টি শুনে কথা দিলেন যে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে কথা বলবেন। কিন্তু এতে কোন কাজ হল না। পরে সেই রাতেই জেনারেল পীরজাদা জেনারেল ইয়াকুবকে ফোন করে অ্যাডমিরাল আহসানের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিতে বললেন। অ্যাডমিরালকে সবচেয়ে অনাড়ম্বরভাবে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বিদায় করে দেয়া হল।

দেশকে তখন চরম বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। আমার মতে, এই ঘটনাই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে মুজিবের আশংকাকে নিশ্চিত করে। তিনি আপোষের সব রাস্তা বন্ধ করে দেন এবং 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করে যুদ্ধের রাস্তা খুলে দেন।



ঢাকা পিআইএ-র বাঙালী কর্মচারীরাই সবার আগে তাদের কাজ বয়কট করে। তারা করাচী থেকে ফৌজ (২২ বালুচ ও ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) বহনকারী ফ্লাইটগুলো পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এমন কি দুজন বাঙালী যুবক একটা বোয়িং বিমান উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টাও করে, কিন্তু পাকিস্তান বিমান বাহিনী তাদের পরিকল্পনা আগে থেকেই বানচাল করে দেয়, যারা ১লা মার্চ ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ ও বিমান বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব বুঝে নেয় আর পরবর্তীতে গন্ডগোলের পুরোটা সময় সবচেয়ে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে।

এভাবে ফৌজ আসতে থাকাটা মুজিবের সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করে এবং তিনি প্রতিবাদ করেন যে, যে বোয়িংগুলোর এমএনএ-দেরকে আনার কথা সেগুলো ফৌজ নিয়ে আসছে 'বাঙালী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখার জন্য'। জেনারেল ইয়াকুব এই ফৌজ প্রেরণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে অনুরোধ জানান, কারণ এত ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

মুজিব এবার আগুন ছড়ানো শুরু করলেন। কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল, কত তাড়াতাড়ি এই আগুন সমস্ত প্রদেশে কিংবা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে। স্থানীয় মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই আগুনের শিখা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় একটা মার্শাল ল আদেশ (১১০ নং) জারি করল যেখানে পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন খবর, মতামত বা ছবি ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়। আগুনের শিখায় এই কাগজের টুকরা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, কারণ সাংবাদিকরা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ও পরিবারের জীবন সংকটে ফেলেই এই আদেশে সম্মতি দিতে পারত। যারাই আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের (শক্ত হাতের ছেলেদের) কথা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল তাদের উপরই কঠোর শাস্তি নেমে আসছিল। অন্যদিকে প্রশাসন, হুমকীর মুখে পড়া এই সাংবাদিক ও তাদের পরিবারদের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা দিতে পারছিল না। এর ফলাফল ছিল স্পষ্ট।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে, মুখ্য সচিব শফিউল আজম আওয়ামী লীগের জন্য খুবই কাজে এলেন, যার এখনকার খেলা ছিল এই বিশৃঙ্খলাকে একত্র করে ইয়াহিয়ার সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে অকার্যকর করে তোলা। তারা একটা পরিকল্পিত কার্যক্রম চালায় যার অগ্রভাগে ছিলেন শফিউল আজম। তিনি বেসামরিক বিষয়ের দায়িত্বে থাকা মেজর জেনারেল ফরমানকে ফোন করে 'অনুরোধ' করলেন যেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়। ফরমান জবাব দিলেন, "এটা এত সহজ না। এর প্রভাব খুবই



গুরুতর হবে। এর চেয়ে আপনার সাধারণ আইনরক্ষা বাহিনীকে নামালেই ভালো হত।" জনাব শফিউল আজম জোর গলায় বললেন, "না, জেনারেল সাহেব। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। সেনাবাহিনীকেই মাঠে নামতে হবে।" স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলও সিনিয়র মার্শাল ল অফিসারদের কাছে একই ধরণের ফোনকল করতে থাকলেন। কয়েক মিনিট পর শফিউল আজম আবারও জেনারেল ফরমানকে ফোন করে তার 'অনুরোধ' মেনে নেয়ার জন্য জোর দিলেন। জেনারেল ফরমান বললেন, "আপনি কি শেখ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিয়েছেন?" শফিউল আজম বললেন, "হ্যাঁ, করেছি। আমি তার সম্মতি পেয়েই কথা বলছি।"

সেনাবাহিনী রাজী হল - এবং ফাঁদে পা দিল। কার্ফিউ জারি করে (২রা মার্চ, সন্ধ্যায়) তা কার্যকর করতে ফৌজ নামা মাত্রই আওয়ামী লীগ তা ভঙ্গ করতে তাদের কর্মীদের পাঠিয়ে দিল। ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টারে করে ৩২ পাঞ্জাবের একটি প্লাটুনকে উঠিয়ে এনে গভর্নমেন্ট হাউজে নামানো হল যাতে তারা উগ্র জনতা থেকে তা রক্ষা করতে পারে। ফৌজগুলোকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে গুলি না চালায়। মনে হল আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদেরকেও একই রকম কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে গুলি চালাতে উস্কানি দেয়। খুবই কঠিন মুহূর্ত ছিল এটা। অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতিবাদ জানাতে ব্রিগেডিয়ার 'এ' তার ফৌজকে তার অফিসারদের নেতৃত্বে রেখে দিয়ে ছুটে গেলেন মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে। তিনি বললেন, "আপনারা আমাকে হাত বেঁধে আগুনে ফেলে দিয়েছেন। ফৌজদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা এখনও গুলি না করার আদেশ মান্য করে চলেছে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের ধৈর্য্য চরম সীমায় পৌঁছে যাবে।" তার এই প্রতিবাদ আমিও শুনেছিলাম। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে তাকে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন মনে হল তাকে।

পরে সেই রাতে, চাপ আরো বেড়েই চলল আর ফৌজদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ফৌজ আর জনতার সংঘাত ঘটল। সৈন্যরা যেখানে শুধমাত্র সামান্য আহত হল (ইট-পাটকেল আর ঐ ধরণের ছুঁড়ে দেয়া বস্তু দিয়ে), জনতার মধ্য থেকে ছয়জন প্রাণ হারাল। এদের মধ্যে, তিনজন গভর্নমেন্ট হাউজের বাইরে মারা গিয়েছিল যারা দেয়াল বেয়ে উঠে লুট করার চেষ্টা করেছিল। এক রাতেই ছয়টি মৃত্যু! শফিউল আজম আর তার পৃষ্ঠপোষকেরা সেদিনের মত জিতে গেল! এটা শুধু সেনাবাহিনীর অবস্থানকেই জটিল করে তুলবে না, সেই সাথে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমকেও নতুন করে উৎসাহ দিবে।



পর'দিন, তারা এই লাশগুলো নিয়ে শহরের প্রধান রাস্তাগুলো দিয়ে মিছিল করল। এরপর মুজিব, লাশগুলো সামনে রেখে, বাগ্মী হিসেবে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রদর্শন করলেন। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা মিছিলকারীদের এতই প্রভাবিত করল যে তারা তার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক কাজ করতেও স্বেচ্ছায় প্রস্তুত ছিল। পরে তিনি চার পৃষ্ঠার একটি প্রেস বক্তব্য তৈরী করলেন যেখানে তিনি সরকারী চাকুরীজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে আহ্বান করলেন যেন তারা 'অবৈধ সরকার'-এর বিরুদ্ধে জেগে ওঠে ও 'একমাত্র আইনসিদ্ধ কর্তৃপক্ষের উৎস' হিসেবে 'জনগণের প্রতিনিধি'-দের বেছে নেয়। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৭১।)

২রা মার্চ মধ্যরাতের একটু আগে এই উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রায় একই সময়ে খবরের কাগজ ও মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছায়। একজন 'বিজ্ঞ' মার্শাল ল অফিসার পরামর্শ দিলেন যে সংবাদপত্রকে এটা চেপে যাওয়ার জন্য বলা উচিৎ। আমি বললাম, "সেটা সম্ভব। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া থেকে সাবধান। এটা মুজিবকে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলবে আর আগামীকাল তিনি সরকারকে আরও নিষ্ঠুরভাবে কষাঘাত করবেন।" এরপর জেনারেল ইয়াকুব তার অফিসে আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন, "তুমি কী পরামর্শ দাও?" মুজিবের সাথে যে তার এক রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল এটা জেনে বললাম, "আপনি যদি মুজিবকে প্ররোচিত করেন যাতে তিনি এই বক্তব্য প্রত্যাহার করেন কিংবা অন্তত কিছুটা নমনীয় হন, তাতে সমস্যার সমাধান হবে।" আমার সামনেই তিনি রাত সাড়ে এগারটা থেকে বারোটা দশ পর্যন্ত চল্লিশ মিনিট ধরে মুজিবের সাথে কথা বললেন। তিনি মুজিবকে রাজী করানোর জন্য তার সব রকমের কৌশল, প্ররোচনামূলক বাকপটুতা আর কুটনীতির ব্যবহার করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। জেনারেল বললেন, "শেখ সাহেব, আপ খুদ সিয়ানে হ্যায় (আপনি নিজেই একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি)। আপনি জানেন পরিস্থিতি এখন খুবই নাজুক। এরকম একটা বক্তব্য একে শুধু আরও খারাপই করবে।" মুজিব পাল্টা তর্ক করলেন, "না, এখানে উত্তেজনাকর কিছুই নেই। এটা শুধুই আরেকটা রাজনৈতিক বক্তব্য।" তাই বিতর্ক চলতেই থাকল। মুজিব মানতে নারাজ ছিলেন। টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে তার চকচকে টেবিলের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জেনারেল ইয়াকুব বললেন, "তিনি বলছিলেন, ''আমি নমনীয় হতে পারব না। আমি চাপের উপর আছি। আপনি বরং এসে আমাকে গ্রেফতার করুন। এতে আমার সমস্যার সমাধান হবে।'



আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এতে আমার সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু, হয়তো এটা এখন বলার সময় না ..... ঠিক আছে, এখন আমরা কোনদিকে আগাবো?"

এরপর তিনি মেজর-জেনারেল খাদিম, মেজর-জেনারেল ফরমান ও ব্রিগেডিয়ার জিলানীকে নিয়ে একটা 'ক্ষুদ্র সমর-সভা' ডাকলেন, আমিও এতে যোগ দিলাম। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে সমগ্র প্রদেশে ফৌজদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হবে যাতে তাদের এলাকায় এই বক্তব্যের ফলে উদ্ভূত আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে।

পরদিন সকালে, জেনারেল ইয়াকুব আবারও রাওয়ালপিন্ডিতে অনুরোধ জানালেন যাতে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয় অথবা তাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয় কারণ পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রপতির জবাব ছিল, "আমি আপনার বিচক্ষণতার উপর ভরসা করি, আর আপনি তা কাজে লাগাতে পারেন যদি ঢাকা আর রাওয়ালপিন্ডির মধ্যে টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" কিন্তু ঢাকা আর রাওয়ালপিন্ডির মধ্যে সত্যিকারের যোগাযোগ এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তার-বিভাগই সশরীরে কার্যকর ছিল।

এদিকে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়া জারি ছিল। উত্তেজিত জনতা ঢাকায় সেনাবাহিনীসহ আইন প্রয়োগকারী প্রতিনিধিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, ফলে বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট ও রংপুর থেকেও একই ধরণের খবর আসতে থাকে। যেখানে কোন ফৌজ ছিল না, সেখানে জনতা অবাঙালীদের জান-মাল ও সম্মান নিয়ে খেলতে থাকে।

রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছিল। শুরুতে তিনি এতে সাড়া দেননি। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব না, তখন তিনি তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তিনি ঢাকায় সকল রাজনীতিবিদের সাথে ১০ই মার্চ দেখা করতে চাইলেন। মুজিবের প্রতিক্রিয়া জানতে তাকে আগে ভাগেই এই বার্তা পৌঁছে দেয়া হল। মুজিব রাজী হলেন। তার সম্মতির কথা রাওয়ালপিন্ডিতে জানিয়ে দেয়া হল। কিন্তু যখন রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব ঘোষণা করা হল, মুজিব তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, "আর কোন গোলটেবিল বৈঠক নয়, আর কোন প্রহসন নয়।" (তিনি ১৯৬৯-এর ১১-১৩ই মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকের তুলনা দিলেন।)



এই ক্রোধ প্রকাশের পর তার এমন ক্রুদ্ধ চেহারার কারণ জানতে চাওয়া হল। তিনি বললেন, "আমি যেটায় রাজী হয়েছিলাম, তা হল ইয়াহিয়া রাজনীতিবিদদের সাথে এক এক করে অথবা ছোট ছোট দলের সাথে কথা বলবেন। আমি কখনই এমন গোল টেবিল বৈঠক সমর্থন করিনি এবং করি না, যেখানে আমাকে ভুট্টোর সাথে এক টেবিলে বসতে হয়, যে কি না বাঙালীর রক্ত ঝরানোর জন্য দায়ী।" মুজিব কোন রকম রাখ-ঢাক না রেখেই অভিযোগ করলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল গন্ডগোলের পেছনে ছিলেন ভুট্টো।

প্রতিদিনই হতাহতের ঘটনা ঘটছিল। ৩রা মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৫৫ জন আহত ব্যক্তি ভর্তি হয়। পরদিন আটজন নিহত হয় - চারজন ঘটনাস্থলে, চারজন হাসপাতালে মারা যায়। মুজিব হাসপাতালে যান ও রক্তদানের জন্য আহ্বান করেন।

ফৌজরা শহরে দুইদিনের মত ছিল - শফিউল আজমের অনুরোধে, মুজিবের সম্মতিতে - সেখানে তাদের উপস্থিতিকে 'জনগণের জন্য উস্কানিমূলক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুজিব এখন চাইছিলেন তারা ব্যারাকে ফিরে যাক, যেন তিনি শুধুমাত্র 'তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে কে? মুজিব জবাব দিলেন, "এটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি আমার স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাব। দরকার হলে আমি আনসার (প্রাদেশিক আধাসামরিক বাহিনী) ও পুলিশের সাহায্যের জন্য ডাকব। কিন্তু তোমাদের সেনাবাহিনী আমার দরকার নেই। এদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নাও।"

মুজিবের প্রস্তাবকে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সভায় সাধারণভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আওয়ামী লীগের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব। এজন্য রাওয়ালপিন্ডিতে তথ্য পেশ করে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে ফৌজগুলোকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনা হবে। কার্যত এতে আওয়ামী লীগের রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু ফৌজদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হল!

তার মানে সরকার স্বেচ্ছায় মুজিবের পক্ষে ক্ষমতা ছেড়ে দিল, যিনি এখন পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা বনে গেলেন। মুজিবের অধীনে অবাঙালীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তাদের অনেকেই আশ্রয় খোঁজার জন্য ক্যান্টনমেন্টে আসতে থাকল - এটাই এখন তাদের



জন্য অত্যাচারের সাগরে একমাত্র নিরাপত্তার দ্বীপ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এমন কোন বাড়ি ছিল না যেখানে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ জন করে শহর থেকে আসা আশ্রয়প্রার্থী ছিল না। তারা বারান্দা, পেছনের উঠান, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, গ্যালারি এমন কি রান্নাঘরেও ঘুমাত। যাদের নিরাপত্তার জন্য টিকেট কেনার সামর্থ্য ছিল, তারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বেশির ভাগকেই এই অগ্নিপরীক্ষা নীরবে সয়ে যেতে হচ্ছিল।

জেনারেল ইয়াকুব মানুষের কষ্ট দেখে পীড়িত হয়ে জেনারেল পীরজাদাকে ৪ঠা মার্চ ফোন করে বললেন যাতে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই আর দেরী না করে ঢাকায় আসেন, কারণ প্রতিটি ঘন্টা পার হয়ে যাবার সাথে সাথে তা সম্ভাব্য সমাধানের পথ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। পীরজাদা রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলে ফোন করে জানালেন যে রাষ্ট্রপতি শীঘ্রই ঢাকায় যাবেন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া কঠিন। জেনারেল পীরজাদা এটাও জানিয়ে দিলেন যে রাষ্ট্রপতি 'এখনই' মুজিবের সাথে কথা বলবেন এবং 'পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে না করার জন্য' বলবেন। ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে ব্যক্তিগত টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন যেটা টেলিফোন নির্দেশিকায় তালিকাভুক্ত ছিল না।

এই ঘটনায় জেনারেল ইয়াকুব ও তার বিশ্বস্ত সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সেই রাতেই (৪ঠা/৫ই মার্চ) গভর্নর আহসান যিনি ১লা মার্চ জেনারেল ইয়াকুবের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিলেন, তার পশ্চিম পাকিস্তানে রওনা দেয়ার কথা ছিল। জেনারেল ইয়াকুবের বাড়িতে এক বিদায়ী নৈশভোজে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। মেজর-জেনারেল খাদিম রাজা ও ফরমান আলীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভাইস-অ্যাডমিরাল আহসানকে বিদায় জানিয়ে তিন জেনারেল বসলেন রাষ্ট্রপতির আসন্ন সফর ও পরিস্থিতির উপর এর সম্ভাব্য সুবিধাজনক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে। রাত ৯:১০-এ একটা টেলিফোন এসে তাদের আলোচনায় বাধা দিল। রাষ্ট্রপতি লাইনে ছিলেন। তিনি জেনারেল ইয়াকুবের সাথে কথা বলতে চাইলেন। তিনি যখন টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, জেনারেল রাজা, জেনারেল ফরমান, তাদের স্ত্রীরা ও বেগম ইয়াকুব উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইয়াহিয়া বললেন, "আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। আমি ঢাকায় আসছি না।" জেনারেল ইয়াকুব দুই একটা কথা বলতে চাইলেন কিন্তু রাষ্ট্রপতি তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি বললেন, "না, আমি আসতে পারব না, কারণ আমার মনে হয় না যে এতে করে আমি সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারব।" এটা বলেই তিনি লাইন কেটে দিলেন।



তিন জেনারেলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল হতাশাপূর্ণ আর শোকাবহ। কী করা যেতে পারে? রাষ্ট্রপতি আশার একমাত্র শিখাটুকুও নিভিয়ে দিয়েছেন। জেনারেল ইয়াকুব তৎক্ষণাৎ জেনারেল পীরজাদাকে ফোন করলেন। এক মিনিটেই তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "পীর, রাষ্ট্রপতিকে যদি (ঢাকায়) আসার জন্য রাজী করানো না যায়, তাহলে আমি হয়ত আমার দায়িত্ব ছেড়ে দিব। আগামীকাল সকালে আমার আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব।" এই টেলিফোনের কথা শেষ হওয়া মাত্র খাদিম ও ফরমানও পদত্যাগ করতে চাইলেন, কিন্তু এই দুই ভদ্রলোকের জন্য জেনারেল ইয়াকুব বললেন, "আপনাদের এই সমর্থন প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কোন শ্রমিক ইউনিয়ন নয়। এটা সেনাবাহিনী। আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান।"

সভাভঙ্গের আগে তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে জেনারেল ফরমানকে মধ্যরাতের ফ্লাইটে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেডকোয়ার্টারে (রাওয়ালপিন্ডি) পাঠানো হবে যাতে তিনি পীরজাদা ও রাষ্ট্রপতিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। যাত্রা শুরুর পর এই স্পর্শকাতর মিশন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তার হাতে আট ঘন্টা সময় ছিল। পরদিন সকালে (৫ই মার্চ) জেনারেল ইয়াকুব সংকেতের মাধ্যমে (টেলিগ্রাম করে) রাওয়ালপিন্ডিতে তার পদত্যাগপত্র পাঠালেন।। পদত্যাগপত্রের ভাষাতেও স্বভাবতই চলমান পরিস্থিতির একটা প্রতিচ্ছবি ভালোমত উঠে এসেছিল।

পদত্যাগপত্রটি রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি (রাষ্ট্রপতি) সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, তিনি জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে নতুন দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য একজন কোর কমান্ডার ও মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (পাঞ্জাব) লেফটেন্যান্ট-জেনারেল টিক্কা খানকে রাওয়ালপিন্ডিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জেনারেল ফরমান ও জেনারেল টিক্কা, দুই ভিন্ন জায়গা থেকে ভিন্ন মিশনের দায়িত্ব নিয়ে, রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাথে এসে পৌঁছালেন। রাষ্ট্রপতি তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে সময় দিলেন। জেনারেল টিক্কা খানকে তার নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হলে তিনি সত্যিকারের পেশাদার সৈনিকের মত সাথে সাথে তা মেনে নিলেন। জেনারেল ফরমান যখন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করে এই অনির্দিষ্ট গতিকে রোধ করতে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া তখন বললেন, "বাছা, আমাকে তো আমার পায়ের নিচের মাটির কথা ভাবতে হবে। আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা ভাবতে হবে। আমি তো আমার পায়ের নিচের মাটিটা ধ্বংস করে দিতে পারি না।"



এদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে আরও রক্ত ঝরতে থাকল। এর শিকার ছিল মূলত নিরস্ত্র অবাঙালীরা যারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত না। সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছিল চট্টগ্রামের একটি অংশ, পাহাড়তলীতে, যেখানে এক দিনে ১০২ জন অবাঙালী নিহত হয় (৩রা মার্চ)। সেন্টার কমানডেন্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, যাকে সেখানকার মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করা হয়েছিল, এই নির্দয় হত্যাকান্ড ঠেকাতে স্পষ্টত কিছুই করলেন না।

ঢাকার পরিস্থিতি তখন আরও খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল। কেউ নিরাপদ বোধ করত না। আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা বেশির ভাগ অবাঙালী বেসামরিক লোকদের মনে ভার হয়ে চেপে বসেছিল। তাদের অনেকে করাচী যাওয়ার অর্থ জোগাতে তাদের ঘরের মালপত্র বিক্রী করে দিয়েছিল। গুলশান-বনানীর কিছু বড়লোক অধিবাসী স্বেচ্ছায় পিআইএ-র একটি আসনের বিনিময়ে তাদের নতুন গাড়ি দিয়ে দিচ্ছিল, যে আসনের স্বাভাবিক মূল্য ছিল মাত্র ২৫০ টাকা। বিমানবন্দরে অপেক্ষারত নারী-পুরুষের লম্বা লাইন লেগে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই দিন-রাত অপেক্ষা করছিল যাতে সিরিয়ালে এগিয়ে থাকতে পারে। এখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় - যেন কোন জলোচ্ছ্বাস এসে এক দল সমুদ্র যাত্রীকে অচেনা শীতল তীরে ছুঁড়ে ফেলেছে।

আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা বিমানবন্দরে যাওয়ার সকল প্রধান সড়কে চেক পয়েন্ট বসাল যাতে 'বাংলাদেশের সম্পদের পাচার থামানো যায়।' সবচেয়ে শক্তিশালী পাহারা দেয়া হয় শহরের বিমান বন্দর সড়কের ফার্মগেট এলাকায়। রিকশায় করে যেতে থাকা এক পাঠানকে তল্লাসী করার জন্য সেখানে থামানো হয়। সে বাধা দেয়। ফলাফল: তৎক্ষণাৎ নির্দয় মৃত্যু। তার লাশ টেনে নিয়ে পাশের নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনা ঘটে, ঢাকা শহরের মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র কয়েকশ' মিটার দূরে। সেনাবাহিনী একটা বিচ্ছিন্ন ফৌজ পাঠাল যাতে লাশটি উদ্ধার করে এনে ক্যান্টনমেন্টে দাফন করতে পারে - এটাই ছিল তখন জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য একমাত্র নিরাপদ জায়গা।

৭ই মার্চের সেই কঠিন দিন - যেদিন রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে মুজিবের ভাষণ দেয়ার কথা - দিনটি যতই এগিয়ে আসছিল, ঢাকা শহর নানা গুজব, ভয় আর আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠছিল। এটা সর্বতভাবে অনুমান করা হচ্ছিল যে শেখ মুজিবর



রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক তরফা ঘোষণা দিবেন। অনেকেই মনে করছিল যে এটা শুধুমাত্র পরিস্থিতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করবে, কিন্তু বাকীরা ঠিকই অনুভব করেছিল যে এটা পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত করে দিবে যেটা সশস্ত্র বাহিনী হতে দিবে না।

এমন এক ঘোষণার পরবর্তী ভয়াবহ ফলাফল সম্পর্কে আওয়ামী লীগও সচেতন ছিল। দলের চরমপন্থীরা তারপরও এর জন্য চাপ দিচ্ছিল, কিন্তু মধ্যমপন্থীরা এর বিরোধীতা করে আবেদন করছিল। বলা হচ্ছিল যে মুজিব এই দুই দলের টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে এই চরম পদক্ষেপের ভালো-মন্দ মেপে নিচ্ছিলেন।

৬ই মার্চ নৈশভোজের পর আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বৈঠকে বসলেন। সরকারের সবগুলো চোখ তখন এই বৈঠকের উপর ছিল। চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হেডকোয়ার্টারকেও এই 'বোমাবর্ষণ'-এর আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। মধ্যরাতে বৈঠক শেষ হল, কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই। পরদিন খুব সকালে আবারও বৈঠক ডাকা হল।

এদিকে, দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ মুজিবের সাথে দীর্ঘক্ষণ টেলিফোনে আলাপ করে তাকে অনুরোধ করলেন যেন, 'এমন কোন পদক্ষেপ না নেন, যেখান থেকে আর ফিরবার পথ থাকবে না'। (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৫৩।) পরে, তিনি মুজিবের উদ্দেশ্যে একটি টেলিপ্রিন্টার বার্তা পাঠালেন। মধ্যরাতে আমার উপস্থিতিতে এই বার্তা ঢাকার মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছায়। বার্তা পৌঁছে দেয়ার আগে আমি এটা চট করে পড়ে নিয়েছিলাম। পরে আমার স্মৃতি থেকে এর অংশবিশেষ আমার ডায়রীতে লিখে রেখেছিলাম:

দয়া করে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি শীঘ্রই ঢাকায় এসে আপনার সাথে বিশদ আলোচনায় বসব। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে জনগণের প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞার পূর্ণ মর্যাদা দেয়া যাবে। আমার মনে একটা পরিকল্পনা আছে যা আপনাকে ছয় দফার চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না।



মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে এই বার্তা ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য একজন ব্রিগেডিয়ারকে পাঠানো হল, যিনি ফিরে আসার পর তার মুখে মুজিবের আতিথেয়তা ও সৌজন্যবোধের প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল, সেই সাথে তার বাড়ীর উৎসবমুখর পরিবেশের কথাও জানা গেল যেখানে ডজন ডজন গাড়ি আর শত শত মানুষের ভিড় লেগে গিয়েছিল।

যদি বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি 'আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়' করার জন্য ঢাকার কর্তৃপক্ষের পরামর্শে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন তবে তা নেহায়েতই মিথ্যাচার হবে। (রবার্ট জ্যাকসনের South Asian Crisis: India-Pakistan-Bangla Desh, পৃ: ২৯।) বাস্তবে ঢাকা থেকে এই সময় কোন রকম আক্রমণ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। এমন কি ফৌজের স্বাভাবিক পালাবদলও বন্ধ রাখা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার মনে যা ছিল, তা ছিল আলাদা ব্যাপার।

একই দিনে (৬ই মার্চ) ইয়াহিয়া ঘোষণা দিলেন যে ২৫শে মার্চ ঢাকায় সংসদ অধিবেশন বসবে। এই কাজটা আরও এক সপ্তাহ আগে করলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জিওসি-র বাড়িতে। তাকে রাত ২টার সময় ডেকে তোলা হয়, তার গোয়েন্দা অফিসার আওয়ামী লীগের দুইজন প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে আসেন। মুজিবের দূতরা তাকে বলেন, "শেখ সাহেব এখন চরমপন্থীদের কাছ থেকে প্রচন্ড চাপের উপর আছেন। তারা তাকে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মত যথেষ্ট শক্তি তার নেই। তিনি চাচ্ছেন যে তাকে যেন সামরিক হেফাজতে নেয়া হয়।" জিওসি উত্তর দিলেন, "আমি নিশ্চিত মুজিবের মত একজন জনপ্রিয় নেতা জানেন কিভাবে এমন চাপকে প্রতিহত করতে হয়। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করানো যাবে না। তাকে বলে দিন আমি তাকে চরমপন্থীদের রোষ থেকে রক্ষা করার জন্য সেখানে (রমনা রেসকোর্স ময়দানে) থাকব। কিন্তু তাকে এটাও বলে দিন যে তিনি যদি পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহলে আমি যা পারি - ট্যাংক, আর্টিকারী, মেশিনগান - সব কিছু জড়ো করে সব বিশ্বাসঘাতককে মেরে ফেলব, যদি দরকার হয় ঢাকা শহরকে গুড়িয়ে ধূলোয় মিশিয়ে দিব। শাসন করারও কেউ থাকবে না, শাসিত হবারও কেউ থাকবে না।"

পরদিন সকালে (৭ই মার্চ) পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জনাব ফারল্যান্ড মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কিছুক্ষণ পর একজন বাঙালী সাংবাদিক জনাব রহমান আমাকে



ফোন করে জানালেন যে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে। মুজিবের সাথে ফারল্যান্ডের সাক্ষাতের ব্যাপারে আমাদেরকে আরও জানান জি ডব্লু চৌধুরী। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড আমেরিকার নীতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনি তার বিচ্ছিন্নতাবাদী খেলায় যেন ওয়াশিংটনের সাহায্যের আশায় তাকিয়ে না থাকেন।" (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১২০।)

তারপর এল সেই চরম মুহূর্ত। দুপুর ২:৩০-এ (স্থানীয় সময়) মুজিবের ভাষণ শুরু হবার কথা ছিল এবং রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র নিজ উদ্যোগে তা সরাসরি সম্প্রচার করার বন্দোবস্ত করে। বেতারের ঘোষকরা এর মধ্যেই রেসকোর্স থেকে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য এই অভূতপূর্ব লক্ষাধিক দর্শকের প্রবল উদ্দীপনার বর্ণনা দেয়া শুরু করে দিয়েছিলেন।

চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেডকোয়ার্টার এতে হস্তক্ষেপ করে ঢাকায় নির্দেশ পাঠায় যাতে এসব আজগুবি প্রচার বন্ধ করা হয়। আমি বেতার কেন্দ্রে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলাম। নির্দেশ পেয়ে অপর প্রান্তে থাকা আমার বাঙালী বন্ধু তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। সে বলে, "আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠ প্রচার করতে না পারি, তো আমরা কাজই বন্ধ করে দিব।" এর সাথে সাথে বেতারের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। (পরদিন সকালে আবারও এর সম্প্রচার শুরু হয় যখন মুজিবের ধারণকৃত ভাষণ প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়।)

মুজিব, যিনি সকালবেলা তার বাড়িতে ছাত্র নেতাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে দিয়েছিলেন, জনসমাবেশে তা উন্মোচন করতে নিষেধ করে দিলেন। টান টান উত্তেজনা নিয়ে মঞ্চে উঠে তিনি জনতার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, যারা তার বহুল প্রতীক্ষিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছে। মুজিব তার স্বভাবসিদ্ধ বজ্রকণ্ঠে ভাষণ শুরু করলেন কিন্তু ক্রমেই ভাষণের বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাওয়াতে তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলেন। তিনি একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না, কিন্তু ২৫শে মার্চ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য চারটি শর্ত উপস্থাপন করলেন। এগুলো হল:

১। মার্শাল ল তুলে দেয়া;

২। জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর;

৩। সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়া; এবং

৪। বাঙালী জনতা হত্যার তদন্তসহ বিচার করা।



ভাষণের শেষদিকে তিনি জনতাকে পরামর্শ দিলেন যেন তারা শান্তিপূর্ণ ও অহিংস থাকে। রেসকোর্সে ঢেউয়ের মত উপচে পড়া জনতা এখন ভাটার স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন সন্তোষজনক ধর্মোপদেশ শোনার পর কোন ধার্মিক জনতা মসজিদ বা গীর্জা থেকে ফিরে আসছে। আমাদের অনেকেই যেমন অনুমান করেছিল যে তারা ক্যান্টনমেন্টে হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে - সেই ক্রোধ তাদের মধ্যে ছিল না। মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে এই ভাষণের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বস্তির। চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হেডকোয়ার্টার থেকে আসা ফোনের উত্তরে এক সিনিয়র অফিসার বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ।"

তাৎক্ষণিক সংকট এড়ানোর পর, মুজিবের সিদ্ধান্তের উপর কোন বিষয়গুলো প্রভাব খাটিয়েছে তা নিয়ে গবেষণা শুরু হল। তিনটি কারণ লিপিবদ্ধ করা হল। হয়তো, তিনি রাষ্ট্রপতির বাড়িয়ে দেয়া জলপাইয়ের ডাল আঁকড়ে ধরেছেন; হয়তো, ফারল্যান্ডের সাক্ষাৎ তার ভারসাম্য নাড়িয়ে দিয়েছে; হয়তো জিওসি-র হুমকীই আসল কাজটা করেছে। কিংবা হয়তো তিনটি প্রভাবই এক যোগে কাজ করেছে। কিন্তু কেউই এটা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে পাকিস্তানের প্রতি মুজিবের সত্যিকারের ভালোবাসার কারণেই এমনটা হয়েছে।

ঝড়টা কেটে যাওয়ার পর বেলা ৩:৪০-এ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল টিক্কা খান এসে পৌঁছালেন। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ইয়াকুব, মেজর-জেনারেল খাদিম রাজা আর অন্যান্য সিনিয়র সামরিক অফিসাররা তাকে স্বাগত জানাতে গেলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। নীল স্যুট আর সাদা কলার পরিহিত টিক্কা খান জীবনীশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের আলো বিচ্ছুরিত করতে করতে বিমান থেকে নেমে এলেন। তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ইয়াকুবের ভঙ্গুর ও ক্লান্ত দেহের তীক্ষ্ম বৈপরীত্যের প্রতীক, যিনি তখন খাকী পোশাকে মনের ভিতর বয়ে যাওয়া ঝড় গোপন করার জন্যই যেন ছড়ি দিয়ে পায়ের পাশে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিলেন। তারা দুজন দেখতে যেমন আলাদা ছিলেন; তেমনি তাদের ভূমিকাও ছিল আলাদা। গাড়ির বহর যখন বিমানবন্দরের পিচঢালা পথ ছেড়ে যাচ্ছিল, বসন্তের সূর্য তার শেষ কিরণ কালো মার্সিডিজের চকচকে ছাদের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। রাতটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে এল।

মেজর-জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জেনারেল টিক্কা খানের সাথে একই গাড়িতে ছিলেন। পথে জেনারেল টিক্কা খাদিমকে বললেন, "এখানে তোমরা কী সব ঝামেলা



পাকিয়ে রেখেছ?" জিওসি, যিনি রাজনৈতিক আর আবহাওয়া দুইয়েরই অনেক ঝড় কাটিয়ে এসেছেন, আর আশা করেছিলেন যে উৎসাহের বাণী শুনবেন, এমন অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে আহত হলেন। তিনি লাফ দিয়ে তার আসনের কিনারে সরে গিয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলুন, স্যার। আমরা এখানে নরকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটাই কি আমাদের পুরস্কার? নিজে পরিস্থিতি দেখার আগে দয়া করে আপনার এই মন্তব্য সামলে রাখুন।" জেনারেল টিক্কা চুপ করে গেলেন। প্রথম দিনেই দুজনের মধ্যে তৈরী হওয়া এই মতভেদের বরফ গলতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল।

সেই সন্ধ্যায়ই, জেনারেল টিক্কা খানকে পরিস্থিতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিফিং করা হল। আমাকে এই ব্রিফিং-এর সময় পাশের রুমে থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ আমাকে ডেকে পাঠাল না। সন্ধ্যা ৭:৩০-এর দিকে জেনারেল ইয়াকুব ব্রিফিং থেকে বের হয়ে এলেন এবং তার স্নেহভরা হাত আমার ডান কাঁধে রেখে বললেন, "প্রথম দেখায় কেউই একটা সমস্যার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না।"

রাত ৮টার সময় রাওয়ালপিন্ডিতে সংকেত পাঠানো হল যে জেনারেল টিক্কা খান তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। এখন তার মাথায় তিনটা টুপি: গভর্নর, মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের টুপি। তিনি তার সৈনিকসুলভ গুণাবলী দিয়ে আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহ জাগিয়ে তুললেন। আমরা ভাষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী জেনারেল ইয়াকুবকেও শ্রদ্ধা করতাম কারণ আমরা জানতাম তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরী সংকট আর তার পরবর্তী দমন নীতির সামনে মাথা নোয়াতে পারবেন না বলেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু মুজিবর রহমান তখনও প্রদেশে রাজত্ব করে চলেছেন, এবং জেনারেল টিক্কা খান এমন কোন বিচারপতি খুঁজে পেলেন না যিনি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ পাঠ করাবেন। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জনাব সিদ্দিকী 'অসুস্থতার কারণ' দেখিয়ে শপথ গ্রহণ করাতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। আসলে, তিনি আওয়ামী লীগকে বিরক্ত করার সাহস পাননি, যারা কার্যত প্রদেশের শাসক ছিল। কিছুদিন পর জনাব সিদ্দিকীর দৃঢ় অবস্থানকে সমর্থন করে ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশন একটি প্রস্তাব পাশ করে।



ঢাকার মার্শাল ল অফিসাররা বিকল্প কোন পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির জারি করা লিখিত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রধান বিচারপতিকে দিয়েই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করতে হবে। তার অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কোন স্থানীয় বিচারক এই শপথ গ্রহণ করাতে পারবেন না, যতক্ষণ না ঐ লিখিত আইন সংশোধন করা হয়। জেনারেল টিক্কা নিজে তার মুখ্য সচিব শফিউল আজমকে ফোন দিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বললেন, কিন্তু তিনি এটা সেটা কারণ দেখিয়ে না করে দিলেন। এভাবে তিনি আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে মুখ্য সচিব হিসেবে তার চাকরী বজায় রাখলেন।

এদিকে, আওয়ামী লীগ তার শাসন সুদৃঢ় করতে একটি নির্দেশিকার ধারা (মোট ৩১টি) জারি করল, যেটা সরকারী বিভাগসমুহ, শিল্পক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ পালন করতে থাকল। এমন কি সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনও মুজিবের আদেশ মেনে চলল। মুজিবের শাসন সারা প্রদেশকে গ্রাস করে নিল, শুধুমাত্র সামরিক ক্যান্টমেন্টের সাতটি পকেট ছাড়া যেখানে অফিসার আর লোকজন তাদের ভারাক্রান্ত দিন-রাত পার করতে থাকল। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তার শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকল। কিন্তু মুজিব উস্কানি দেয়ার কোন রাস্তাই চেষ্টা না করে ছাড়লেন না। এমন কি তিনি জনগণকে এটাও বললেন যেন সশস্ত্র বাহিনীকে সড়ক ও রেলপথ ব্যবহার করতে না দেয়। স্থানীয় কন্ট্রাক্টররা তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দিল। অফিসার ও লোকজন তাদের শুকনো খাবারের মজুদের উপর বেঁচে রইল। তারপরও তারা সব নির্দেশ মেনে চলল।

তাদের কয়েকজন তখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো যেমন ব্যাংক, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর সাথে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকত। জনতা মাঝে মাঝেই দায়িত্বরত ফৌজের উপর তিরস্কার আর বিদ্রুপের আক্রমণ চালাত আর তাদের চলাফেরায় বাধা দিত। এতে একেক সময় জনতার সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সংঘর্ষ লেগে যেত। ফলে উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটত; সরকারী ফৌজে অল্প, জনতার পক্ষেই বেশি।

৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে একটা হ্যান্ডআউট জারি করা হয় যেখানে সারা সপ্তাহের হতাহতের হিসাব দেয়া হয় যে ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হয়েছে। এখানে বলা



হয়, "..... এদের মধ্যে, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজবাগ কলোনী ও ওয়্যারলেস কলোনীতে দাঙ্গাকারীদের নিজেদের ভেতর সংঘর্ষে ৭৮ জন নিহত ও ২০৫ জন আহত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে মাত্র পাঁচজন নিহত ও একজন আহত হয়, যেখানে ইপিআর-এর বুলেটে মারা যায় দুইজন। ..... ৩রা ও ৪ঠা মার্চ খুলনার স্থানীয় -অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালালে ৪১ জন নিহত হয়। ..... তারা রংপুরে স্থানীয় সংঘর্ষ দমন করতে তিনজনকে নিহত ও ১১ জনকে আহত করে। ..... ৪ঠা মার্চ খুলনায় একটা ট্রেন আটকালে সেখানে পুলিশের গুলিতে চারজন প্রাণ হারায় ও একজন আহত হয়। ..... ৬ই মার্চ ৩৪১ জন আসামী ও মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশকে বাধ্য হয়েই গুলি চালাতে হয় যার ফলে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। ..... ৩রা ও ৪ঠা মার্চ বিক্ষুব্ধ জনতা যশোর, খুলনা ও রাজশাহীর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে হামলা করে। এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর প্রহরায় থাকা সেনা ফৌজগুলো তাদের উপর গুলি চালাতে বাধ্য হয়, ফলে ৮ জনের মৃত্যু ঘটে ও ১৯ জন আহত হয়। ৫ই মার্চ যশোর থেকে খুলনায় আসার পথে ফৌজের উপর জনতা হামলা চালালে তাদের গুলি চালাতে হয় যেখানে তিনজন নিহত ও কিছু সংখ্যক আহত হয়। ..... দায়িত্ব পালনের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও হতাহতের সম্মুখীন হয় যার মধ্যে একজন অফিসার নিহত ও একজন আহত হয়। ২রা-৩রা মার্চের রাতে নওয়াবপুর ঠাটারীবাজারের ঘটনায় ইপিআর ৬ জনকে নিহত ও ৫৩ জনকে আহত করে। ইপিআর-এর একজন সদস্য আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালালে ৪ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়। প্রদেশ জুড়ে হতাহতের ঘটনায় সেনাকর্তৃক নিহতের সংখ্যা ২৩ আর আহতের সংখ্যা ২৬। এদের মধ্যে ২রা-৩রা মার্চের রাতে সদরঘাটে (ঢাকা) সেনাবাহিনীর উপর জনতা হামলা করলে ৬ জন নিহত হয়। ৩রা মার্চ বিক্ষুব্ধ জনতা থেকে সেনাবাহিনী স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্র রক্ষা করার সময় একজন নিহত হয়।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।)

বাঙালীরা এই হিসাব বিশ্বাস করেনি। তাদের ধারণা ছিল এই হ্যান্ডআউটে প্রকৃত সংখ্যা থেকে কমিয়ে লেখা হয়েছে। বরং তারা সংবাদপত্রের অতিরঞ্জিত হেডলাইনগুলোই বিশ্বাস করেছিল যেখানে বলা হয়, "শত শত মানুষ গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ছুটছে", "সেনাবাহিনীর বুলেটের আঘাতে হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ছে", "আক্রান্তদের মধ্যে নিষ্পাপ নারী ও শিশুও আছে।"



হ্যান্ডআউটের মত সংবাদপত্রেও যে খবরটা আসেনি তা হল (পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক লোকসহ) অবাঙালীদের দুঃসহ যাতনা, যারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হাতে অত্যাচারিত হয়েই চলছিল। কর্তৃপক্ষকে এটা বলা হয় যেন তারা আওয়ামী লীগের কার্যত শাসনকালের সময় তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করে, কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা এর জন্য দুটো কারণ দেখায়। প্রথমত, তারা বলে যে এটা দ্বিজাতিতত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করবে (মুসলমানরাই মুসলমানদের মারছে)। দ্বিতীয়ত, এতে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিশোধের উস্কানি দিতে পারে যেখানে বাঙালীদের একটা বড় অংশ শান্তিতে বসবাস করছে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেডকোয়ার্টারে সুপারিশ করা হল যে এসব নৃশংসতার খবর যদি পরে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা ঘটনা-পরবর্তী চিন্তা হিসেবে নেয়া হবে। রাওয়ালপিন্ডিও টগবগ করে ফুটতে থাকা রক্তের পিপার ঢাকনাটা শক্ত করে বন্ধ করে রাখল। রাষ্ট্রপতি এখনও রাওয়ালপিন্ডিতে সময় ক্ষেপণ করছিলেন। তিনি কি তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন? তাঁর আগমন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা অধিগ্রহনে যেন সহায়ক না হয়, সেই আশায়?

এদিকে মুজিব তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে শেষ খেলায় মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলেন যদি তিনি (রাষ্ট্রপতি) পরিস্থিতির বাস্তবতা স্বীকার করতে না চান। কর্নেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী মুজিবের কার্যত কমান্ডার-ইন-চিফ হলেন। তার ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী তৈরী হল আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর প্রাক্তন সার্ভিসম্যানদের নিয়ে। অস্ত্রের দোকান লুট করে আর সরকারী অস্ত্রাগার খুলে দিয়ে তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা হল। আনসারদের সব রাইফেল, যেগুলো প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ছিল, এখন তাদের নামে দেয়া হল। অভ্যন্তরীণ অস্ত্রের মজুদকে আরও শক্তিশালী করতে দেশের বাইরে থেকে (মূলত ভারত থেকে) ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী রিলিফের মালামালের সাথে অস্ত্রের বহর পাঠিয়ে দেয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা তাদের গবেষণাগারে হাতে বানানো 'বোমা' তৈরী করতে থাকল। তারা রোডব্লক তৈরির আর ব্যারিকেড দাঁড় করারও মহড়া দিতে থাকল। একজন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, যিনি তখন সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না, যখন মুজিবকে বললেন যে, "এইভাবে তুমি পেশাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না", তিনি বললেন, "আরে আমি জানি সেনাবাহিনীর দৌড় কতদূর। তারা ঢাকায় একটা কার্ফ্যু পর্যন্ত ঠিকমত কার্যকর করতে



পারেনি। সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের হাতে বানানো অস্ত্র দিয়ে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও, তার কীই বা করতে পারবে।"

মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী, কর্নেল ওসমানী একটা নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে তাদের সহযোগিতা করার জন্য বাঙালী পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস আর ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নের সাথেও যোগাযোগ করলেন। আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের সামরিক বাহিনী নিয়মিত বৈঠক চালিয়ে গেল। বাঙালী কিছু সার্ভিং অফিসারও এসব বৈঠকে যোগ দিতেন। (পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বেশ কিছু বাঙালী কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের সামরিক প্রস্তুতিতে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল সেন্টার কমানডেন্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদার; ২ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল মাসুদুল হাসান; এবং গভর্নরের পরিদর্শন টিমের লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ইয়াসিন। আরও অনেকে, যারা গ্রেফতার এড়াতে পেরেছিলেন, গর্বে বুক ফুলিয়ে জানিয়েছিলেন যে তারা পূর্ব-পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়ার কথা জানতেন। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) মুশাররফ, মেজর জলিল ও মেজর মইন।) তাদের এই পরিকল্পনার কথা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন। আমি যখন একজন সিনিয়র অফিসারকে বললাম যে বাঙালী ফৌজ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তিনি তীব্রভাবে বলে উঠলেন: "মুখ বন্ধ রাখো। তুমি পৃথিবীর সেরা বাহিনী - পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর কলঙ্ক লেপে দিতে চাইছ।"

মুজিবের শাসনের প্রথম দুই সপ্তাহের এই ছিল মোটামুটি বর্ণনা। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম দেখার জন্য, রাষ্ট্রপতির আগমন কী পরিবর্তন নিয়ে আসে।



৮ম অধ্যায়: ত্রিমুখী পরিস্থিতি

আমি অনেক রাষ্ট্রপতি আর দেশের প্রধানদের আগমন দেখেছি, কিন্তু ১৫ই মার্চ ঢাকায় যে পরিবেশের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এসে অবতরণ করলেন তা আমি কখনই ভুলব না। বিমান বন্দরে প্রবেশের সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। টার্মিনাল ভবনের ছাদের উপর স্টিলের হেলমেট পরা প্রহরীদের দাঁড় করানো হয়। বিমানবন্দর ভবনের প্রতিটি সদস্যকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। পিচঢালা পথে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা - পিএএফ গেটে সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্রে সজ্জিত একটা দলকে বসানো হয়। পদাতিক সৈন্যের (১৮ পাঞ্জাব) ট্রাক ভর্তি একটি কোম্পানী (প্রায় ১০০ জনের) ফটকের বাইরে মেশিন গান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে রাষ্ট্রপতিকে সাথে করে শহরে নিয়ে যাবার জন্য। সতর্কতার সাথে বাছাই করা অল্প কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিমানবন্দরের ভেতরে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তা পাশ দেয়া হয়, আমাকেসহ।

কোন ফুলের তোড়া ছিল না, ছিল না কোন বেসামরিক কর্মকর্তা, 'শহরের অভিজাত'-দের কেউ নেই, নেই সাংবাদিকদের ধাক্কাধাক্কি বা ক্যামেরার ক্লিক। এমনকি সরকারী ফটোগ্রাফারকেও অনুমতি দেয়া হয়নি। এ ছিল এক অদ্ভুত ভীতিকর পরিবেশ যেখানে জড়িয়ে ছিল মৃত্যুর স্তব্ধতা। পিআইএ হ্যাঙ্গারের কাছে একটা ছোট কন্ট্রোল অফিসের বাইরে আমরা সবাই দল বেঁধে অপেক্ষা করছিলাম। রাষ্ট্রপতির আগমনের তখনও পাঁচ মিনিট বাকী ছিল। বিমান বাহিনীর একটা অ্যালুয়েট থ্রি প্রায় একশ মিটার দূরে পাখা ঘুরিয়ে উঠানামা করে অবতরণ আর উড্ডয়নের মহড়া দিচ্ছিল। এটা সেখানে এজন্য রাখা হয়েছিল যে - রাষ্ট্রপতি যদি বিপজ্জনক সড়কপথ এড়াতে চান - সেক্ষেত্রে এটা তাকে তিন কিলোমিটার দূরে শহরে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে পৌঁছে দিবে। রাষ্ট্রপতির অপেক্ষায় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল টিক্কা খান, মেজর-জেনারেল খাদিম রাজা, মেজর-জেনারেল ফরমান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার-জেনারেল, মেজর-জেনারেল এ ও মিঠা।

আমরা একবার ঘড়ির দিকে, আরেকবার পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতির বোয়িং তখনও দৃষ্টির বাইরে ছিল। এদিকে বামদিক থেকে একটা শকুন উড়ে এসে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল; আর ঢাকার বাঙালী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট



হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাদের 'সুসংবাদ' দিলেন যে শেখ সাহেব খুবই দয়াপরবশ হয়ে ফার্মগেট চেক পয়েন্ট সরিয়ে ফেলতে রাজী হয়েছেন যাতে 'অতিথির জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।' এর আগে মুজিব জনসমক্ষে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে 'বাংলাদেশে একজন অতিথি হিসেবে স্বাগতম জানানো হবে।'

বেলা ৩ টায় রাষ্ট্রপতি এসে পৌঁছালেন। পি এ এফ-এর স্কোয়াড্রন লিডার কাজী গ্যাংওয়ে চালিয়ে বিমানের কাছে গেলেন এবং রাষ্ট্রপতি তার নধরকান্তি চেহারায় সুস্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির আলো ছড়িয়ে নেমে এলেন। তিনি হালকাভাবে কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছিলেন। যে পুরুষ ক্রুরা তাকে শ্রীলংকা থেকে নিয়ে এসেছে তাদের কথা উল্লেখ করে বললেন, "তারা খুব সাহসী ছেলে, সাবাস।" তারপর তিনি সবার সাথে হাত মেলালেন, এমন কি আমার সাথেও। তার মন বা বিবেকের উপর কোন বোঝা আছে বলে মনে হল না। যেন কোন সৈন্যদলের সাথে নিয়মিত সাক্ষাতে এসেছেন এমন একটা গা-ছাড়া ভাব। তার মধ্যে এমন কোন সচেতনতা দেখা গেল না যে আমরা দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকি একেক সময় মিনিটের পর মিনিট কী দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

এর মধ্যেই ভিআইপিদের সামনে চার তারা সম্বলিত গাড়িটি এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জেনারেল টিক্কা খান হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বললেন, "আপনি কি গাড়িতে করে যাবেন?" "তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?", "না, মানে, হেলিকপ্টারও প্রস্তুত আছে।" "না, আমি সড়কপথেই যাব।" জেনারেল টিক্কা খান তার সাথে একই গাড়িতে উঠলেন, বাকীরা পেছনে অনুসরণ করলেন। ১৮ পাঞ্জাবের কোম্পানী তাদের সঙ্গ দেবার দায়িত্ব পালন করল। রাষ্ট্রপতির শহরের দিকে যাত্রার অগ্রগতির খবর ওয়্যারলেস বার্তায় পৌঁছাতে থাকল: তিনি নিরাপদে ফার্মগেট পার হয়েছেন..... এখন তিনি ভিআইপি ভবনের দিকে যাচ্ছেন ..... গাড়ীর বহর রাষ্ট্রপতি ভবনের আগে শেষ মোড়টা পার হয়েছে ..... রাষ্ট্রপতি নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছেছেন। অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। একটা বড় বাধা শান্তিপূর্ণভাবে পার করা গেল।

সেই সন্ধ্যায়ই, জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার স্থানীয় সিনিয়র সামরিক অফিসারদের ডেকে পাঠালেন ঐ মুহূর্তের পরিস্থিতির বিবরণ দেয়ার জন্য। অন্যান্যদের সাথে জেনারেল টিক্কা, খাদিম, ফরমান এবং এয়ার কমোডর মাসুদ এতে যোগ দেন। আদর্শ সেনা নিয়ম অনুযায়ী



ব্রিফিং শুরু হল এবং নিয়মমাফিক প্রক্রিয়ায় তা এগিয়ে চলল: মিশনের বর্ণনা, সমস্যার গুরুত্ব (শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে), ব্যবহারযোগ্য বাহিনীর সংখ্যা ও বিভিন্ন এলাকায় তাদের বিন্যাস। সব ব্রিফিং-এর মত এটাও একটা কনফিডেন্ট নোট দিয়ে শেষ হল।

রাষ্ট্রপতির সামনে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীরতা নিয়ে কোন বিবরণী উপস্থাপন করা হল না। কিংবা কোন সুপারিশও করা হল না। এই উপেক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে আমি যখন সিনিয়র অফিসারদের একজনকে পরে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, "রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কখনও জানতে চাননি। তার নিজস্ব উপদেষ্টা আছে। তিনি তাদের গবেষণার উপরই ভরসা করেন। তিনি অকুস্থলে থাকা মানুষদের মতামতের থোড়াই পরোয়া করেন।"

ব্রিফিং-এর শেষে রাষ্ট্রপতি বললেন, "চিন্তা করো না। আমি কাল মুজিবের সাথে একজোট হব ..... তাকে আমার মনের কথা খুলে বলব ..... তাকে পাত্তা দিব না আর তাকে মধ্যাহ্ন ভোজের দাওয়াত পর্যন্ত দিব না। এরপর তার সাথে পরের দিন আবার দেখা করব, আর দেখব সে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়। সে যদি ভদ্র আচরণ না করে, আমি আমার উত্তর পেয়ে যাব।" হঠাৎ নিরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর কিছু মুহূর্তের পর, একজন দীর্ঘদেহী পেশীবহুল ব্যক্তি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপনের অনুমতি চাইলেন। মাথা নুইয়ে তাকে অনুমতি দেয়া হল। তিনি বললেন, "স্যার, পরিস্থিতি খুবই নাজুক। এটা অবশ্যই একটা রাজনৈতিক ব্যাপার, আর একে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে, নয়ত হাজার হাজার নিরপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশু প্রাণ হারাবে ..... ।" ইয়াহিয়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, আর অন্যরা শুনছিলেন ভীতির সাথে। রাষ্ট্রপতি তার চোখের পাপড়ি নাড়াতে নাড়াতে মাথা দুলিয়ে বললেন, "মিটি, আমি তা জানি ..... আমি তা জানি ..... ।" মিটি বসলেন। (কিছুদিন পর, তাকে চুপচাপ তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হল। তার কাছে শুধু তার নৈতিক সাহসিকতার বোঝাটুকুই রয়ে গেল।) সভা ভঙ্গ হল। এটাই ছিল ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের ডাকা শেষ সামরিক সভা। এরপর তিনি তার রাজনৈতিক কার্যক্রমের দিকে মন দেন।

পরদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে তিনি মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। দুই পক্ষের কারুরই কোন সহচর ছিল না। এতে এমন বোঝানো হয় যে এটা ছিল ভঙ্গ করা চুক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত



করার এক অনানুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা। ইয়াহিয়ার এটা বুঝতে সময় লাগল না যে মুজিব তার আস্তিনের তলায় কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছেন আর তিনি রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে তেমন খোলাখুলি সাড়া দিচ্ছিলেন না যেমনটা প্রাক-নির্বাচনী দিনগুলোতে দিতেন। রাষ্ট্রপতি হতাশ হলেন। আশ্চর্য ব্যাপার হল, (আপাতদৃষ্টিতে) তিনি পুরো এক বছর ঘাসের মধ্যে থাকা সাপটাকে দেখতে পাননি, যদিও এমনটা বলা হয় যে নেতাদের এতটাই সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল হওয়া উচিৎ যেন ঘাসের বেড়ে ওঠার শব্দও শুনতে পান।

বাস্তবে, গত দুই সপ্তাহের ঘটনাবলী আপোষ-মিমাংসার সব রকমের পরিবেশ কুরে কুরে খেয়ে দিয়েছে। এই সময়টায় মুজিব দৃঢ় হস্তে প্রদেশ শাসন করেছেন। বেসামরিক প্রশাসন ও জনগণের উপর তার দখল ছিল চরম। এই কার্যত নিয়ন্ত্রণের পিছনে চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল গত নির্বাচনে জনগণের দেয়া গুরভার আজ্ঞা। মুজিব কেন স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে যাবেন? বরং তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা একজন অতিথিকে একটু জায়গা দিতে পারেন এই শর্তে যে এর বিনিময়ে সেই অতিথি তার সংবিধানের খসড়ায় অনুমোদন দিবেন।

অন্যদিকে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান এখনও মনে করছিলেন যে সর্বময় ক্ষমতা তার দখলে আছে, যেহেতু তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি, চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ। তিনি একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে পর্যাপ্ত ছাড় আদায় না করে কেন প্রশ্রয় দিবেন? এখানেই ছিল মূল দ্বন্দ্ব। তাদের দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তাদের কথা বলছিলেন। প্রত্যেকেই ভাবছিলেন যে তাকেই ছাড় দিতে বলা হচ্ছে।

১৭ই মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিব পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় বসলেন। এটা ছিল একটা কঠিন অধিবেশন। উভয় পক্ষ থেকে যার যার মতামত পেশ করা হল যেখানে কোন রকম আপোষের অবকাশ ছিল না। আওয়ামী লীগ তার দলকে ভালোমত বুঝিয়ে দিয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাদেরকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝাতে পারল না।

আলোচনার পর, মুজিব যখন তার সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বের হয়ে এলেন, ফটকে অপেক্ষারত সাংবাদিকরা তাকে থামাল। আমি ছিলাম, কিন্তু মুজিব আমার ইউনিফর্মের দিকে লক্ষ্যই করলেন না। তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও খুবই ক্ষুব্ধ মনে হল। আমি তার বাম কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।



চেহারাটা ছিল বিবর্ণ। উত্তেজনায় তার পুরো শরীর আর ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছিল। তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে তাড়াহুড়া করে তার ধানমন্ডির বাসার দিকে রওনা দিলেন। সাংবাদিকরা তাকে অনুসরণ করল। আমি বিমূঢ় হয়ে ডালপালায় বিস্তৃত বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাষ্ট্রপতি ভবনের লোহার গেট ঠং করে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে শুধু প্রহরীর বেয়নেটটাই দেখা যাচ্ছিল।

ক্যান্টনমেন্টে ফিরে জানতে পারলাম, জিওসি দিনের আলোচনার ফলাফল জানতে জেনারেল টিক্কা খানের কাছে গিয়েছিলেন। জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন, "খাদিম, আমি তোমার মতই খুব সামান্যই জানি।" "কিন্তু স্যার, সম্মুখ সারির মানুষ হিসেবে আপনার তো অধিকার আছে সবকিছু জানার যাতে আপনাকে পরে অসচেতন হিসেবে ধরা না হয়।" সেই সন্ধ্যায়ই জেনারেল টিক্কা খানের সরকারি গাড়ি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করল। ইয়াহিয়া খান তাকে জানালেন, "বেজন্মাটা ভালো ব্যবহার করেনি। তুমি তৈরি হও।" টিক্কা খান রাত ১০টায় জিওসি-কে ফোন দিয়ে বললেন, "খাদিম, তুমি তোমার কাজ শুরু করতে পারো।" এই কথার অর্থ ছিল যে আর্মি অ্যাকশনের জন্য পরিকল্পনা ও কাগজপত্রের প্রস্তুতি শুরু করা যেতে পারে - যেমন করে সেনাবাহিনী সব সময় যে কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে - কিন্তু, এই অ্যাকশন রাজনৈতিক আলোচনার অগ্রগতির উপর নির্ভর করবে। ঢাকার সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতিকে কঠোর হস্তে ব্যবস্থা নিতে জোর করছিল না। তারা তখনও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করছিল যার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে চেষ্টা চলছিল। এটা বলে রাখা দরকার, প্রস্তুতিপর্ব যে আসল উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বহন করবেই তা কিন্তু নয়। কেউ যদি কোন দেশের সামরিক নথিগুলো খুঁজে বের করে, সেখানে দেশের সম্ভাব্য শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার সাথে সাথে আত্মরক্ষার পরিকল্পনাও খুঁজে পাবে। এটা শুধুই আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুতির পরিকল্পনা ছিল।

তাই এক্ষেত্রে যে অভিযোগ আনা হয় সেগুলোর পিছনে ছিল দুর্বল তথ্য সরবরাহ থেকে শুরু করে সবচেয়ে বিদ্বেষপরায়ণ আচরণ, যেটা কিছু বিদেশী লেখক করেছেন, যে শুধুমাত্র শক্তি বৃদ্ধি আর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য সময় নিতেই ঢাকার আলোচনা চালানো হচ্ছিল। আমি নিজে জানি যে মুজিবের কার্যত শাসনকালের পঁচিশ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন অতিরিক্ত ফৌজ আনা হয়নি বা পূর্ব পাকিস্তান থেকেও নেয়া হয়নি। তার উপর, মিলিটারী অ্যাকশনের পরিকল্পনা করতে দশ দিনের মত এত লম্বা সময়ও লাগেনি (ইয়াহিয়ার আগমন ১৫ই মার্চ আর পরবর্তী কঠোর ব্যবস্থা ২৫শে মার্চ)। বাস্তবে,



এটা করতে দশ ঘন্টাও লাগেনি। এবং আমি আপনাদের বলব কিভাবে কখন এটা প্রস্তুত করা হয়, উপস্থাপন করা হয় আর অনুমোদন করা হয়।

১৮ই মার্চ সকালে মেজর-জেনারেল খাদিম রাজা ও মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলী মূল অপারেশনাল পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে জিওসি-র অফিসে মিলিত হলেন। দু'জনেই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে অপারেশন 'BLITZ' (অর্থাৎ, জনগণের সহযোগিতা)-এর মূলনীতি এখন আর প্রাসঙ্গিক নেই, যেমনটা ১লা মার্চ থেকে পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে। তারা এই বিষয়েও একমত পোষণ করলেন যে অপারেশন 'BLITZ'-এর লক্ষ্য (মার্শাল ল-কে চিরায়ত নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করা), একইভাবে অন্য ঘটনাবলীর নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। এখন, যদি কোন অ্যাকশন নিতে হয় এবং যখনই নিতে হয়, সেটা মুজিবের কার্যত শাসনকে পরাস্ত করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নিতে হবে।

একই বৈঠকে, জেনারেল ফরমান হালকা নীল অফিস প্যাডে সাধারণ একটা স্কুল পেন্সিল দিয়ে নতুন পরিকল্পনা লিখলেন। আমি জেনারেল ফরমানের পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় মূল পরিকল্পনাটি দেখেছিলাম। জেনারেল খাদিম এর দ্বিতীয় অংশটি লিখেছিলেন, যেখানে ফৌজবাহিনীর বন্টন এবং ব্রিগেড ও ইউনিটের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের কথা বলা হয়।

'অপারেশন সার্চলাইট' নামের এই পরিকল্পনায় ছিল পাঁচ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ষোলটি অনুচ্ছেদ (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)। অনুমান করা হয় যে এই পরিকল্পনা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন সহ সকল বাঙালী ফৌজ বিদ্রোহ করবে। এজন্য, তাদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মুজিবের ডাক দেয়া 'অসহযোগ' আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করতে সকল বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাকে রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকে থাকা অবস্থায় গ্রেফতার করতে হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে পরিশিষ্ট হিসেবে ষোলজন বিশিষ্ট ব্যক্তির তালিকাও করা হয় যাদেরকে বাড়িতে গিয়ে গ্রেফতার করা হবে।

২০শে মার্চ বিকালে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে জেনারেল হামিদ ও লেফটেন্যান্ট-জেনারেল টিক্কা খানের সামনে এই হাতে লেখা পরিকল্পনা পড়ে শোনানো হয়। তারা দু'জনেই এই পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলোর সাথে একমত হন, তবে জেনারেল হামিদ একটি ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন যেখানে বাঙালী ফৌজকে নিরস্ত্র করার কথা বলা হয়েছিলো, কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "এতে পৃথিবীর অন্যতম উঁচু দরের একটা সৈন্যদলকে ধ্বংস করা



হবে।' যা হোক, তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের মত আধাসামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করার পক্ষে অনুমোদন দিলেন। তিনি শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "বিভিন্ন দায়িত্বে এই ফৌজদেরকে বন্টন করার পর, তোমাদের হাতে কি কোন অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী থাকবে?" জিওসি সাথে সাথে জবাব দিলেন, "না, স্যার।"

পরে, রাষ্ট্রপতিও এই পরিকল্পনার একটা মূল অংশ বাতিল করে দেন। তিনি এটা মানতে নারাজ ছিলেন যে একটি পূর্বনির্ধারিত দিনে রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকের সময় আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে গ্রেফতার করা উচিৎ। "আমি রাজনৈতিক সমঝোতায় জনগণের বিশ্বাসকে গলাটিপে হত্যা করতে চাই না। আমি গণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম উঠাতে চাই না।" তিনি ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন, একজন চাক্ষুষ সাক্ষী আমাকে জানান। অবশেষে পরিকল্পনার যা বাকী থাকল তা ছিল শুধুমাত্র ব্রিগেড ও ব্যাটেলিয়নগুলোর মধ্যে দায়িত্ব ও এলাকা বন্টন।

অন্যদিকে, মুজিবের কার্যত কমান্ডার-ইন-চিফ, কর্নেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানীও ইয়াহিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে মিলিটারী অ্যাকশনের জন্য পরিকল্পনার ছক আঁকেন। তিনি গোপনে নিয়মিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যারা ছিলেন তাদেরসহ বাঙালী ফৌজের সাথে যোগাযোগ করেন যাতে তারা মুজিবের ডাকে অ্যাকশনে যেতে প্রস্তুত থাকে। মেজর-জেনারেল (অবঃ) ডি কে পালিতের (The Lightening Campaign, যা ১৯৭১-এর যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পরই প্রচারের লক্ষ্যে ভারতীয় সরকারের অনানুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়) ভাষ্যমতে কর্নেল ওসমানীর পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যধারাগুলো ছিল:

ক) ঢাকা বিমানবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দখল করে পূর্ব পাকিস্তানকে অবরোধ করা।
খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভিত্তি করে সশস্ত্র ছাত্রদের সহযোগিতায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ দ্বারা ঢাকা শহরকে নিয়ন্ত্রণ করা।
গ) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস/ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদেরকে দলত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্ট হামলা ও দখলের কাজে লাগানো।

এইভাবে, উভয় পক্ষই চরম প্রস্তুতি নিল। কারা প্রথম হামলা করবে তা তখনও জানা ছিল না। দেখা গেল, দুই পক্ষই প্রথমে রাজনৈতিক পথ ব্যবহার করতে চাইছে।



১৮ই মার্চ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ও তার উপদেষ্টাদের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা কোন সমাধানের কাছাকাছি যেতে পারল না, এর পর কিছু অগ্রগতির কথা জানা গেল। মুজিবও পরোক্ষভাবে এটা নিশ্চিত করলেন এই বলে যে কোন অগ্রগতি না হলে তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতেন না। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ১৯শে মার্চ, ১৯৭১।) এই ইতিবাচক অগ্রগতির খবর জেনারেল টিক্কা খানের কাছে পৌঁছানো হল, এবং তার মাধ্যমে, মেজর-জেনারেল খাদিম রাজা জানলেন। খবরটা চুঁইয়ে আমাদের মত কয়েকজনের কাছেও পৌঁছাল যারা ক্যান্টনমেন্ট নামের অন্ধকার সুড়ঙ্গে বাস করি। হয়তো তাদের কাছে পৌঁছানো যে কোন আলো সুড়ঙ্গের লোকদের জন্য কয়েকগুণ বেড়ে দেখা দেয়। আমরা ভবিষ্যতের ব্যাপারে উৎফুল্ল ও আশাবাদী হয়ে উঠলাম। আমাদের কেউ কেউ তাদের পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর চিন্তা বাদ দিল। যদিও, আমাদের মধ্যেকার কট্টর বাস্তববাদীরা, তাদের পরিবারদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিল।

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনায় আওয়ামী লীগের যে প্রস্তাবটির প্রতি আলোকপাত করা হয় তা হল তাৎক্ষণিকভাবে মার্শাল ল তুলে দিয়ে কোন পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, এবং আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাখা। আর সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করেছিল যেন জাতীয় সংসদকে প্রথম থেকেই দুইটি কমিটিতে ভাগ করা হয় যার প্রতিটিতে পূর্ব ও পশ্চিম অংশ থেকে এমএনএ থাকবে। কমিটিগুলো প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে ইসলামাবাদ ও ঢাকায় বৈঠক করে পৃথক পৃথকভাবে রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর জাতীয় সংসদ এই রিপোর্টগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য বসবে এবং দুইয়ের মধ্যে সমঝোতার রাস্তা বের করবে। ইতোমধ্যে, ১৯৬২-র সংবিধান সংশোধন ও ঘোষণা করা যেতে পারে, যেখানে ছয় দফার উপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও তাদের নিজস্ব স্বায়ত্বশাসনের পরিধি তৈরী করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ করার কথা ছিল। রাষ্ট্রপতি এতে একটা ভালো দিক দেখেছিলেন: এতে তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি তখনও রাষ্ট্রপতিই থাকবেন, তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার পছন্দের উপদেষ্টারাই থাকবে। প্রেসের রিপোর্ট মতে এটিই ছিল আশা ও অগ্রগতির ভিত্তি।



কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে কিছু বড় ধরণের ঘাপলা ছিল। মার্শাল ল যদি তুলে দেয়া হয়, তাহলে ইয়াহিয়ার শাসন তার আইনসিদ্ধতা হারাবে আর প্রদেশগুলো তখন মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারবে। তারপরও ইয়াহিয়া মুজিবের কাছে অঙ্গীকার করলেন যে ভুট্টো যদি এতে কোন আপত্তি না তোলেন তাহলে এই পরিকল্পনা গৃহীত হবে। এজন্য ভুট্টোকে আবারও একবার ঢাকায় আসতে বলা হল। তিনি তখনও করাচীতে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সেখান থেকে তিনি এর মধ্যেই রাষ্ট্রপতির কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে এড়িয়ে গিয়ে যদি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে সেটা কোন কাজে আসবে না। (পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিন্ডি, ১১ই মার্চ, ১৯৭১।) ভুট্টো ঢাকায় আসতে অস্বীকার করলেন, কারণ তিনি বললেন, তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে আগেই তার দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, মুজিব সভার টেবিলে ভুট্টোর উপস্থিতির বিরুদ্ধে ছিলেন, যেহেতু তিনি (মুজিব) পূর্ব পাকিস্তানে রক্তক্ষয়ের জন্য তাকে (ভুট্টো) দায়ী করেন। ভুট্টো এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য জোর দিচ্ছিলেন যে মুজিব তার সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত থাকবেন।

টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে যখন ভুট্টোকে ঢাকায় আনার জন্য প্ররোচনা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল, আমি সে সময় ঢাকা প্রেস ক্লাবে যাই যেখানে মুজিবের কাছের একজন, প্রবীণ সাংবাদিক জনাব হোসেনের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন, "আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, ভুট্টোর দাবী অবান্তর। একবার যখন আমরা ইয়াহিয়াকে বোঝাতে পেরেছি, ভুট্টোকে বোঝানো এখন তারই দায়িত্ব। আর ভুট্টো যদি তাকে অমান্য করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।" স্পষ্টতই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ইয়াহিয়া অমনটা করলে নিজের পায়েই কুড়াল মারবেন।

ফেরার পথে আমি 'পিপল'-এর অফিসে নামলাম, এটি এমন এক উগ্র দৈনিক পত্রিকা যা সেনাবাহিনীর বদনাম করে আজগুবী সব কাহিনী ছাপানোর জন্য কুখ্যাত। নিউজ রুমে গিয়ে তিনজন আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টারকে পেলাম যারা বর্তমান সংকটের সময় সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে জেরা করা শুরু করলেন। তাদের একজন, যদি ঠিকমত মনে করতে পারি, শাহাবুদ্দিন নাম, বললেন, "তুমি কি মনে কর না যে সেনাবাহিনী যেহেতু নিজের রক্তের বিনিময়ে দেশকে রক্ষা করে, তাই তাদেরই দেশ শাসনের অধিকার আছে?" "না আমি তা মনে করি না। অফিসার আর সেনাদের বেশির



ভাগই নিজের ভূমিকা হিসেবে সীমান্ত প্রহরার চেয়ে বেশি কিছু দাবী করে না।" "তাহলে, তোমরা জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে দেশ শাসনের ভার কেন ছেড়ে দাও না। তোমার আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান কেন মেনে নাও না?" "এটা মেনে নেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি ও রাজনীতবিদদের। সেনাবাহিনীর সাধারণ পদস্থ সৈনিকদের এই ব্যাপারে কিছুই বলার নেই।"

সাদা শার্ট ও কালো রিমের মোটা কাঁচের চশমা পরিহিত দ্বিতীয় ব্যারিস্টার তর্কে যোগ দিলেন: "আমি তো বলব তোমরা আওয়ামী লীগের সংবিধানকে একটা সুযোগ দিয়েই দেখ। যদি দেখ যে এটা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, যেমনটা তোমরা ভয় পাচ্ছ, তাহলে বাতিল করে দিও। তোমাদের হাতে তখনও বন্দুকের সাথে সাথে যুক্তিও থাকবে জাতীয় সংহতি রক্ষার কাজে লাগানোর জন্য।" আমি যুক্তি দেখালাম, "আমি মনে করি না একটি সংবিধানকে শুধুমাত্র পরবর্তীতে বাতিল করে দেয়ার জন্য গ্রহণ করা উচিৎ। এটি একটি পবিত্র দলিল যা একবার গ্রহণ করলে অবশ্যই রক্ষা করা উচিৎ।" তিনি তীব্রভাবে বলে উঠলেন, "সেনাবাহিনী আবার কবে থেকে সংবিধানের রক্ষক হয়ে উঠল। তুমি এখন আমাদেরকে সংবিধানের পবিত্রতা নিয়ে বক্তৃতা দাও, এক দশকের মধ্যে দুই-দুইটা বাতিল করার পর।"

তৃতীয় ব্যারিস্টার তখনও তর্কে যোগ দেননি, কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে এমন 'ভারী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা' চলা সত্ত্বেও আমি সম্পাদকের কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। ভারাক্রান্ত এক মন নিয়ে আমি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম। অফিসার্স মেসে উঁকি দিয়ে দেখলাম কয়েকজন অফিসার তখনও টেলিভিশন দেখছে। অনুষ্ঠানে বরাবরের মত আওয়ামী লীগের সত্যিকারের উদ্দীপনা প্রতিফলিত হচ্ছিল, আর উদ্দীপ্ত নারী-পুরুষ দরাজ গলায় স্বাধীনতার গান গাইছিল। তরুণ অফিসাররা সাথে সাথে আমার দিকে ঘুরে তাকাল 'শহরের সর্বশেষ সংবাদ' শোনার জন্য। আমি তাদেরকে ব্যারিস্টারদের সাথে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। ক্যাপ্টেন চৌধুরী মন্তব্য করলেন, "রাষ্ট্রপতি ব্যাপারটা খুব বেশি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তার দরকার ছিল শুধুমাত্র আদেশটা দিয়ে দেয়া। (ফৌজের) একটা কোম্পানীই যথেষ্ট।"

ভুট্টো ও তার প্রধান সহচররা ২১শে মার্চ এসে পৌঁছালেন। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে আসা সকল অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোটা কর্তব্য ও অধিকার হিসেবে গণ্য করল। তাই



তারা জোর দিল যেন পিপিপি নেতাদের অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের দেয়া হয়। যদিও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিয়ে সেনাবাহিনীর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এজন্য তারা নিজেদের বিকল্প কর্মসূচীর ব্যবস্থা নিয়ে রাখল, কিন্তু প্রথমে আওয়ামী লীগকে আতিথেয়তা করার সুযোগ দিল। যা হোক, খুব তাড়াতাড়িই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল আর সেনাবাহিনী সেই বিকেলেই আওয়ামী লীগের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে নিল।

ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলো রাষ্ট্রপতি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে বললেন যে এখন এটা কার্যকর করার জন্য তার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ভুট্টো এতে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তার নিজস্ব ভাষায় তা ছিল এরকম:

"আমি আমার সহকর্মীদের সাথে দুই-কমিটি পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেছি। তারা সন্দেহ প্রকাশ করে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে যে আমার এই পরিকল্পনা মেনে নেয়া উচিৎ হবে না কারণ এতে দুই পাকিস্তানকে পৃথক করার বীজ লুকানো আছে। .... আমরা এ ব্যাপারেও একমত হয়েছি যে এই পরিকল্পনা জনগণের পূর্ণ অবগতির জন্য তুলে ধরে তাদেরও অনুমোদন নেয়া লাগবে। দুই-চারজন রাজনৈতিক নেতা মিলে সাংবিধানিক ও আইনসিদ্ধ ক্ষমতায় নির্বাচিত পুরো সংসদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে পারে না।" (জেড এ ভুট্টোর The Great Tragedy, পৃ: ৪১।)

অর্থাৎ বহুল প্রতীক্ষিত ভুট্টোর অনুমোদনের দেখা পাওয়া গেল না। দুর্ভাগ্যজনক ত্রিমুখী অবস্থা জারি রইল।

এভাবেই এল ২৩শে মার্চ - ঐতিহাসিক পাকিস্তান দিবসের বার্ষিকী যা ১৯৪০-এ পাকিস্তান বিভাজনের উত্তরণের স্মৃতি বহন করে। আওয়ামী লীগ এটাকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করল। তারা পাকিস্তানের পতাকা পোড়াল, কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহ-র ছবি ছিঁড়ে ফেলল ও তার কুশ পুত্তলিকা দাহ করল। এর বদলে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা ওড়াল ও শেখ মুজিবর রহমানের ছবি প্রদর্শন করল। বেতার ও টেলিভিশনে রবি ঠাকুরের সোনার বাংলা-কে নতুন জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রচার করা হল। এটা ছাত্রদের করা কোন তামাশা ছিল না। মুজিব এর পক্ষে ছিলেন। সকালে তিনি ছাত্রনেতাদের এক প্রতিনিধি দলকে তার বাড়িতে অভ্যর্থনা জানান, তার বাড়ির (কার্যত



রাষ্ট্রপতির বাড়ির) ছাদে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে দেন এবং তার বাড়ির সামনে ছাত্রদের কাছ থেকে স্যালুট গ্রহণ করেন।

পুরো শহরটা নতুন লাল-সোনালী পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের পতাকা শুধুমাত্র দুই জায়গায় দেখা যাচ্ছিল - গভর্নমেন্ট হাউজ ও মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু চালাক বাঙালী ছেলে গভর্নমেন্ট হাউজের পশ্চিম ফটকে বাংলাদেশের একটা ছোট পতাকা লাগানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিল; কিন্তু সংযুক্ত পাকিস্তানের প্রতীক তখনও মূল ভবনের উপর পতপত করে উড়ছিল। যদিও, একে একদম একা দেখা যাচ্ছিল।

বাঙালী যুবসমাজ জয় বাংলা স্লোগানে শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে তুলল। এটা তাদের জন্য যেন স্বাধীনতা দিবসের মত ছিল। শুধু সামান্য কিছু বিশৃঙ্খলাকারীকে সরিয়ে নিতে হচ্ছিল, আর এই কাজটা রক্তপাত ছাড়া করার জন্য মুজিব সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

২৪শে মার্চ, আওয়ামী লীগ নতুন প্রস্তাবনা নিয়ে এল। তারা সংবিধান কমিটি নিয়ে তাদের আগের প্রস্তাব বাতিল করে তার বদলে সংবিধান সম্মেলনের উপর জোর দিল। এই সম্মেলনগুলো হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সংবিধান প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে আর জাতীয় সংসদ অধিবেশন হবে এই সংবিধানগুলোকে একত্র করে 'পাকিস্তান কনফেডারেশন'-এ রূপান্তর করার জন্য। একই দিনে ভুট্টোও রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করলেন। তারা দুজনেই একমত হলেন, সম্ভবত প্রথমবারের মত নয়, যে আওয়ামী লীগ ধীরে ধীরে তাদের দাবীকে প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন থেকে সরিয়ে পাকিস্তানের সাংবিধানিক বিভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য তারা যে কার্যক্রমই গ্রহণ করার জন্য মনস্থ করে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুন না কেন, ঘোষণা দেয়া হল যে আলোচনা এখনও চলছে। যা হোক, আওয়ামী লীগের সাধারণ সচিব, তাজউদ্দিন আহমেদ, সন্ধ্যায় ঘোষণা দিলেন যে তার দল "তাদের চুড়ান্ত প্রস্তাবনা পেশ করেছে এবং এতে আর কিছু যোগ করার নেই বা সমঝোতা করারও কিছু নেই।" (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১।)

ভুট্টোর সহচারীরাসহ পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা, বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টারা করাচী ফিরে যেতে শুরু করলেন, যেমনটা ঝড়ের আগে বিচক্ষণ পাখিরা তাদের বাসায় পালিয়ে যায়।



পরিস্থিতির সর্বশেষ হাওয়া নির্ধারণের জন্য আওয়ামী লীগের নিজস্ব কিছু হাতিয়ার ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সমর্থকদের একজন আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন, "আমরা তখনও আশায় ছিলাম যে সমঝোতার আলোচনা চলছে। কেউ একবারও বলেনি যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কিংবা কেউ এমনটাও সাবধান করে দেয়নি যে আমরা সীমা পার হয়ে মৃত্যু আর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার কি মনে হয় কনফেডারেশন প্রস্তাব দেয়ার পর তখনও কিছু আশা ছিল?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "এখানেই তো আমাদের হিসাবের গরমিল হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, আর আমাদের সরকারের অভ্যন্তরীণ সূত্রের কাছ থেকেও নিশ্চিত হয়েছিলাম, যে সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে। তাই আমরা জোরে সোরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এটা ভুলে গিয়েছিলাম যে এই অকুস্থলে ভুট্টো এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা যখন পিআইএ-র ফ্লাইট ধরছিলেন, জেনারেল ফরমান ও জেনারেল খাদিম তখন আর্মি অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হতে ব্রিগেড কমান্ডারদের (ঢাকার বাইরে) নির্দেশ পৌঁছে দিতে দুটি হেলিকপ্টারে চড়লেন। (এর আগ পর্যন্ত অপারেশন সার্চলাইট-এর পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলেও জারি করা হয়নি।) তারা যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার দুররানি (যশোর) ও ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফিকে (কুমিল্লা) ব্রিফ করলেন। ফরমান ঢাকায় ফিরে এলেন, আর খাদিম কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম গেলেন। চট্টগ্রাম ছিল খুবই ঝামেলার জায়গা, কারণ সেখানে একমাত্র সিনিয়র অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার যিনি আওয়ামী লীগের সাথে যোগসাজশের জন্য পরিচিত ছিলেন। জিওসি সুকৌশলে ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করলেন। তিনি নির্দেশগুলো চুপচাপ সেখানকার সবচেয়ে সিনিয়র অবাঙালী অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ফাতিমির কাছে পৌঁছে দিলেন এবং তাকে বললেন যে এটা তার কাছেই চেপে রাখতে যাতে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফি কুমিল্লা থেকে আসার সময় পান। এর পাশাপাশি, তিনি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এই বলে বোঝান যে ২ ইস্ট বেঙ্গল, যারা জয়দেবপুরে (ঢাকার উত্তরে) অবাধ্যতার লক্ষণ দেখিয়েছে, তাদেরকে শান্ত করতে 'বাবা বাঘ'-এর কাছ থেকে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক বাণীর দরকার হয়ে পড়েছে। তিনি মজুমদারকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। এটাই ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মজুমদারের নেতৃত্বের সমাপ্তি।

অন্যান্য গুপ্তচররা, মূলত সিনিয়র স্টাফ অফিসাররা, অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট যেমন সিলেট, রংপুর ও রাজশাহীতে একই মিশন নিয়ে গেল।এইচ-আওয়ারের ব্যাপারে টেলিফোনের



মাধ্যমে পরে যোগাযোগ করার কথা ছিল, কারণ রাষ্ট্রপতি তখনও নির্দেশ দেননি। আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা তখনও চলছিল। এদিকে, ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেড তাদের লক্ষ্যকেন্দ্রের এলাকায় যতটা গোপনে সম্ভব একটা জরিপ চালিয়ে নিল। তারা বেসামরিক পোশাক ও গাড়ি ব্যবহার করেছিল।

রাষ্ট্রপতি ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসলামাবাদ থেকে তার জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। তাকে মেজর-জেনারেল ফরমান আলীর লেখা ভাষণের একটা খসড়া দেয়া হয়েছিল। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল:

-মুজিবকে চরমপন্থীদের হাতে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নয়, বরং দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

-মুজিবকে কোন অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়নি বরং শুধুমাত্র নিরাপদ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

-ভাষণে পরিষ্কারভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে বেশি বেশি করে বলতে হবে।

যদিও ২৬শে মার্চ, ১৯৭১-এ রাষ্ট্রপতির প্রচারিত ভাষণে এই ব্রিফটুকু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে মুজিবের দেশদ্রোহীমূলক আচরণ (সমান্তরাল সরকার চালনা করা) "কখনই ক্ষমা করা হবে না।" এটা যেন মুজিবের ১লা মার্চে দেয়া সেই কথারই প্রতিধ্বনি ছিল যখন তিনি বলেছিলেন, "আমরা সবকিছু (জাতীয় সংসদ অধিবেশনের তারিখ পেছানো) এমনি এমনিই ছেড়ে দিতে পারি না।"

রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগের খবরটা গোপন রাখা হয় - দশ দিন আগে তার আসার খবরটা যতটা গোপন রাখা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটা ছোট নাটক সাজানো হয়। রাষ্ট্রপতি বিকালে চা খেতে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে (ক্যান্টনমেন্টের ভেতর) যান। বিকালের আলো কমে আসার আগেই রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রা তার গতানুগতিক জাঁকজমক - পাইলট জিপ, মোটর সাইকেল আর চার-তারকাচিহ্ন ও পতাকা সম্বলিত রাষ্ট্রপতির গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি গাড়িতে ছিলেন না। ব্রিগেডিয়ার রফিক তার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন। এই ফাঁকিকে একটা বড় সাফল্য হিসেবে ধরা হয়েছিল, যদিও মুজিবের গুপ্তচরেরা পুরো খেলাই দেখতে পেয়েছিল।



ইয়াহিয়ার কর্মচারীদের একজন, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এ আর চৌধুরী রাষ্ট্রপতির মালপত্র নিয়ে একটা ডজকে বিমানবন্দরে যেতে দেখলেন এবং মুজিবর রহমানকে জানিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা সাতটায় বিমানে ওঠার জন্য রাষ্ট্রপতি যখন পিএএফ গেট দিয়ে ঢুকছিলেন, উইং কমান্ডার খন্দকার, যিনি তার অফিস থেকে দৃশ্যটি দেখেন, মুজিবের কাছে সেই তথ্য পাচার করে দিলেন। পনের মিনিট পর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে এক বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আমাকে ফোন করে বললেন, "মেজর, আপনি কি নিশ্চিত করতে পারেন যে রাষ্ট্রপতি চলে গিয়েছেন?"

ততক্ষণে রাত নেমে গিয়েছে। কেউ তখন জানত না যে এ ছিল এমন এক রাত যার শেষে কোন সুন্দর ভোর ছিল না।



২য় অংশসামরিক-রাজনৈতিক :

৯ম অধ্যায়১ - অপারেশন সার্চলাইট :

২৫শে মার্চ মেজররাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাব্য পরিণাম জেনারেল খাদিম হোসেন-নিয়ে যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখনই সকাল ১১টার দিকে তার সবুজ টেলিফোনটা বেজে উঠল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান লাইনে-ছিলেন। তিনি বললেন, "খাদিম, আজ রাতেই হবে।"

খাদিমের মধ্যে এতে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হল না। তিনি আগে থেকে ই হাতুড়ির ঘা-এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতা গ্রহণের দ্বিতীয় বার্ষিকীর দিনেই সিদ্ধান্তটা নিলেন। জেনারেল খাদিম বার্তাটি প্রয়োগের জন্য তার অধীনস্থদের কাছে পৌঁছে দিলেন। খবরটা যতই নিচের দিকে যেতে থাকল ততই উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকল। কয়েকজন জুনিয়র অফিসারকে বাড়তি রিকয়েললেস রাইফেল জড়ো করা, বাড়তি গোলাবারুদ বরাদ্দ করা বা অকেজো মর্টার সাইট ঠিক করে আবার বসানো নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকতে দেখলাম। কয়েকদিন আগে রংপুর ২৯) ক্যাভালরিথেকে আনা (ট্যাংক ক্রু তাড়াহুড়া করে তাদের ছয়টি মরচে ধরা এমল রাতে এ তেল দিচ্ছি-২৪-ব্যবহারের জন্য। ঢাকার রাস্তায় রণনাদ তুলতে এরাই যথেষ্ট।

১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টরের সাধারণ কর্মচারীরা সকল দূরবর্তী গ্যারিসনগুলোকে এইচআওয়ার সম্পর্কে- অবহিত করতে ফোন করে দিল। তারা এই তথ্য পৌঁছানোর জন্য একটা গোপন সংকেত তৈরি করেছিল। সকল গ্যারিসনের একসাথে কাজ শুরু করার কথা ছিল। সেই চরম মুহূর্ত নির্ধারণ করা হল ২৬শে মার্চ রাত ১ টায়। হিসাব করা হয়েছিল যে ততক্ষণে রাষ্ট্রপতি নিরাপদে করাচী পৌঁছে যাবেন।

অপারেশন সার্চলাইট-এর এ ছাপানো-৩-পুরোটা এই বইয়ের পরিশিষ্ট) হয়েছে (প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরিকল্পনা হয়েছিল দুটি হেডকোয়ার্টার ব্রিগেডিয়ার আরবাবের



অধীন ৫৭ ব্রিগেডকে নিয়ে মেজরজেনারেল ফরমান ঢাকা ও- এর পার্শ্ববর্তী শহরতলী এলাকায় অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন, যেখানে মেজরজেনারেল খাদিমের উপর - প্রদেশের বাকিটুকু দেখার দায়িত্ব ছিল। এর সাথে , লেফটেন্যান্টখান ও জেনারেল টিক্কা- তার অধীনস্থদের দ্বিতীয় রাজধানীতে সামরিক আইন সদর দপ্তরে বসে ঢাকার ভিতরে ও বাইরে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার কথা ছিল। দ্বিতীয় রাজধানী ছিল) বিখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কানের নকশায় করা অত্যন্ত আধুনিক লাল ইটের দালানের এক কমপ্লেক্স। এখনও অসম্পূর্ণ এই স্থাপনার কাজ শুরু হয়েছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে অক্টোবর) ১৯৫৮ (১৯৬৯মার্চ -, পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদে নতুন ফেডারেল রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালীদের মধ্যে যে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল তা প্রশমন করতে। ঢাকা বিমানবন্দরের দক্ষিণদ্বিতীয় পশ্চিম প্রান্তে এই- রাজধানী অবস্থিত।(

এর কিছুদিন আগে, জেনারেল ইয়াহিয়া, খাদিম ও ফরমানের সম্ভাব্য বদলি লোক হিসেবে মেজর জেনারেল এ ও-জেনারেল ইফতিখার জানজুয়া ও মেজর -মিঠাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কোন কারণে যদি ফরমান ও খাদিম কঠোর ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। যেহেতু, তারা জেনারেল ইয়াকুবের সাথে কিছুদিন আগে পর্যন্তও দল গঠন করেছিলেন এবং হয়ত এখনও তার মতাদর্শই ধারণ করেন। এমন কি, জেনারেল হামিদ তো প্রশ্ন করতে খাদিম আর ফরমানের সহধর্মিণীদের কাছে পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন এটা জানতে যে এই ব্যাপারে তাদের স্বামীদের কী মত। যা হোক, দুজনেই হামিদকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তারা বিশ্বস্তভাবে নির্দেশ পালন করবেন।

আমার মত জুনিয়র অফিসাররা রাত ১০টার দিকে মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেডকোয়ার্টারে জোন 'বি'-তে জড়ো হতে শুরু করলাম। রাতটা (দ্বিতীয় রাজধানী) কাটানোর জন্য লনে সোফা ও ইজি চেয়ার বসানো হল আর চাকফির ব্যবস্থা করা - হল। 'দরকারমত কাজে লাগার জন্য' উপস্থিত থাকা ছাড়া আমার আর কোন বিশেষ কাজ ছিল না। এই 'আউটডোর অপারেশনস রুম'-এর পাশেই ওয়্যারলেস সেট যুক্ত একটা জীপ দাঁড় করানো ছিল। নক্ষত্রালোকে মোড়ানো শহরটা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঢাকায় বসন্তের রাত বলতে যতটা সুন্দর রাত হতে পারে, তেমনই ছিল আজকের রাতটা। যে কোন কিছুর জন্য পরিবেশটা ছিল নিখুঁত, শুধুমাত্র রক্তাক্ত হত্যাকান্ড ছাড়া।



সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি আরও এক শ্রেণীর লোক সে রাতে কর্মব্যস্ত ছিল। তারা ছিল আওয়ামী লীগের নেতাগণ ও তাদের ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী যার মধ্যে ছিল বাঙালী সৈন্য, পুলিশ, প্রাক্তন সার্ভিসম্যান, ছাত্র ও দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। তারা মুজিব, কর্নেল ওসমানী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাঙালী অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। তারা সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিবন্ধকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঢাকা শহরে ফৌজের প্রবেশ রোধ করার জন্য তারা অসংখ্য রোডব্লক বসালো।

জীপে লাগানো ওয়্যারলেস সেট রাত ১১এর দিকে প্রথমবারের মত গুঙিয়ে-৩০: উঠল। স্থানীয় কমান্ডার -এইচ (ঢাকা)আওয়ার শুরু করার অনুমতি চাইল , কারণ 'অপর পক্ষ' অতি দ্রুত বাধার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সবাই যার যার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাষ্ট্রপতি তখনও কলম্বো ও করাচীর মাঝামাঝি আছেন। (শ্রীলংকা) জেনারেল টিক্কা সিদ্ধান্ত দিলেন, "ববিকে বল (আরবাব), যতক্ষণ পারে অপেক্ষা করতে।"

নির্দিষ্ট মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের ব্রিগেডের নিম্নোক্ত কাজগুলো করার কথা ছিল :

-১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সংরক্ষিত সেনা হিসেবে থাকবে ও দরকার হলে ক্যান্টনমেন্টের প্রতিরক্ষা করবে।

-৪৩ লাইট অ্যান্টিরেজিমেন্ট (এলএএ) এয়ারক্রাফট-, যাদেরকে ভারতের উপর দিয়ে ওভারফ্লাইট নিষিদ্ধ করার পর অ্যান্টিএয়ারক্রাফটের দায়িত্ব দিয়ে- বিমানবন্দরে আনা হয়েছিল, তারা বিমানবন্দর এলাকার দেখাশোনা করবে।

-২২ বালুচ, যারা এর মধ্যেই পিলখানার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস লাইনসে ছিল, তারা প্রায় ৫০০০ ইপিআর সদস্যকে নিরস্ত্র করে তাদের ওয়্যারলেস এক্সচেঞ্জ আটক করবে।

-৩২ পাঞ্জাব রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে ১০০০ 'অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ' পুলিশকে নিরস্ত্র করবে, যারা আওয়ামী লীগের জন্য সশস্ত্র লোকবলের সম্ভাব্য প্রধান উৎস।

-১৮ পাঞ্জাব নওয়াবপুর এলাকা ও পুরনো ঢাকায় ছড়িয়ে পড়বে যেখানে বলা হচ্ছিল যে অনেক হিন্দু বাড়ীকে অস্ত্রাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।



-ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী ও আশেপাশের বিহারী এলাকা মোহাম্মদপুর), মিরপুরনিয়ন্ত্রণ করবে। (

-১৮ পাঞ্জাব, ২২ বালুচ ও ৩২ পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে কোম্পানী নিয়ে গঠিত একটি সমন্বিত সেনাদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে ধুয়ে ফেলবে বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল যেগুলোকে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের শক্তিশালী আস্তানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

-স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের একটি প্লাটুন মুজিবের বাড়িতে হামলা করে তাকে (কমান্ডো) জীবিত আটক করবে।

-এম ট্যাংকের ২৪-একটি স্কেলিটন স্কোয়াড্রন প্রথম আক্রমণের সামনে থাকবে, মূলত শক্তির প্রদর্শন হিসেবে। যদি দরকার পড়ে, তাহলে তারাও আক্রমণ করতে পারে।

এই ফৌজদের উপর নির্দেশ ছিল, যার যার এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহাড়া দেয়া, প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা এবং তাল (যদি তা দেয়া হয়)িকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদেরকে তাদের বাসা থেকে গ্রেফতার করা।

ফৌজদের তাদের লক্ষ্যকেন্দ্রের এলাকায় রাত ১ টার আগে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু দল, রাস্তায় দেরি হতে পারে চিন্তা করে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাত ১১এর দিকেই রওনা দেয়া শুরু করেছিল-৩০:। যারা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাংক প্রভৃতি পাহাড়া দেয়ার জন্য আগে থেকেই শহরে ছিল, তারাও এইচআওয়ারের অনেক- আগেই যার যার অবস্থান নিয়ে নিল।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হওয়া প্রথম কলামটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ফার্মগেটে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়। কলামটি বাধাপ্রাপ্ত হয় এক বিশাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে যেটাকে সদ্য কেটে রাস্তার মাঝখানে ফেলা হয়েছে। পাশের ফাঁকা অংশগুলো পুরনো গাড়ি আর অকেজো স্টিম রোলার দিয়ে আটকানো ছিল। ব্যারিকেডের অপর পাশে শহরের দিকটায় হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী দাঁড়িয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিল। জেনারেল টিক্কার হেডকোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের উদ্দীপ্ত হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। দ্রুতই জয় বাংলা স্লোগানের সাথে রাইফেলের



গুলির আওয়াজ মিশে গেল। একটু পরে , স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গোলার বিস্ফোরণ হয়ে বাতাস চিরে গেল। এরপর, এক মিশ্র আওয়াজ আসতে থাকল গুলি আর জ্বালাময়ী স্লোগানের, সময় সময় লাইট মেশিন গানের আওয়াজও আসছিল। পনের মিনিট পর শব্দগুলো হালকা হয়ে আসতে শুরু করল আর স্লোগান কমে আসা শুরু হল। আপাতদৃষ্টিতে, অস্ত্রের জয় হল। সেনাবাহিনীর কলাম শহরে ঢুকে পড়ল।

এভাবে নির্ধারিত সময়ের আগেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। এখন আর পূর্বনির্ধারিত এইচআওয়ারের জন্য বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। নরকের দরজা - ততক্ষণে খুলে দেয়া হয়েছে। যখন প্রথম গুলিটি ছোঁড়া হল, "তখন সরকারী পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে খুব মৃদুভাবে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল শেখ মুজিবর - তাই হবার কথা যে এটা রহমানের কণ্ঠস্বরের। শুনে মনে হল এবং শেখ মুজিবর রহমানের পূর্বধারণকৃত একটা বার্তা যেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন।ডেভিড লুসাকের) '' Pakistan Crisis, লন্ডন, পৃ-৯৮ : (।৯৯এই ঘোষণার পূর্ণ লিখিত রূপটি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃ ক প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্টস -এ দেয়া হয়। এতে বলা হয়, "এটা হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান করছি, যে যেখানে আছ ও যার কাছে যা আছে, সবকিছু নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর দখলকে বাধা দিয়ে যাও। তোমাদের লড়াই ততক্ষণ পর্যন্ত চলতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ সৈনিক বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হয় ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।) ''Bangla Desh Documents, ভল্যুম১-, পৃ(।২৮৬ :

আমি এই প্রচারটি শুনিনি। আমি শুধু শুনেছি রকেট লঞ্চারের বিকট বিস্ফোরণ যা মুজিবের বাড়ির রাস্তার বাধা সরানোর জন্য কমান্ডো বাহিনী ছুঁড়েছিল। কমান্ডিং অফিসার, লেফটেন্যান্টকর্নেল জেড এ খান ও কোম্পানী কমান্ডার-, মেজর বিলাল সশরীরে এই আক্রমণকারী প্লাটুনে ছিলেন।

কমান্ডো বাহিনী মুজিবের বাড়ির সামনে গিয়েই তার সদর দরজায় প্রহরারত সশস্ত্র প্রহরীর অস্ত্র কেড়ে নিল। প্রহরীরা দ্রুতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। তারপর বাড়ির চত্বরের চার ফুট উঁচু দেয়াল বেয়ে ওঠা শুরু করল পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ সৈনিক। তারা বাড়ির আঙিনায় নেমে স্টেনগানের গুলি ছুঁড়ে নিজেদের আগমন ঘোষণা করল ও চিৎকার



করে মুজিবকে বের হয়ে আসতে বলল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বারান্দা ও সিঁড়ি বেয়ে উঠে অবশেষে তারা মুজিবের শোবার ঘরের দরজা খুঁজে পেল। এটা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ঝুলন্ত লোহার তালায় একটা গুলি ঢুকে গেল আর সেটি নিচে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকল। যার ফলে মুজিব তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এসে গ্রেফতারের জন্য নিজেকে ধরা দিলেন। মনে হল তিনি এর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আক্রমণকারী বাহিনী বাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করল ও সেনাবাহিনীর জিপে করে তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানীতে নিয়ে এল। কয়েক মিনিট পর, ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর, মেজর জাফর ওয়্যারলেসে এলেন। আমি তার খসখসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, "BIG BIRD IN THE CAGE ..... OTHERS NOT IN THEIR NESTS..... OVER."

বার্তাটি শেষ হবার সাথে সাথে দেখলাম সাদা শার্ট পরা 'big bird'-কে সেনাবাহিনীর জিপে করে নিরাপদ হেফাজতের জন্য ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ একজন জেনারেল টিক্কার কাছে জানতে চাইল যে তিনি তাকে (মুজিবকে) তার সামনে হাজির করাতে চান কি না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি তার মুখ দেখতে চাই না।"

মুজিবের গৃহভৃত্যদের সনাক্তকরণের পরপরই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল, আর মুজিবকে রাত কাটানোর জন্য আদমজী স্কুলে রাখা হল। পরদিন, তাকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তিন দিন পর সেখান থেকে করাচী নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে যখন মুজিবের 'চুড়ান্ত বন্দোবস্ত' নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় (যেমনতার - (মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ দেয়া হয়, আমি আমার বন্ধু মেজর বিলালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন সে তার অ্যাকশনের সময়ই তাকে শেষ (মুজিবকে) করে দেয়নি। সে বলেছিল, "জেনারেল মিঠা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমি তাকে জীবিত আটক করি।"

মুজিব যখন আদমজী স্কুলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, ঢাকা শহরে তখন তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চার ঘন্টা যাবৎ এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমি দেখেছিলাম। এই রক্তাক্ত রাতের লক্ষ্যণীয় দৃশ্য ছিল আকাশে ছুটে যাওয়া অগ্নিশিখা। এককে সময় ঐ আলোকচ্ছটার চারদিকে শোকার্ত মেঘের ছায়া দেখা গেলেও দ্রুতই সেটা তারাদের ছোঁয়ায় চেষ্টারত আগুনের শিখায় ঢেকে যাচ্ছিল। মনুষ্যসৃষ্ট এই চুল্লীর আগুনে চাঁদের জোছনা আর তারার আলোও ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আগুন আর ধোঁয়ার সবচেয়ে উঁচু



স্তম্ভগুলো উঠছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে, যদিও শহরের অন্যান্য অংশ থেকে, যেমন দৈনিক পিপল -এর চত্বর থেকে ওঠা ভয়ংকর আগুনের ছটাও কোন অংশে কম ছিল না।

রাত ২ টার দিকে জিপের ওয়্যারলেস সেট আবারও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমাকে সেটা ধরার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। লাইনের অন্য প্রান্তে থাকা ক্যাপ্টেন বললেন যে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল থেকে তিনি বড় ধরণের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর মধ্যে একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার আমার কাছ থেকে হ্যান্ডসেটটা ছিনিয়ে নিয়ে মাউথ পিসে চিৎকার করে বললেনলক্ষ্যবস্তুকে" : নিষ্ক্রিয় করতে তোমরা আর কতক্ষণ লাগাবে? ..... চার ঘন্টাযত্তসব ..... ! ছাইপাঁশ তোমাদের ..... কাছে কী কী অস্ত্র আছে? ..... রকেট লঞ্চার, রিকয়েললেস রাইফেল, মর্টার আর ঠিক আছে ....., এর সবগুলো কাজে লাগাও আর দুই ঘন্টার মধ্যে সমস্ত এলাকার দখল নিশ্চিত কর।"

ভোর চারটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দখল করা হল, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সেখানে প্রচারিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ দমন করতে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। হয়তবা এই আদর্শগুলো অদম্য।

শহরের বাকী অংশগুলোতে ফৌজগুলো তাদের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিল, রাজারবাগে পুলিশ আর পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করাসহ। শহরের অন্যান্য স্থানে তারা শুধু ভীতি সৃষ্টির জন্য এখানে একটু গোলাগুলি , ওখানে একটু বোমা ফাটানো এমন করেছিল। তারা কোন বাড়িতে প্রবেশ করেনি -, শুধু অপারেশন পরিকল্পনায় যেগুলো উল্লেখ (রাজনৈতিক নেতাদেরকে গ্রেফতারের জন্য) করা ছিল, আর যে বাড়িগুলোকে বিদ্রোহীরা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করত সেগুলো ছাড়া।

২৬শে মার্চ ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগেই ফৌজগুলো তাদের মিশন সম্পন্ন করার খবর দিল। ভোর ৫ টার দিকে জেনারেল টিক্কা খান সোফা ছেড়ে উঠে কিছু সময়ের জন্য তার অফিসে গেলেন। রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে ফিরে এসে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বললেন, "আহ, আর একটা আত্মাও নেই ওখানে"! বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তার স্বগতোক্তি শুনে নিশ্চিত হতে চারদিকে তাকিয়ে



দেখলাম। শুধু একটা নেড়ী কুকুর চোখে পড়ল, পেছনের দুই পায়ের মাঝে লেজ গুটিয়ে শহরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সূর্যোদয়ের পর ভুট্টোকে তার হোটেলের রুম থেকে তুলে নিয়ে সেনাবাহিনী তাদের সাথে করে বিমানবন্দরে নিয়ে গেল। বিমানে ওঠার আগে, আগের রাতে আর্মি অ্যাকশনের তারিফের সাথে মন্তব্য করে তিনি তার প্রধান সহচর, ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে বললেন, "শোকর খোদার, পাকিস্তান রক্ষা পেল।করাচীতে পৌঁছে তিনি " এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

ভুট্টো যখন এমন আশাবাদী মন্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণকবরগুলো দেখছিলাম যেখানে আমি তিনটি গর্ত খুঁজে পাই - প্রতিটি পাঁচ থেকে পনের মিটার ব্যাসের। সেগুলো সদ্য মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন অফিসারই হতাহতের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিল না। আমি ভবনগুলো ঘুরে দেখা শুরু করলাম, বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল, যেগুলো অ্যাকশনের সময় মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে বলে দূর থেকে মনে করেছিলাম। দেখা গেল ইকবাল হলে মাত্র দুটি ও জগন্নাথ হলে চারটি রকেট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। রুমগুলোর বেশির ভাগই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তবে অক্ষত ছিল। কয়েক ডজন আধপোড়া রাইফেল - আর ছেঁড়া কাগজ তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছিল। ক্ষয়ক্ষতি খুবই ভয়াবহ ছিল কিন্তু - আমি জেনারেল টিক্কার হেডকোয়ার্টারের বারান্দা থেকে যে ভয়ংকর চিত্র মনে মনে তৈরি করেছিলাম ততটা না।

বিদেশী পত্রিকাগুলো ব)িশ্ববিদ্যালয় এলাকায়কয়েক হাজার মৃত্যুর ঘটনার (কাল্পনিক খবর প্রকাশ করে, যেখানে সেনাবাহিনীর অফিসাররা একশ'র মত সংখ্যার হিসাব দেয়। সরকারীভাবে, মাত্র চল্লিশজনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমি ঢাকা শহরের প্রধান রাস্তাগুলোতে গাড়ি চালিয়ে গেলাম আর দেখলাম ফুটপাথে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষিপ্তভাবে লাশ পড়ে আছে। পরবর্তীতে যেমন অভিযোগ তোলা হয়, তেমন করে লাশের পাহাড় ছিল না। তারপরও, আমার এক অদ্ভূত অশুভ অনুভূতি হচ্ছিল। আমি জানি না এর অর্থ কী , কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি অন্য এলাকায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলাম।



পুরনো ঢাকায় দেখলাম এখনও কিছু রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া , কিন্তু রোড ব্লকগুলো পাহারা দেয়ার জন্য কোন মানুষ ছিল না। সবাই যার যার বাড়ির আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। যদিও, এক রাস্তার কোণে পথভোলা আত্মার মত একটি ছায়া নজরে এল, যেটি দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছিল। শহরে এক চক্কর দিয়ে আমি ধানমন্ডিতে গেলাম যেখানে মুজিবের বা সা ছিল। পুরোপুরি জনমানবহীন ছিল সেটা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখে মনে হল ভালোমত তল্লাশী নেয়া হয়েছে। মনের রাখার মত এমন কিছু পেলাম না, শুধুমাত্র উল্টে পড়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রমাণ আকারের ছবি ছাড়া। ফ্রেমটা বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙে গেলেও ছবিটা অক্ষত ছিল।

বাড়ির বাইরের ফটকের মূল্যবান অংশগুলোও হারিয়ে গিয়েছিল। মুজিবের শাসনামলে, সেখানে বাংলাদেশের পিতল নির্মিত একটি মানচিত্র আর তার সাথে ছয়টি তারা যোগ করা ছিল যা আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতীক বহন করত। কিন্তু এখন শুধু দরজার কালো লোহার দন্ড আর ধাতব জিনিসগুলো আটকানোর ছিদ্রগুলোই শুধু অবশিষ্ট ছিল। যে মহিমার দ্রুত উদয় হয়েছিল, দ্রুতই তা মিলিয়ে গেল।

দুপুরের খাবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ক্যান্টনমেন্টে ফিরলাম। সেখানকার পরিবেশ একেবারে অন্যরকম ছিল। শহরে ঘটে যাওয়া শোকাবহ ঘটনা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। তাদের মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকার পর ঝড়টা অবশেষে কেটে গিয়ে দিগন্তকে পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছে। অফিসাররা স্পষ্টতই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অফিসার্স মেসে বসে গল্প করছিলেন। কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, "বাঙালীদেরকে ভালো করে ঠিকমত ঝেঁটিয়ে ফেলা গেছে অন্তত এক - প্রজন্মের মত।মেজর মালিক যোগ " করলেন, "হ্যাঁ, তারা হল শক্তের ভক্ত নরমের যম। ইতিহাস তো তাই বলে।"



১০ম অধ্যায় অপারেশন সার্চলাইট :- ২

যদিও ঢাকাকে এক রাতেই নিস্পন্দ করে দেয়া হয়েছিল, প্রদেশের বাকী অংশে পরিস্থিতি আরও কিছু সময়ের জন্য অস্থির ছিল। বিশেষ করে , চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পাবনার জন্য আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমাদেরকে উ ৎকণ্ঠার মুহূর্ত পার করতে হয়েছে।

চট্টগ্রামে মোট বাঙালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের সংখ্যা হিসাব করা হয় যথাক্রমে ৫,০০০ এবং ৬০০। বাঙালী ফৌজে ছিল ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্রুট ২),৫০০(, নতুন করে গড়ে তোলা ৮ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস উইং ও সেক্টর হেডকোয়ার্টার আর পুলিশ। আমাদের ফৌজ ছিল মূলত ২০ বালুচের কিছু অংশ যার অগ্রগামী বাহিনী জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের একজন সিনিয়র অবাঙালী সেনাবাহিনীর অফিসার, লেফটেন্যান্টকর্নেল ফাতিমিকে - নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন কুমিল্লা থেকে বাড়তি সৈন্য আসা পর্যন্ত সময় দিতে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে থাকে।

শুরুতে বিদ্রোহীরা পুরোপুরি সফল ছিল। তারা সফলভা বে ফেনীর কাছে শুভপুর সেতু উড়িয়ে দিয়ে কুমিল্লা কলামের আসার রাস্তা আটকে দিয়েছিল। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের বেশির ভাগ অংশও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বীপ বলতে ছিল শুধুমাত্র ২০ বালুচ এলাকা ও নৌবাহিনীর বেজ। ৮ ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ডকমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে-ইন- ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের যাকে) কিছুদিন আগে কৌশলে ঢাকায় সরিয়ে নেয়া হয়েছিলঅনুপস্থিতিতে বিদ্রোহীদের (নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। -১৯৭৫পরবর্তীতে)এর আগস্টে জিয়া এক ক্যু মঞ্চস্থ করেন মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য , যার ফলশ্রুতিতে শেখ ও তার পরিবারকে হত্যা করা হয়। তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন। (সরকারী ফৌজগুলো যখন বেতার কেন্দ্রের ভবন রক্ষার জন্য একে ঘিরে রেখেছিল, মেজর জিয়া তখন কাপ্তাই রোডে আলাদাভাবে স্থাপিত এর ট্রান্সমিটারগুলো দখলে নিয়ে নেন আর যা সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছিল তা ই ব্যবহার করে বাংলাদেশের-



'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্রচার করেন। চট্টগ্রামে বাড়তি সৈন্য না পৌঁছানো পর্যন্ত পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর জন্য আর কিছুই করার ছিল না।

ডিসির মধ্যরাতের পর আরও প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পার হলে জিও-ডে- মেজর-জেনারেল খাদিম হোসেন কুমিল্লা কলামের রাস্তা আটকে দেয়ার খবর পেলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফিকে নির্দেশ দিলেন যেন সেতু শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে নালা (সরু জলস্রোতদিয়ে এগিয়ে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (চট্টগ্রামে পৌঁছান। যদিও ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফি সেতু এড়িয়ে যাবার কোন রাস্তাই বের করতে পারলেন না। পরদিন সকাল ১০টায় তিনি কাজটা করতে পারলেন। কলামটি এগিয়ে চলল, কিন্তু চট্টগ্রামের প্রায় বিশ কিলোমিটার আগে কুমিরাতে আবারও তারা শত্রুর গুলির মুখোমুখি হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অগ্রগামী বাহিনীতে এগারজন হতাহত হয়, এর মধ্যে ছিলেন কমান্ডিং অফিসার, যিনি মারা যান। কলামটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের (কুমিল্লা) পাশাপাশি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের (ঢাকাসাথেও যোগাযোগ হারায় (।

কলামটি থেকে তথ্য না পাওয়ায় ঢাকায় যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। হয়তো বা তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছেতাই যদি হয় !, তাহলে চট্টগ্রামের পরিণতি কী হবে? এটা কি বিদ্রোহীদের হাতেই থাকবে? শত্রুর নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম থাকলে অপারেশন সার্চলাইট-এর ফলাফল কী দাঁড়াবে?

পরদিন জিওসি নিখোঁজ কলামটি খুঁজতে নিজে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামে যাবেন ও তারপর চট্টগ্রামকুমিল্লা সড়ক - ধরে আগাবেন, যাতে এর মধ্যে কলামটি যদি এগিয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় খুঁজে পেতে পারেন। হেলিকপ্টারটি উড়ে গিয়ে ২০ বালুচ এলাকায় অবতরণ করতে চট্টগ্রাম পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতেই উঁচুভূমিতে পজিশন নেয়া বিদ্রোহীদের গুলি এসে হেলিকপ্টারে লাগল। চপারে গুলি আঘাত করলেও কোন গুরুতর ক্ষতি হয়নি। নিরাপদেই তা অবতরণ করতে পারল। চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে দ্রুত লেফটেন্যান্টকর্নেল ফাতিমির- একটা ব্রিফিং নিতে জিওসি নামলেন। কর্নেল জয়োল্লাসিত কণ্ঠে জানালেন যে তিনি সফলভাবে ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ও বিদ্রোহীদের ৫০ জনকে হত্যা ও ৫০০ জনকে আটক করেছেন। যদিও চট্টগ্রামের বাকী অংশ তখনও বিদ্রোহীদের দখলেই ছিল।



জিওসি তার খোঁজ চালিয়ে যাবার জন্য হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যেতেই বাচ্চা কোলে একজন ভীতস্ত মহিলাকে দেখতে পেলেন। সে ছিল একজন পশ্চিমসন্ত্র-পাকিস্তানী অফিসারের স্ত্রী যে মরিয়া হয়ে ঢাকায় পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। তাকে সাথে নেয়া হল।

হেলিকপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ছিল একজন প্রথম শ্রেণীর পাইলট, মেজর লিয়াকত বোখারীর যোগ্য হাতে, যাকে দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করছিলেন মেজর পিটার। তারা কুমিল্লা সড়কের উপর দিয়ে এগিয়ে চললেন, কিন্তু নিচের দিকে মেঘ করার কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। যখন তারা কুমিরার কাছাকাছি চলে এলেন জিওসি তার হাঁটুর উপর রাখা সিকি ইঞ্চি মানচিত্রটা দেখলেনও বাইরে তাকিয়ে মেঘের মধ্য দিয়ে নেমে যেতে পাইলটকে নির্দেশ দিলেন। হেলিকপ্টারটি নামতে নামতে জিওসি যখন উদ্বিগ্ন হয়ে গলা বাড়িয়ে কলামটি খোঁজার চেষ্টা করছিলেন, নিচ থেকে আচমকা এক গুলির ঝাপটা ছিটকে এল। পাইলট স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেলিকপ্টার উঠিয়ে নিলেন। তা সত্ত্বেও তার মেশিনে গুলি লাগল। একটি বুলেট গিয়ে লেজে আঁচড় কাটল, আরেকটি হেলিকপ্টারের পেট চিরে ঢুকে গেল , জ্বালানী ট্যাংক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। এই ঘটনায় আপাতদৃষ্টিতে অবিচল থাকা মেজর বোখারী জিওসি কে- বললেন, "স্যার, আপনি কি চান আমি আরেকবার চেষ্টা করি?" "না, সোজা ঢাকার দিকে চল।মিশন " কলামটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ব্যর্থ হল।

এদিকে জেনারেল মিঠা কলামটির সাথে যোগাযোগ করার একই মিশন নিয়ে কমান্ডো বাহিনীর একটা বিচ্ছিন্ন দলকে কমান্ডো ব্যাটেলি ৩সাবেক)য়নবিমানে ঢাকা (থেকে চট্টগ্রাম পাঠালেন। বিচ্ছিন্ন দলটি নিখোঁজ কলাম বা বিদ্রোহীদের অবস্থান সম্পর্কে জানত না। তাদেরকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার উপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল। এমন সময় কোথা থেকে এক বাঙালী অফিসার জেনারেল হামিদ এসে উদয় হলেন, আর কমান্ডোদের কমান্ডিং অফিসারকে বললেন, "আমি চট্টগ্রামে আমার বাবামাকে- খুঁজতে মুড়ী থেকে এসেছি। আমি ঐ এলাকা চিনি। আমি কি আপনাদের সাথে পথপ্রদর্শক হিসেবে যেতে পারি?" তার প্রস্তাব গৃহীত হল।

যেদিন (শে মার্চ২৭)কমান্ডোদের খোঁজযোগাযোগের মিশনে নামার কথা/, সেদিনই জিওসি তার ট্যাকটিকাল হেডকোয়ার্টার চট্টগ্রামে সরিয়ে নিলেন আর ২০ বালুচের



একটা কলামকে একই মিশনে কিন্তু ভিন্ন পথে পাঠালেন। এই অপারেশনের সফলতা নির্ভর করছিল এই তিন কলামের মধ্যে যোগাযোগ হওয়ার উপর। ২০ বালুচ তাদের এলাকা ত্যাগ করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হল , কিন্তু কমান্ডোরা সোজা ছুটে গেল তাদের লক্ষ্যের দিকে , তাদের সঙ্গে থাকা বাঙালী অফিসারের সাহায্যে। তারা তখনও খুব বেশি দূর যেতে পারেনি, যখন তাদেরকে চট্টগ্রামকুমিল্লা সড়কের পাশের পাহাড়ী এলাকা থেকে ক্রসফায়ারের মুখোমুখি - হতে হয়। তাদের তের জন নিহত হয় যার মধ্যে ছিল কমান্ডিং অফিসার, দু'জন তরুণ অফিসার, একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও অন্যান্য র‍্যাংকের নয়জন। এই প্রচেষ্টা একই সাথে নিষ্ফল ও চড়ামূল্যের বলে প্রমাণিত হল।

অন্যদিকে, কুমিরার ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফি নিজেই কলামটির কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব নিলেন। তিনি মর্টারের একটি ব্যাটারী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যারা ২৭শে মার্চ কুমিল্লা থেকে এসে তার কাছে এসে পৌঁছাল। তিনি ২৮শে মার্চ ভোরে আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। এই আক্রমণ সফল হল। তিনি প্রতিরোধ ভেঙে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন। অবশেষে তিনি চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে হজ্জ্বযাত্রীদের যাত্রাপূর্ব বিরতির স্থান হাজী ক্যাম্পে এসে তার উপস্থিতি রিপোর্ট করলেন।

হাজী ক্যাম্পের পাশেই ছিল ইস্পাহানী পাটকল যেখানে আমাদের ফৌজ এসে পৌঁছানোর আগেই বিদ্রোহীরা এক রক্তক্ষয়ী দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের অবাঙালী শিকার পুরুষ -, মহিলা, শিশুদের ক্লাব ভবনে ধরে এনে তাদের কুপিয়ে হত্যা করে। এই লোমহর্ষক শোকাবহ দৃশ্যের ঘটনাস্থলে আমি কয়েকদিন পর গিয়ে দেখেছি রক্তের দাগ মাখা মেঝে আর দেয়াল। মহিলাদের কাপড় আর বাচ্চাদের খেলনা জমাটবাঁধা রক্তের সাগরে ভিজে পড়ে ছিল। এর সংলগ্ন ভবনে বিছানার চাদর আর তোষকগুলো শুকিয়ে যাওয়া রক্তে শক্ত হয়ে থাকতে দেখেছি।

এসব যখন হচ্ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখনও তিন কলামের মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৯শে মার্চ এই যোগাযোগ সফল হয় আর এই সুসংবাদটা বেতারের মাধ্যমে ঢাকায় পৌঁছে দেয়া হয়, যেখানে অপারেশনস রুমে উদ্বিগ্ন কর্মকর্তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু ইস্পাহানী কলের কসাইখানার শিকারদের জন্য অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।



এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের একমাত্র সফলতা ছিল মার্চের মাঝামাঝি থেকে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের ঘেরাও (আক্ষরিক অর্থে কোন লক্ষ্যকে বিচ্ছিন্ন করে ঘিরে রাখাকরে রাখা জাহাজ (থেকে ৯,০০০ টন গোলাবারুদের মাল খালাস করা। ঢাকা থেকে বিমানে করে এসে ব্রিগেডিয়ার এম এইচ আনসারী যা কিছু সম্বল আছে - একটি পদাতিক প্লাটুন, কিছু কামান আর দুটি ট্যাংক সব একত্র করে একটা টাস্ক - ফোর্স গঠন করেছিলেন। নৌবাহিনী একটা ডেস্ট্রয়ার ও কিছু গানবোট ধার দিয়ে সহায়তা করেছিল। অবিশ্বাস্য দক্ষতার তিনি সাথে এই সাফল্য অর্জন করেন। পরবর্তীতে একটা অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ন বিমানে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছিল।

যদিও অস্ত্রশস্ত্রের সংস্থানের ব্যাপারে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছিল, কিন্তু চট্টগ্রামের মূল যুদ্ধ তখনও লড়তে বাকী ছিল। পুরো এলাকা ঢালাওভাবে ধুয়ে ফেলার আগে রেডিও ট্রান্সমিটার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সেক্টর হেডকোয়ার্টারস ও জেলা কোর্ট এলাকায় রিজার্ভ পুলিশ লাইন পুলিশ), সাবেক সার্ভিসম্যান ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের জমায়েতের কেন্দ্রপরিষ (্কার করা বাকী ছিল।

জেনারেল মিঠা ছিলেন সর্বপ্রথম যিনি ট্রান্সমিটার ভবনে অভিযান চালান। তিনি একটা বিচ্ছিন্ন কমান্ডো বাহিনীকে এটি উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তার ফৌজ নদীপথে এসে কিনার থেকে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দেশী নৌকায় থাকা অবস্থায়ই তারা আক্রমণের মুখোমুখি হয়। তাদের ষোলজন নিহত হয়। মিঠার দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও নিষ্ফল ও চড়ামূল্যের বলে প্রমাণিত হল।

এরপর মেজর২০কর্নেল ফাতিমির নেতৃত্বে -জেনারেল খাদিম লেফটেন্যান্ট- বালুচের একটা কলাম পাঠালেন। আরও একবার, ফাতিমি যাবার পথেই কোন না কোনভাবে বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হলেন ও ট্রান্সমিটারের কাছে কোনভাবেই পৌঁছাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত, ঢাকা থেকে দুইটা এফহল কেই যেতে-(সেবর) ৮৬- সেগুলো ধ্বংস করার জন্য। এর কিছুদিন পর আমি এই দৃশ্যগুলো দেখতে গিয়ে দেখি যে ভবনটিতে খুব ভালোমত পিলবক্স ও গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে যার প্রতিটিই সরু পরিখার সংযোগ দিয়ে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত। ভবনটি অক্ষত ছিল।

আরেকটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের হেডকোয়ার্টার যেখানে ১,০০০ সশস্ত্র বিদ্রোহী পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। উঁচুভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় তারা



শৈল্পিকভাবে বাঁধ বরাবর গর্ত ও ছিদ্র করে তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিল যাতে ছোট ছোট অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করতে সুবিধা হয়। আমাদের ফৌজ এই ঝামেলার ব্যাপারটা জানত, আর তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বড় ধরণের আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। আক্রমণকারী ফৌজ, যা প্রায় একটা ব্যাটেলিয়নের শক্তির মতই, এদেরকে সহায়তা করার জন্য ছিল নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ার, দুটি গানবোট, দুটি ট্যাংক ও একটি হেভী মর্টার ব্যাটারী। তিন ঘন্টা প্রচন্ড যুদ্ধের পর বেপরোয়া বিদ্রোহীদের পরাভূত করা গেল। এটা ঘটেছিল ৩১শে মার্চ অপারেশন - সার্চলাইট-এর ষষ্ঠ দিনে।

পরবর্তী লক্ষ্য ছিল রিজার্ভ পুলিশ লাইন যেখানে ২০,০০০ রাইফেল জমা করা ছিল বলে রিপোর্ট করা হয়, বিদ্রোহীদের অস্ত্রের ভান্ডার হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এখানেও ব্যাটেলিয়নের শক্তি নিয়ে আক্রমণ করা হয়, কিন্তু দেখা গেল এখানকার প্রতিরোধকারীরা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্যদের মত জেদী নয়, আর খুব তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিয়ে কাপ্তাই সড়কের দিকে সরে গেল।

এই প্রতিরোধগুলো দমন করার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার আনসারী। তার এই সাহসিক কর্মের জন্য তাকে পরবর্তীতে হিলালজুরাত-ই- পুরস্কার (পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বসুচক পুরস্কার)দেয়া হয় ও তাকে মেজরজেনারেল - যদিও আগে তাকে) কে পদোন্নতি দেয়া হয়র‍্যাং সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।(

মার্চের শেষে চট্টগ্রামের মূল অপারেশনগুলোর সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুছে ফেলার অপারেশন চলতে থাকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত। অন্য যে দুই শহরে বিদ্রোহীরা এগিয়ে ছিল সেগুলো হল কুষ্টিয়া আর পাবনা। এবার দেখব আমাদের ফৌজরা কিভাবে সেখানে কাজ করেছিল।

যশোর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল জংশন। সেখানে আমাদের ফৌজের স্থায়ী অবস্থান ছিল না, কিন্তু ডি-ডে-র দিন ২৭ বালুচ (যশোর) থেকে একটা কোম্পানী পাঠানো হল 'শুধুমাত্র আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য'। সঠিকভাবে বলতে গেলে কোম্পানীটি শুধুমাত্র কিছু ছোটখাট অস্ত্র, সামান্য কিছু রিকয়েললেস রাইফেল আর সীমিত সংখ্যক গোলাবারুদ বহন করছিল। তারা মনে করেছিল যে তারা সাধারণ অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে, যেখানে সাধারণত কোন বড় ধরণের যুদ্ধ জড়িত থাকে না।



কোম্পানী কমান্ডার তার লোকবলকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদেরকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ স্টেশন প্রহরার কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য ছোট ছোট দলও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সবাই পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম দিন (২৬শে মার্চ) পাঁচজন বিদ্রোহী হত্যা করে তিনি তার উপস্থিতির জানান দিলেন। এরপর শুধুমাত্র কার্ফ্যু জারি করা ও বেসামরিকদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়াই চলছিল। শান্তিপূর্ণভাবে দুইদিন পার হল।

২৮শে মার্চ রাত ৯:৩০-এর দিকে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কোম্পানী কমান্ডারের কাছে এসে রিপোর্ট করলেন যে বিদ্রোহীরা কুষ্টিয়ার ১৬ কিলোমিটার দূরে চুয়াডাঙ্গার সীমান্তে জড়ো হয়েছে আর তারা রাতেই আক্রমণ চালাবে। তারা এমন হুমকীও দিচ্ছিল যে তারা সকল 'দোসরকে' হত্যা করবে। কোম্পানী কমান্ডার তার প্লাটুনকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, কিন্তু ফৌজগুলো একে খুব একটা গুরুত্ব দিল না। এমন কি তারা তাদের পরিখা খনন করার কষ্টটুকুও করল না।

রাত ৩:৪৫-এ (২৯শে মার্চ) হেভী মর্টার নিক্ষেপ দিয়ে আক্রমণ শুরু হল। এটা আমাদের ফৌজদেরকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের নিরাপত্তাবোধের সব ঘোর কাটিয়ে দিল। শীঘ্রই তারা বুঝতে পারল আক্রমণকারীরা ১ ইস্ট বেঙ্গলের ফৌজ ছাড়া আর কেউ নয়, যাদেরকে 'প্রশিক্ষণের জন্য' যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাঠানো হয়েছিল। চুয়াডাঙ্গায় তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। (যশোরের কাছে চারজন ও সিলেটের কাছে দুইজন বিএসএফ সৈন্যকে আটক করা হয়েছিল।)

যুদ্ধের দৃশ্যপট ছিল পুলিশের অস্ত্রাগার যেটি আগে আমাদের ফৌজের দখলে ছিল। বিদ্রোহীরা পার্শ্ববর্তী একজন স্থানীয় বিচারকের তিনতলা লাল ইটের দালান বেয়ে ওঠার ব্যবস্থা করে এর সুবিধা নিল। সেখান থেকে তারা পুলিশ ভবনে গুলির বৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। ভোরবেলা আমাদের পাঁচজন লোককে চত্বরে মৃত পড়ে থাকতে দেখা গেল। সকাল ৯ টার মধ্যে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল এগারতে। পরবর্তী আধা ঘন্টায়, আরও নয়জন মারা পড়ল। সামান্য কয়েকজন বেঁচে যাওয়া সদস্য প্রায় এক কিলোমিটার দূরের কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। গোলাবারুদের স্বল্পতা ও প্রতিরক্ষার অভাবই ছিল এই বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক কারণ।



কুষ্টিয়া শহরের অন্যান্য কেন্দ্র - টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ভিএইচএফ স্টেশন - একই সাথে একই রকম তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ল। তাই কেন্দ্রগুলোর কেউই কাউকে সাহায্য করতে পারল না। কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে এক জায়গায় এগারজন ও আরেক জায়গায় চৌদ্দজন মরে পড়ে রইল। সব মিলিয়ে, ষাটজন লোকের মধ্যে পঁচিশজন আক্রমণের শুরুতেই মারা পড়ল। যশোরে সাহায্য চেয়ে প্রবলভাবে বার্তা পাঠানো হল, এমন কি বিমান হামলার জন্যও অনুরোধ করা হল, কিন্তু কুষ্টিয়ায় কিছুই এসে পৌঁছাল না। দিনের শেষে যশোর থেকে পাওয়া শেষ বার্তায় বলা হয়, "এখানকার সৈন্যরা এর মধ্যেই দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অতিরিক্ত সৈন্য দেয়া সম্ভব না। অপর্যাপ্ত দৃষ্টিগোচরতার কারণে বিমান হামলাও বাতিল করা হল ..... খোদা হাফেজ!

মেজর শোয়েব তার কমান্ডের বেঁচে যাওয়া সদস্যদের একত্র করে পুনঃসংগঠিত করলেন। তিনি দেখলেন ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৬৫ জন বেঁচে আছে। তিনি বেঁচে যাওয়া সদস্যদের নিয়ে কুষ্টিয়া খালি করে দিয়ে যশোরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি তিন-টনি ট্রাক, একটি ডজ ও ছয়টি জিপ সারিবদ্ধ করে দাঁড় করালেন। গাড়ির বহর রাতেই রওনা হল যার সামনের দিকের একটা জিপে কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন। বড়জোর ২৫ কিলোমিটার যেতেই একটি কালভার্টে এসে মেজর শোয়েবকে বহন করা জিপসহ সামনের জিপগুলো গর্তে পড়ে গেল, বিদ্রোহীরা কালভার্টের মাঝখানে কেটে রেখে বিভ্রান্ত করার জন্য উপর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। গাড়ির বহরটি থেমে যাওয়ার সাথে সাথে রাস্তার দুই পাশ থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ শুরু হল। আমাদের ফৌজ লাফিয়ে নেমে মাটিতে শুয়ে পড়ল কিন্তু গুলির বৃষ্টি তাদের উপর ঝরেই চলল। পঁয়ষট্টি জনের মধ্যে মাত্র নয়জন হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসতে পারল আর গ্রামের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তাদের বেশির ভাগই পরে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে ও বর্বর হত্যাকান্ডের শিকার হয়।

পাবনার কাহিনীও কুষ্টিয়ার চরম বিপর্যয়ের কাহিনীর সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। এখানে, ২৫ পাঞ্জাবের একটা কোম্পানীকে রাজশাহী থেকে 'শুধুমাত্র আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে' পাঠানো হয়। ১৩০ জন লোক শুধুমাত্র কিছু প্রাথমিক গোলাবারুদ ও তিনদিনের বরাদ্দ খাবার নিয়ে পাবনায় আসে। পৌঁছানোর পর, কোম্পানীটিকে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলে ভাগ করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মত অরক্ষিত স্থানগুলোতে পাঠানো হয়। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতেও হানা দেয়, তবে কাউকে খুঁজে পায়নি। কোম্পানীটি বিনা বাধায় তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে ও প্রথম ছত্রিশ ঘন্টা



শান্তিপূর্ণভাবে পার করে। এরপর ২৭শে মার্চ সন্ধ্যা ৬ টার দিকে প্রতিটি কেন্দ্রের উপর নালা (ছোট নদী) থেকে প্রচন্ড আক্রমণ শুরু হয়। বিদ্রোহীদের দলে ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি উইং (৯০০ লোক), ৩০ জন পুলিশ আর ৪০ জন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক। তারা জানত না আমাদের শক্তি কতটুকু। তারা আমাদের পজিশনের উপর সরাসরি হামলা না করে দূর থেকে গুলি চালিয়ে গেল। আমাদের ফৌজরাও গুলি চালাল কিন্তু গোলাবারুদের স্বল্পতা আমাদের আক্রমণের আয়তনের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রারম্ভিক আক্রমণে একজন এনসিও এবং অন্য র‍্যাংকের দুইজন আহত হন।

ক্যাপ্টেন আসগর, যাকে বিদ্রোহীদের একটি লাইট মেশিন গান ক্রমাগত নাকাল করে যাচ্ছিল, এটাকে চুপ করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কয়েকজন ভলান্টিয়ারকে সাথে নিয়ে এর পজিশনের উপর আক্রমণ চালালেন। একটা হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে এটাকে পরাভূত করলেন, যেটা এর অবস্থানের ভিতরেই বিস্ফোরিত হল। কিন্তু একই সময় অন্য একটি লাইট মেশিন গান ক্যাপ্টেন আসগরকে গুলিবিদ্ধ করল। গুরুতর আহত হয়ে তিনি ঘুরে এসে ফটকের থামের পিছনে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এই আক্রমণ ব্যর্থ হল। লেফটেন্যান্ট রশীদ আরেকটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তিনিও এই অ্যাকশনে মারা যান।

এদিকে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জেরটা ছাড়া বাকী সবগুলো কেন্দ্র আক্রমণের শিকার হয়েছিল। বিদ্রোহীরাও পুনর্গঠিত হল, এরপর তারা সর্বতোভাবে আক্রমণ চালাল। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিরোধকারীরা তাদের বোকামী টের পেল, কিন্তু অনেক দেরীতে। তাদেরকে এজন্য চড়া মূল্য দিতে হল। তারা দুইজন অফিসার, তিনজন জেসিও এবং অন্যান্য র‍্যাংকের ৮০ জনকে হারাল। আরও একজন অফিসার ও অন্যান্য র‍্যাংকের ৩২ জন আহত হল। সাহায্যের জন্য বারবার বার্তা পাঠানো হচ্ছিল, যার ফলশ্রুতিতে আহতদের সরিয়ে নেয়ার জন্য একটা হেলিকপ্টার এসেছিল, কিন্তু অবতরণ করতে পারেনি। যা হোক, মেজর আসলাম রাজশাহী থেকে ১৮ জন সৈন্য, একটি রিকয়েললেস রাইফেল, একটি মেশিন গান আর গোলাবারুদ নিয়ে পাবনায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেন এবং বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের উদ্ধার করতে পারলেন। তিনি আহতদের ডজে তুলে গ্রামের মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে পাঠালেন যাতে রাস্তায় সম্ভাব্য আক্রমণ এড়ানো যায়। সুস্থদেরকে নিয়ে তিনি সড়কপথে লড়াই করতে করতে রাজশাহীর দিকে রওনা দিলেন। রাস্তায় চরম প্রতিরোধের



মুখোমুখি হয়ে তিনি গ্রামে ঢুকে পড়লেন যেখানে তাদেরকে তিন দিন দানাপানি ছাড়া ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। অবশেষে এই কলামটি ১লা এপ্রিল সকাল ১০ টার সময় যখন রাজশাহী পৌঁছে তখন দলে মাত্র ১৮ জন সদস্য ছিল। মেজর আসলামসহ বাকীরা আসার পথে নিহত হয়।

এভাবে চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া আর পাবনা এই শহরগুলোতে আমাদেরকে সবচেয়ে ভয়াবহ হতাহতের ঘটনার শিকার হতে হয়। এই জায়গাগুলো যথাক্রমে ৬ই এপ্রিল, ১৬ই এপ্রিল ও ১০ই এপ্রিল মুক্ত করা হয়। অন্যান্য এলাকায় যেখানে আমরা শক্তিতে বেশি ছিলাম, আমাদের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতে খুব বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

বিদ্রোহীরা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সৈন্যদের পরিবারের বেসামরিক সদস্যদেরও একই বর্বরতার সাথে হত্যা করে। এখানে এরকম সবগুলো ঘটনার বর্ণনা দেয়া সম্ভব না, তবে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বোঝাতে আমি একটি ঘটনার কথা বলব।

ঢাকার প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে জয়দেবপুরে একটা পুরনো রাজবাড়িতে ২ ইস্ট বেঙ্গলের সদস্যরা থাকত, যেখানে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দু'চারজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও (শুধু টেকনিক্যাল ট্রেড)। সাধারণ কৌশলের অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিটগুলোর সাথে ঝামেলা এড়াতে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। ২ ইস্ট বেঙ্গলের তিনটি কোম্পানীকে 'প্রশিক্ষণের জন্য' গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে সরানো হয়েছিল। চতুর্থ কোম্পানীটি জয়দেবপুরের পুরনো রাজবাড়ির দালানে ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করছিল। এটা সেই একই জায়গা, যেখানে আমি ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারীতে কালার-প্রদান অনুষ্ঠানটি দেখেছিলাম।

২৮শে মার্চ অন্যান্য বাঙালী ইউনিটের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের পর ব্যাটেলিয়নটি বিদ্রোহ করল। এই আনুগত্যের পরিবর্তনের পর তাদের প্রথম অ্যাকশন ছিল তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মী ও তাদের পরিবারদের হত্যা করা। সুবেদার আইয়ুব নামে একজন, যে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাটেলিয়নে দায়িত্ব পালন করে আসছিল, এই পরিকল্পিত হত্যাকান্ড থেকে পালাতে সক্ষম হয় এবং ২৮শে মার্চ দুপুরের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এসে খবরটি দেয়। সে যখন হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছায় আমি তাকে



দেখেছিলাম, তার ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া চেহারায় শুকনো ঠোঁটের দুইপাশে গাঁজলা জমে সাদা সাদা দাগ হয়ে ছিল। সবাই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে এতই ভয় পেয়েছিল যে এক কাপ চা কিংবা একটু উপদেশও নিতে রাজী ছিল না। সে সাহায্য চাইছিল - জরুরী ভিত্তিতে।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানীকে দ্রুত পাঠানো হল। কিছু তরুণ অফিসার স্বেচ্ছায় এই দলের সাথে যোগ দিল। ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতেই দলটি তাদের জীবনের সবচেয়ে লোমহর্ষক দৃশ্য দেখতে পেল। ময়লার স্তুপের উপর পাঁচটি শিশুর লাশ পড়ে ছিল, সবই জবাই করা ও পচে গলে যাওয়া, তাদের পেট বেয়নেট দিয়ে চেরা। শিশুগুলোর মায়েদের লাশ জবাই করা ও বিকৃত অবস্থায় আলাদা একটি স্তুপের উপর পড়ে ছিল। তাদের মধ্য থেকে সুবেদার আইয়ুব তার পরিবারের সদস্যদের সনাক্ত করল। সে শোকে উন্মাদ হয়ে গেল - আক্ষরিক অর্থে উন্মাদ।

রাজবাড়ির চত্বরের ভিতর ওয়্যারলেস সেটযুক্ত একটা জিপ দাঁড় করানো ছিল। চাকাগুলো বসানো আর সিটগুলো রক্তে ভেজা। ওয়্যারলেস সেটের উপরও রক্তের কিছু ছিটা জমে ছিল। দালানের ভিতরে 'সার্চলাইটিং' করে বাথরুমে রক্তে ভেজা কাপড় পাওয়া গেল। পরে এগুলো গুজরানওয়ালাবাসী ক্যাপ্টেন রিয়াজের বলে সনাক্ত করা হয়। অন্য র‍্যাংকের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে গিয়ে তারা দেখে একজন কমবয়সী মায়ের লাশ পড়ে আছে, একটা বাচ্চা তার শুকিয়ে যাওয়া বুকের দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেক কোয়ার্টারে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকা একটি মেয়েকে পাওয়া গেল, চার বছর বয়স হবে তার, সৈন্যদের দেখে সে চিৎকার করে উঠল। "দয়া করে আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না, আমার বাবা বাড়ি আসুক।" তার বাবা আর কখনই বাড়ি আসেনি।

অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও একই রকম কাহিনী রিপোর্ট করা হয়। তাদের কিছু কিছু এতই অতিনাটকীয় ছিল যে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কিন্তু আসলে এগুলো সবই ছিল সত্যি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ কয়েক মাস পর আমাকে বলেছিলেন যে এই যন্ত্রণাভোগ অবশ্যই লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ইয়াকুবের দোষে হয়েছে "যিনি মার্চের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আনার বিরোধিতা করেন। তিনি যদি সময়মত আমাদের সৈন্যবল গড়ে তোলার অনুমতি দিতেন, তাহলে এই পাশবিক হত্যাকান্ড ঠেকাতে সব প্রধান শহরে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ থাকত।"



মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বলি, জেনারেল ইয়াকুব রাজনৈতিক সমঝোতার খুবই স্পর্শকাতর পর্যায়ে এই কার্যক্রমের বিরোধিতা করেছিলেন। জেনারেল হামিদ যদি চূড়ান্ত কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে তার মনোভাব পরিষ্কার করে জেনারেল ইয়াকুবকে বোঝাতেন, আমি বিশ্বাস করি জেনারেল ইয়াকুবের প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হত।

এখন যেখানে জেনারেল ইয়াকুব আর দৃশ্যপটে নেই, আর সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থা তার সকল বীভৎস প্রতিক্রিয়া নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে, ফৌজ পাঠানোর বিরুদ্ধে এখন আর কোন বাধা রইল না। অপারেশন গ্রেট ফ্লাই-ইন তাই ২৬শে মার্চ থেকেই (কিন্তু তার আগে নয়) শুরু হয়ে গেল। পৌঁছানো ফৌজদেরকে চাপের মুখে থাকা এলাকাগুলোতে দ্রুত পাঠিয়ে দেয়া হল।

মূল শহরগুলোতে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার পর, প্রাদেশিক শহরগুলোতে শক্তিশালী ফৌজের কলাম পাঠানো হল। আমি এখানে ১লা এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলে পাঠানো একটা কলামের বর্ণনা দিব, যার সাথে আমি ছিলাম। মেশিনগানযুক্ত ট্রাক নিয়ে মূল কলামটি প্রধান সড়ক দিয়ে রওনা দিল, আর দুটি কোম্পানী রাস্তার দুই পাশে প্রায় পাঁচশ মিটার জুড়ে ছড়িয়ে গেল। এই পদাতিক কলাম জীবন্ত ও জড় সব রকমের অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের রোষানল থেকে কিছুই রক্ষা পাবে না। পদাতিক কলামের পিছনে ছিল ফিল্ড গানের একটি ব্যাটারী যারা তাদের যাত্রার অভিমুখে সুবিধাজনক সময় পর পর গুলি চালাচ্ছিল। এলাকা থেকে বিদ্রোহীদের ভয়ে সরে যাওয়ার জন্য আর্টিলারীর বুমবুম শব্দই যথেষ্ট ছিল।

সামান্য উছিলা বা সন্দেহেই পদাতিক কলাম আক্রমণ করছিল। গাছের ডালের সামান্য আলোড়ন কিংবা কোন বাড়িতে সামান্য খসখস শব্দেই স্বয়ংক্রিয় গুলির বন্যা কিংবা অন্তত একটি রাইফেলের গুলি বয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে পড়ে, টাঙ্গাইল সড়কে করটিয়া থেকে সামান্য দূরে একটি ছোট এলাকা ছিল যার নামও হয়ত কেউ শোনেনি। অনুসন্ধানী ফৌজ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় খড়ের কুড়েঘর আর সেগুলোর সংলগ্ন বাঁশঝাড়গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারা এগিয়ে যেতেই আগুনের তাপে একটা বাঁশ সশব্দে ফেটে উঠল; সবাই এটাকে কোন লুকিয়ে থাকা 'দুর্বৃত্তের' রাইফেলের গুলি বলে ধরে নিল। এর ফলে পুরো কলামটিই ঐ এলাকায় আটকে গেল আর গাছ-গাছালীর মধ্যে সব ধরণের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হল। যখন বিপদের উৎসকে সম্পূর্ণ 'ধ্বংস' করা হল, একটি সতর্ক



অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়া হল। অনুসন্ধানের সময়, কলামটি 'দুর্বৃত্তকে' দেখামাত্র গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। অনুসন্ধানী দল কোন মানুষই খুঁজে পেল না - জীবিত বা মৃত। বাঁশফাটার শব্দ বহরটিকে প্রায় পনের মিনিট দেরি করিয়ে দিল।

করটিয়া ছিল চারদিকে ঘন বৃক্ষে ঘেরা এক শান্ত ছোট শহর। এর দম্ভ বলতে ছিল এক সারি দোকান বিশিষ্ট একটি স্থানীয় বাজার। লোকজন এর মধ্যেই তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল তারা? এটা তদন্ত করা কঠিন ছিল। কলামটি এখানে দাঁড়াল, শহরটি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল, বাজার পুড়িয়ে দিল আর কিছু কেরোসিনের ড্রামে আগুন ধরিয়ে দিল। দ্রুতই এটি এক বিধ্বংসী অগ্নিকুন্ডে পরিণত হল। ধোঁয়ার কুন্ডলী সবুজ গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে থাকল। ফৌজরা তাদের কৃতকর্মের ফল দেখার জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত এগিয়ে চলল। যখন আমরা শহরের অন্য প্রান্তে চলে এসেছি, দেখলাম খুঁটিতে বাঁধা একটি কালো ভেড়া তার থাকার জায়গা থেকে মোচড়া-মুচড়ি করে বের হয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু সফল হচ্ছে না কারণ মুক্তির আশায় প্রতিবার চেষ্টার সাথে সাথে দড়িটা তার গলায় আরও শক্ত হয়ে এঁটে যাচ্ছে। সে নিশ্চয়ই নিজের গলায় ফাঁস লেগে মারা পড়েছিল।

আরও কয়েক কিলোমিটার সামনে গিয়ে আমরা দেখলাম রাস্তার পাশে দুটি V-আকারের পরিখা, সদ্য খোড়া কিন্তু তাড়াহুড়া করে ছেড়ে যাওয়া। হয়ত বিদ্রোহীরা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এই পজিশনগুলো তৈরি করেছিল কিন্তু বন্দুকের বিকট শব্দ শুনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘটনা যা-ই হোক, কলামটি এই এলাকাকে ধুয়ে না দিয়ে এগিয়ে যেতে পারছিল না। ফৌজরা যখন চারদিকে খোঁজ চালাচ্ছিল, আমি একটি মাটির কুঁড়েঘরে ঢুকলাম সেখানকার মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করে দেখার জন্য। ভেতরটা হালকা ধূসর রঙের মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা ছিল। সামনের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা ছবি ঝুলছিল দুটি বাচ্চার, সম্ভবত দুই ভাইয়ের। কুঁড়েঘরটিতে একমাত্র আসবাব ছিল একটা খাটিয়া আর একটা খেজুর পাতার মাদুর। মাদুরে এক মুঠো ভাত পড়ে ছিল যেখানে বাচ্চাদের হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। এখন কোথায় তারা? কেনই বা তারা চলে গিয়েছিল?

এই এলোমেলো ভাবনা থেকে জেগে উঠলাম এক জোরালো তর্কের শব্দে যা সৈন্য ও এক বেসামরিক বৃদ্ধের মধ্যে চলছিল যাকে তারা কলাগাছের নিচে আবিষ্কার করেছে। বৃদ্ধলোকটি 'দুর্বৃত্তদের' ব্যাপারে কোন রকম তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল আর



সহযোগিতা না করলে সৈন্যরা তাকে হত্যার হুমকী দিচ্ছিল। আমি দেখতে গেলাম কী হচ্ছে সেখানে।

সেই বাঙালী ছিল যেন এক জীবন্ত কঙ্কাল, কোমরে এক টুকরো ময়লা কাপড় জড়ানো। তার দাড়িওয়ালা মুখটিতে এক ভয়ার্ত চেহারা দেখা যাচ্ছিল। আমার চোখ তার অর্ধনগ্ন শরীর অনুসরণ করে গোড়ালি পর্যন্ত গিয়ে তার ধুলোমাখা পায়ের ফুলে ওঠা শিরাগুলোতে আটকে গেল। আমাকে কৌতুহলী হতে দেখে সে আমার দিকে ঘুরে বলল, "আমি গরীব মানুষ। আমি জানি না কী করব। একটু আগে, ওরা (দুর্বৃত্তরা) এখানে এসেছিল। তারা আমাকে হুমকী দিয়েছে যে তাদের ব্যাপারে কাউকে কিছু বললে আমাকে মেরে ফেলবে। আর এখন, আপনারা আমার সামনে এসে সেই একই ভয় দেখাচ্ছেন যদি ওদের সম্পর্কে কিছু না বলি।" সাধারণ বাঙালীদের দোটানার ব্যাপারটি এতে বোঝা গেল।

কলামটি রাস্তায় নিরলস সাধনা বজায় রেখে অবশেষে সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল পৌঁছাল। তারা সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের পতাকা সরিয়ে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল, তাদের আগমনের সংবাদ ঘোষণা করার জন্য আটটি ফাঁকা গুলি চালাল আর রাত কাটানোর জন্য অবস্থান নিল। আমি ঢাকায় ফিরে এলাম।

প্রতিকূল আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে যে ব্যাপক হত্যাকান্ডের খবর উৎসাহের সাথে প্রকাশ করা হয়, অপারেশন সার্চলাইটের শুরুর দিকে তেমনটা হয়নি। এগুলো ঘটেছিল দীর্ঘায়িত গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে। ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলার মিশন নিয়ে কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সিলেট ও অন্যান্য জায়গা থেকে পদাতিক কলাম পাঠানো হয়েছিল। তারা সাধারণত পাকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেত যাতে করে বিদ্রোহীরা গ্রামের দিকে সরে যাওয়ার কিংবা সীমান্তে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের কোলে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পায়। এই অপারেশনগুলোর সাফল্য নির্ভর করত ফৌজ ও তাদের অস্ত্রের প্রাপ্যতার উপর।

অতিরিক্ত লোকবল ও অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল ২৬শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিলের মধ্যে। এই সময় দুইটি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার (৯ ডিভিশন, ১৬ ডিভিশন), পাঁচটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার, একটি কমান্ডো ও বারোটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন এসে পৌঁছেছিল। তারা তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে ফেলে এসেছিল কারণ তাদের এখানে একটা বিদ্রোহ দমন করার কথা ছিল, পুরোদস্তুর যুদ্ধ লড়া নয়। আরও তিনটি পদাতিক



ব্যাটেলিয়ন ও দুইটি মর্টার ব্যাটারী যথাক্রমে ২৪শে এপ্রিল ও ২রা মে এসে পৌঁছাল। ১০ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিলের মধ্যে আধাসামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে এসে ঢুকল যার মধ্যে ছিল ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (ইপিসিএএফ) এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান রেঞ্জার্স (ডব্লিউপিআর)-এর প্রতিটির দুইটি করে উইংস, পাশাপাশি ছিল উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারের স্কাউটদের একটা বড় সংখ্যার দল। তারা মূলত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশকে অকেজো করার দায়িত্বে ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যা-ই সহায়তা আসুক তাদেরকে অপারেশন সার্চলাইট সম্পন্ন করার কাজে লাগানো হয়েছিল, যেটা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনই বন্ধ করা হয়নি কিন্তু এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে সমাপ্তি অর্জন করেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল যখন প্রদেশের সকল প্রধান শহরের দখল নেয়া হয়ে গিয়েছিল। (প্রধান শহরগুলো নিম্নলিখিত তারিখে দখল করা হয়েছিল: পাকশী (১০ই এপ্রিল), পাবনা (১০ই এপ্রিল), সিলেট (১০ই এপ্রিল), ঈশ্বরদী (১১ই এপ্রিল), নরসিংদী (১২ই এপ্রিল), চন্দ্রঘোনা (১৩ই এপ্রিল), রাজশাহী (১৫ই এপ্রিল), ঠাকুরগাঁও (১৫ই এপ্রিল), কুষ্টিয়া (১৬ই এপ্রিল), লাকসাম (১৬ই এপ্রিল), চুয়াডাঙ্গা (১৭ই এপ্রিল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৭ই এপ্রিল), দর্শনা (১৯শে এপ্রিল), হিলি (২১শে এপ্রিল), সাতক্ষীরা (২১শে এপ্রিল), গোয়ালন্দ (২১শে এপ্রিল), দোহাজারী (২২শে এপ্রিল), বগুড়া (২৩শে এপ্রিল), রংপুর (২৬শে এপ্রিল), নোয়াখালী (২৬শে এপ্রিল), সান্তাহার (২৭শে এপ্রিল), সিরাজগঞ্জ (২৭শে এপ্রিল), মৌলভীবাজার (২৮শে এপ্রিল), কক্সবাজার (১০ই মে), মৌলভীহাতিয়া (১১ই মে)।)

আমি এই বর্ণনায় যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো ছাড়া অপারেশন সার্চলাইটের সময় যত হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল বা ঘটানো হয়েছিল তার সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমি আমার মূল্যায়ণের ক্ষমতার জোরে সাক্ষ্য দিতে পারি যে এই সংঘর্ষে যত প্রাণহানি ঘটেছে তা কোনমতে চার অংকের সংখ্যায় যাবে। বিদেশী সংবাদমাধ্যম যদি বিশ্বকে এটাই বিশ্বাস করায় যে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, তাহলে এর দায় বর্তাবে তাদের উপর যারা ২৬শে মার্চ (সন্ধ্যায়) ঢাকা থেকে বিদেশী সংবাদমাধ্যমদের বের করে দিয়ে তাদেরকে ভারতীয় প্রোপাগান্ডিস্টদের কল্পনার উপর ভিত্তি করে কিংবা একগুঁয়ে পর্যটকদের খেয়াল-খুশিমত খবর ছাপতে বাধ্য করেছিল। ২৫শে মার্চের পর যদি বিদেশী সাংবাদিকদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে দেয়া হত, তাহলে



তাদের মধ্যে সবচেয়ে পক্ষপাতদুষ্ট লোকটিও সত্যিটা সচক্ষে দেখতে পেত, যেটা মর্মান্তিক হলেও তাদের কাহিনীর চেয়ে অনেক কম বীভৎস হত।



১১শ অধ্যায়: একটি হারানো সুযোগ

২৬শে মার্চ ঢাকা থেকে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বের করে দেয়ার পর থেকেই পাকিস্তান বহির্দেশ থেকে বৈরী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হতে শুরু করে। সামরিক আমলাতন্ত্র অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েই এত ব্যস্ত ছিল যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে নজরই দেয়নি। ১৯৭১-এর মার্চের শেষ দিনটিতে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে 'নিরস্ত্র নিরপরাধ বেসামরিকদের' হত্যার অপবাদের বিরোধীতা করার একমাত্র রাস্তা হল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট পাকিস্তান পুলিশের বিদ্রোহের কথা প্রকাশ করে দেয়া। এর বদলে আমি পাই তীব্র তিরস্কার। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কি সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ধ্বংস করে দিতে চাও, দুনিয়াকে এটা বলে যে এর শৃঙ্খলা ধসে পড়েছে?"

আমি আমার প্রস্তাবের জন্য যথেষ্ট সমর্থন জড় করতে পারলাম না। তাই এটা বাস্তবায়নের মুখ দেখল না যতক্ষণ না ১লা মে-তে পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষকে আমাদের বক্তব্য প্রচারের জন্য একজন প্রতিনিধি খুঁজে বের করতে বাধ্য করল, যেখানে বাঙালী ফৌজের বড় ধরণের বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট চরম বিরোধের প্রতি আলোকপাত করা হয়। (সানডে টাইমস-এ প্রকাশিত Anthony Mascarenhas-এর প্রতিবেদন, লন্ডন, ১লা মে, ১৯৭১।)

এই যুক্তিতর্কের যুদ্ধে আমিই একমাত্র পরাজিত ব্যক্তি ছিলাম না। এপ্রিলের শুরুতে মেজর-জেনারেল ফরমান আলীও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা উচিৎ যার মাধ্যমে বিদ্রোহী সদস্যদের ভারতীয় আশ্রয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন সুযোগ না রাখার বদলে তাদেরকে আমাদের আশ্রয়ে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা যায়। তার সিনিয়র একজন জেনারেল তাকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "আরে, তোমার রাজনৈতিক পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। কিন্তু রাজনীতির সময় এখন শেষ।" তারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল পাঁচ মাস পর (সেপ্টেম্বরে) যখন ভারত বিদ্রোহীদের নিয়ে মুক্তি বাহিনী - স্বাধীনতার সেনাদল গঠন করে ফেলেছে - যা পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ করার কাজটা সহজ করে দিয়েছে।



তবে রাওয়ালপিন্ডির হাই কমান্ড একটা উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন: ফৌজের কমান্ডার, আঞ্চলিক মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে জেনারেল টিক্কার দায়িত্বভার ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য ঢাকায় আরেকজন জেনারেলকে পাঠানো। তারা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এ এ কে নিয়াজীকে বেছে নিলেন যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিলিটারী ক্রস ও ১৯৬৫-এর যুদ্ধে হিলাল-ই-জুরাত খেতাবে ভুষিত হন। তার খ্যাতি ছিল 'বাঘ' হিসেবে আর বাংলার বাঘদের বশে আনতে তাকেই উপযুক্ত পছন্দ বলে মনে হল। তার ত্রুটিগুলো, যা ডিসেম্বরে পতনের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারত, সাধারণভাবে জনগণের কাছ থেকে লুকানো হয়। তিনি যদি সফল হতেন, আমি নিশ্চিত তার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো জাতি অগ্রাহ্য করত। কিন্তু দুর্বলতা আর ত্রুটিই তার ছিল।

১১ই এপ্রিল ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসের বাগানে তার সাথে আমার দেখা হয়। ঐদিন সকালেই তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন। নতুন পদ তাকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেলের নতুন র‍্যাংক প্রদান করে, যা তিনি ফুল রিবন ও ওয়ার ডিসটিংকশনগুলো পরে উপভোগ করছিলেন। তাকে তার নতুন দায়িত্বে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। জিওসি জেনারেল খাদিম রাজা পরে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি যখন ফৌজের নেতৃত্বের দায়িত্ব তাকে হস্তান্তর করছিলেন, জেনারেল নিয়াজী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি তোমার রক্ষিতাদের কখন আমার কাছে হস্তান্তর করবে?"

নেতৃত্বের দায়িত্ব নেয়ার পরে, জেনারেল নিয়াজী ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে তার অধীনস্থদের সাথে পরিচিত হন যেখানে তিনি সেনাবাহিনীর 'ঘুঘুদের' তাদের অতীত শিথিলতার জন্য তিরস্কার করেন, আর বাঙালীদের উপর তার ক্রোধ প্রকাশ করেন, বিশেষ করে হিন্দু ও বুদ্ধিজীবীদের উপর - যে দুই শ্রেণী, তার মতে, বাঙালী জাতীয়তাবাদকে সযত্নে লালন করছে।

অপারেশনের দিক থেকে তিনি বিদায়ী জিওসি-র কাছ থেকে ব্রিফ নিয়ে ১০ই মে পর্যন্ত তা অনুসরণ করেন, যখন সীমান্তের শেষ শহরে (কক্সবাজার) ফৌজ গিয়ে পৌঁছে। জেনারেল খাদিম রাজার জায়গায় আসেন মেজর-জেনারেল রহিম খান, ইয়াহিয়া সরকারের অন্যতম উৎকৃষ্ট জেনারেল বলে খ্যাত। এখন জেনারেল নিয়াজী তিনজন নতুন ডিভিশনাল কমান্ডার পেলেন: মেজর-জেনারেল রহিম (১৪ ডিভিশন), মেজর-জেনারেল শওকত রেজা (৯ ডিভিশন) এবং মেজর-জেনারেল নজর হোসেন শাহ (১৬ ডিভিশন)। তিনি পূর্ব



পাকিস্তানকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রত্যেক জেনারেলকে একেকটির দায়িত্ব দিলেন। মোটামুটিভাবে, ৯ ডিভিশন পেল পুরো পূর্ব সীমান্ত; ১৬ ডিভিশন, উত্তরবঙ্গ; আর ১৪ ডিভিশন প্রদেশের বাকী অংশ।

এই ফৌজদের নিয়ে বাঙালী প্রতিরোধের মেরুদন্ড ভাঙতে জেনারেল নিয়াজীর খুব বেশি সময় লাগল না। এপ্রিলের শেষে তিনি সব প্রধান শহরগুলোর দখল নিশ্চিত করলেন। পরের মাসটা ব্যয় করা হয় ছোটখাট অপারেশনে যেগুলোর লক্ষ্য ছিল সন্দেহজনক পকেটগুলো পরিষ্কার করে ফেলা। কিন্তু এই আপেক্ষিক শান্তি ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সময়টুকুকে বাঙালীদের মন জয়ের লক্ষ্যে কোন গঠনমূলক অভিযান চালু করার কাজে লাগানো হল না। তার বদলে তাদের ক্ষতগুলো অবিরত গভীর করা হচ্ছিল ব্যক্তিগত বাড়িঘরের উপর হামলা করে, যেটাকে 'সুইপ অপারেশন' বলা হত।

এই অপারেশনগুলো শুধুমাত্র আংশিক সফল ছিল, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ না তো সন্দেহভাজনদের চেহারা চিনত, আর না গলির নাম্বার (বাংলায় লেখা) পড়তে পারত। তাদেরকে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হত। সাধারণভাবে বাঙালীরা তখনও মুজিবের প্রত্যাবর্তনের আশা বুকে লালন করছিল ও নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহতার মনোভাব ধারণ করে থাকত। শুধুমাত্র যারা এগিয়ে এসেছিল তারা হল, 'কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খায়রুদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান সবুর এ খান, জামায়াত-ই-ইসলামীর গোলাম আযম, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির মৌলবী ফরিদ আহমেদের মত ডানপন্থীরা।'

তারা সবাই ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে হেরেছিল আর বাঙালীদের জন্য অন্তরে সামান্যই অনুভব করত। এই লোকগুলো সাধারণত মনে করত যে তারা হল অচল মুদ্রা যাদেরকে সেনাবাহিনী আবারও সচল মুদ্রার সম্মান দিচ্ছে। কিন্তু সেনাবাহিনী, নেহায়েত প্রয়োজনের তাগিদে, এদের উপস্থিতির মূল্য দিয়ে এদের উপদেশ মেনে চলত। একটি বৈঠকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে এই 'অচল মুদ্রাগুলোর' বক্তব্য প্রচার না করে তার বদলে শিক্ষক, আইনজীবী, শিল্পী আর বুদ্ধিজীবীরা যারা নিজ নিজ অঙ্গনে সমাদৃত তাদের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের জন্য ভালো হয়। পরামর্শটি গৃহীত হয় আর জীবনের নানা দিকে উজ্জ্বল ব্যক্তিদের সমর্থনসুচক বক্তব্য সংগ্রহ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়। স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে কিছুটা সফল হলেও বুদ্ধিজীবীরা,



যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদি উৎস, আমার প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমন ঘটনার এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মোর্শেদের সাথে। তিনি আমাকে তার চমৎকার স্টাডিতে (গুলশান কলোনী) নিয়ে সবচেয়ে ভালো ভালো বই আর দুর্লভ পাণ্ডুলিপিগুলো দেখালেন। রুমি, সাদী আর ইকবালের মত প্রাচ্যের মহাকবিদের কবিতা স্বচ্ছন্দে পড়ে শোনালেন। এমন জ্ঞানগর্ভ পরিবেশে আমি সহযোগিতার অনুরোধ করলাম। অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আলোচনার পর, তিনি বললেন: "আমাকে চিন্তা করার জন্য তিন মাস সময় দাও।" "চিন্তা করার জন্য তিন মাস!" বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কমপক্ষে তিন মাস, তোমরা সত্যিই তোমাদের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছ কি না তা দেখার জন্য। ভালো কথা, ফারল্যান্ড ইদানীং আছে কোথায়?" পরবর্তী বৈঠকে যখন আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করি, একজন 'দেশপ্রেমিক' গোয়েন্দা অফিসার বলেন, "আমরা রাতে মোর্শেদকে তুলে নিয়ে এসে তোমার ইচ্ছামত যে কোন বক্তব্য দেয়াতে পারি।" আনন্দের সাথে বলছি, তিনি (মোর্শেদ) এই আচরণ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীর অ্যাকশনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ করা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিচারপতি মোর্শেদই একমাত্র ছিলেন না। বেতার ও টেলিভিশনের সাথে আমার অভিজ্ঞতা যেমনটা হয়েছিল, সে অনুযায়ী তাদের অনেকেই মুজিবের প্রত্যাবর্তন ও তাদের মাতৃভূমির 'স্বাধীনতা'-র আশা বুকে লালন করতেন। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরপরই আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় বেতার কেন্দ্র পুনরায় কার্যকর করে নতুন মার্শাল ল নির্দেশগুলো প্রচার করে 'স্বাভাবিকত্বের' চিহ্ন দেখাতে। শুরু করতে গিয়ে, আমি ভাবলাম যে মার্শাল ল ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রসঙ্গীত প্রচার করতে দেয়াই নিরাপদ হবে। তারা সেনাবাহিনীর অ্যাকশনের ফলে সংঘটিত মৃত্যু ও ধ্বংস নিয়ে বিলাপ করে শোকগীতি প্রচার করা শুরু করল। আমি এর বদলে তাদেরকে হামদ ও নাত (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রশংসাসূচক স্তুতিগান) প্রচারের নির্দেশ দিলাম, যাতে দুই অংশের মধ্যে ইসলামিক বন্ধন পুনরুজ্জীবিত হয়। তারা চালাকি করে এই বিখ্যাত ভক্তিমূলক গানটি প্রচার করে:

অ্যায় মওলা, অ্যায় শেরে খাজা, মেরে কাশতি পার লেকে দে না। (হে প্রভু, হে আলী, আমার নৌকা নিরাপদে তীরে ভিড়িয়ে দাও!)

দৈবাৎক্রমে, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।



একইভাবে, আমি টেলিভিশন কেন্দ্রকে পাকিস্তান আন্দোলনের বীরদের নিয়ে ছোট ছোট নাটিকা প্রচার করতে বলি যেগুলো হিন্দু ও বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির উপর আলোকপাত করে। তারা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বেছে নেয় - মাওলানা মোহাম্মদ আলী জহর - আর এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে একটা শক্তিশালী নাটক প্রচার করে। এতে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে (মুক্তি বাহিনী) এই মহান কাজে কোন রকম ত্যাগ থেকে পিছু না হটতে আহ্বান করা হয়!

স্বাধীনতার এই জীবাণুগুলো সমূলে ধ্বংস করার বদলে, কর্তৃপক্ষ ভীতির রাজ্যকে জিইয়ে রাখাই বিচক্ষণের কাজ মনে করল যাতে 'তুরুপের তাসগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।' তারা 'দেশপ্রেমিক' পাকিস্তানীদের দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে ঘন ঘন 'সার্চ এন্ড সুইপ অপারেশন' অবলম্বন করতে থাকল। তাদের কেউ কেউ সত্যিকার অর্থেই পাকিস্তানের একাত্মতার প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সেনাবাহিনীকে সহায়তা করছিল, তবে এদের কয়েকজন আওয়ামী লীগপন্থী লোকদের সাথে পুরনো হিসাব মেটাতে সেনাবাহিনীর সাথে যোগসাজশকে ব্যবহার করছিল। যেমন, একদিন এক ডানপন্থী রাজনীতিবিদ এক কিশোরকে সাথে করে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে এল। ঘটনাক্রমে বারান্দায় তার সাথে আমার দেখা হলে সে গোপন কথা বলছে এমনভাবে ফিস ফিস করে জানায় যে বিদ্রোহীদের ব্যাপারে দেয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার কাছে আছে। আমি তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেলে সে বলে যে ছেলেটা হচ্ছে তার ভাতিজা, যে বুড়িগঙ্গার ওপারে কেরানীগঞ্জে বিদ্রোহীদের আস্তানা থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ছেলেটা যোগ করল যে বিদ্রোহীরা শুধু স্থানীয়দের হয়রানই করছে না, তারা রাতের বেলা ঢাকায় আক্রমণের পরিকল্পনাও করছে।

তৎক্ষণাৎ একটা 'ক্লিয়ারিং অপারেশন'-এর নির্দেশ দেয়া হল। ফৌজের কমান্ডারকে ব্রিফ করা হল। ভোরের আগেই গোলাবর্ষণ করে লক্ষ্যকে 'দুর্বল' করে ফেলার জন্য ফিল্ড গান, মর্টার ও রিকয়েললেস রাইফেল প্রস্তুত করা হল। সকাল হতেই ফৌজগুলোর সাঁড়াশী অভিযান চালিয়ে এদেরকে ধরার কথা ছিল।

অপারেশনস রুমে বসে আমি অ্যাকশনের অগ্রগতি দেখছিলাম যেখান থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। দ্রুতই যুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র যোগ দিল। অনেকেই ভয় পাচ্ছিল যে আক্রমণকারী ব্যাটেলিয়ন স্থানীয়ভাবে রিপোর্ট করা পুরো ৫,০০০ বিদ্রোহীকে



ধরতে সক্ষম হবে না। সূর্যাস্তের পর অপারেশন শেষ হল। এটা নিশ্চিত করা হল যে আমাদের ফৌজে কোনরকম হতাহতের ঘটনা ছাড়াই লক্ষ্যকে নিষ্ক্রিয় করা গিয়েছে।

সন্ধ্যায়, এই আক্রমণ সম্পন্ন করা অফিসারের সাথে আমি দেখা করলাম। সে যা বলল তা আমার রক্ত হিম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সে আস্থার সাথে বলল, "ওখানে কোন বিদ্রোহী ছিল না, কোন অস্ত্রও না। শুধুমাত্র গ্রামের গরীব মানুষ, বেশির ভাগ মহিলা আর বৃদ্ধ, গোলাগুলির বেড়াজালে পড়ে কাবাব হয়ে গিয়েছে। এটা দুঃখজনক যে সঠিক তদন্ত ছাড়াই অপারেশনটি চালানো হয়েছে। আমি আমার বাকী জীবন আমার বিবেকের উপর এই বোঝা বয়ে বেড়াব।"

এই সার্চ এন্ড সুইপ অপারেশনগুলো যখন চলছিল, রেডিও পাকিস্তান, সংবাদপত্র আর টেলিভিশন তখন প্রদেশে দ্রুত 'স্বাভাবিকত্ব' ফিরে আসার বাদ্য বাজাচ্ছিল। অনেক সময় এমনও হচ্ছিল যে, কোন বাড়ির সদস্যরা যখন বেতারে 'স্বাভাবিকত্ব'-এর প্রচার শুনছে, তখনই তারা সার্চ পার্টির হামলার শিকার হয়েছে যারা সামনে যা পেয়েছে সবকিছুই ধুয়ে মুছে দিয়েছে। এইভাবে সকল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচার মাধ্যমের মত রেডিও পাকিস্তানও বাঙালী শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাল, যারা এর চেয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও (এআইআর) কিংবা অন্য যে কোন বিদেশী কেন্দ্রের প্রচার শোনাই শ্রেয় মনে করত। এআইআর এবং এর পশ্চিমা সমর্থকদের কাছে বাঙালীর কান বিষিয়ে দেয়ার জন্য নিজস্ব উদ্ভট অনেক কাহিনী ছিল। ভারতীয় কেন্দ্রগুলো বাঙালীদের ঘৃণাকে উসকে দেয়ার আর 'যদি তারা জীবন ও সম্মান বাঁচাতে চায়' তো তাদের ঘর ছাড়ার জন্য প্ররোচনা দেয়ার কোন সুযোগই হারাল না। পরবর্তীতে জুলাই-আগস্টে বিদ্রোহ যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে, জনগণের একটা বড় অংশ দল ধরে পালিয়ে গিয়েছিল।

যারা অনিশ্চিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা সেনাবাহিনীর অফিসার বা যে কোন ইউনিফর্ম পরিহিত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে খাতির জমানোই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। একটি খাকী ইউনিফর্ম আর একটি পাঞ্জাবী অথবা পশতু বাক্যই হয়রানি ও শাস্তির বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে বিবেচনা করা হত। আমাদের অনেকেই কোন না কোন বাঙালী পরিবারকে 'পৃষ্ঠপোষণ' করে খুশি থাকত। কোন পরিবারে যদি সুন্দরী মেয়েরা থাকত তো সেই পরিবার একই সাথে অনেক অফিসারের 'পৃষ্ঠপোষণ' অর্জন করত।



আমাকে একজন সফল বাঙালী সম্পাদক আমন্ত্রণ জানালেন যদিও আমাদের সম্পর্কের বিগত বছরগুলোতে তিনি কখনই তার বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে শিথিল করেননি যাতে আমি তার ব্যক্তিত্বে একটু উঁকিও দিতে না পারি। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে এই অনুরোধ করলেন যেন আমার এই সাক্ষাৎ তাদের পরিবারের মর্যাদাকে রক্ষা করে যারা সম্প্রতি তাদের প্রতিবেশীর ঘরে রাতের বেলা হামলা হওয়ার ঘটনায় পুরোপুরি ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে গিয়েছেন। তার মা, বিবাহিত বোন ও অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর তিনি তার সুন্দরী বধূর সাথে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে একজন অতিথিকে আনতে চলে গেলেন। এই নীরবতা দ্রুতই পরিবেশকে ভারী করে তুলতে শুরু করল। আমি আমার রুচিসম্পন্ন নিমন্ত্রণকর্ত্রীর সাথে কথোপকথন শুরু করার চেষ্টায় বললাম, "যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু ....." তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: "এত সম্পদ ধ্বংস করার পর, এতগুলো মানুষ হত্যার পর আর এতগুলো নারী ধর্ষণ করার পর এখন তুমি দুঃখ প্রকাশ করছ ....." আমি মাঝখানে কিছু বলতে চাইলাম কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে চললেন, "তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিৎ ..... আমি খাকীদের প্রতিটি সূতা ঘৃণা করি। প্রতিটা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের চেহারায় বড় করে বর্বরতা লেখা আছে। ..... আমার স্বামী কেন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আমি জানি না। তুমি অবশ্যই ঐ জানোয়ারদেরই একজন যারা গত রাতে আমার বোনের বাড়িতে গিয়েছিল।" আমি চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে বের হয়ে এলাম।

এই ঘৃণাকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য কিছুই করার ছিল না। রোগীদের মানসিক আরোগ্যের দিকে মনোযোগ দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা সত্যিকার অর্থে অনুভব করা হয়নি। যতটুকুই প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার, রেললাইনের মেরামত, ফেরী কার্যকর করা, মালামাল পরিবহন আর অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মানসিক আর আবেগের সাগরের মধ্যে সেতুবন্ধনের গুরুতর দায়িত্ব বাদ দিলেও, বস্তুগত সমস্যাটি নিজেই এই বামনদের পক্ষে সমাধান করার জন্য অনেক বিশাল ছিল। সমস্যার বিশালতা বোঝার ক্ষমতার অভাব ছিল তাদের। তারা ছিল সেই ইঁদুরের মত, যে এক হাতির পিঠে চড়ে যে জায়গাটুকু দখল করে আছে নিজেকে সেটুকুর মালিক বলে ধরে নিতে পারে কিন্তু পুরো হাতিকে কবজা করে নিয়েছে বলে দাবী করতে পারে না।



তারা হাতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ডজন দুয়েক আমলা আর ৫,০০০ পুলিশের বাহিনী পাঠালো। পুলিশ আর তাদের মনিবেরা স্বাভাবিক প্রশাসনিক ইউনিট চালানোর কার্যভারের সাথে পরিচিত ছিল কিন্তু একটি কাটা লাশের হাত পা জোড়া লাগিয়ে তাতে নতুন জীবন সঞ্চার করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আমলারা কোন যীশুখ্রিস্ট ছিল না যে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটাবে। এটা মূলত কূটনীতিবিদদের কাজ - কিন্তু মার্শাল ল-এর অনুর্বর জমিতে তাদের জন্ম বিরল।



১২শ অধ্যায়: অভ্যুত্থান

ভারতের সম্পৃক্ততা, যা ডিসেম্বরের অবাধ আগ্রাসনে চরমে পৌঁছেছিল, ১৯৭১-এর মার্চেই তা গোপন ছিল না (অন্তত আমাদের কাছে)। প্রখ্যাত ভারতীয় নেতা ও লেখকবৃন্দ সেনাবাহিনীর অ্যাকশনের পরপরই বিদ্রোহীদের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। শুরুতেই ২৭শে মার্চে লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "আমি সম্মানিত সদস্যগণ যারা জানতে চেয়েছেন যে (পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ব্যাপারে) যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কি না তাদেরকে নিশ্চিত করার জন্য জানাতে চাইছি যে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ। সময় পেরিয়ে যাবার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন যুক্তি নেই।" (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভলিউম-১, পৃ: ৬৬৯।) চারদিন পর, ভারতীয় সংসদ একটি প্রস্তাব পাশ করে যেখানে বলা হয়, "এই সভা তাদেরকে (বিদ্রোহীদের) আশ্বাস দিতে চায় যে তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পাবে।" (বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভলিউম-১, পৃ: ৬৭২।) সেইদিনই, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর পরিচালক, জনাব কে সুব্রামানিয়াম নয়াদিল্লীতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত একটি সিম্পোজিয়ামে এই প্রস্তাবটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "ভারতকে এটি উপলব্ধি করতে হবে যে পাকিস্তানের বিভাজন আমাদের স্বার্থেই হচ্ছে, এমন সুযোগ (আবার) কখনও আসবে না।" (হিন্দুস্তান টাইমস, নয়া দিল্লী, ১লা এপ্রিল, ১৯৭১।) একই বক্তৃতায় তিনি একে 'শতাব্দীর সেরা সুযোগ' বলে অভিহিত করেন আর তাদের এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ভারতীয় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

এই মৌখিক সমর্থনকে ভারত বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে। এর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। এপ্রিলের শুরুতে যশোর ও খুলনার কাছে পাকিস্তান এলাকার বেশ কয়েক কিলোমিটার ভিতর থেকে তাদের ছয়জনকে আটক করা হয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ইন্সপেক্টর-জেনারেল তার ফৌজকে 'বিদ্রোহীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সেবক' বলে অভিহিত করেন। ভারতীয় নিয়মিত সেনাবাহিনীর বহু অফিসার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক পোশাকে কাজ করছিলেন। তাদের দু'জন আলাদা করে পরবর্তীতে



আমাকে বড়াই করে বলছিলেন (যখন আমি ভারতে যুদ্ধবন্দী ছিলাম) যে তারা পুরো মার্চ জুড়ে ও এর পরেও পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন।

তাদের সম্পৃক্ততার সীমা যদি এতদূরই থাকে, তাহলে মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের শুরুতেই ভারতীয়রা সামরিক হস্তক্ষেপ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার সুযোগ কেন হারাল, যে সময় আমরা খুবই অরক্ষিত ছিলাম? ভারতের ১৯৭১ যুদ্ধের সরকারী ইতিহাসবেত্তা, মেজর-জেনারেল ডি কে পালিত (ডি কে পালিতের The Lightneing Campaign, পৃ: ৪২) বলেন যে ভারতীয় সেনাপ্রধান এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন, কারণ তার সেনাবাহিনী তখনও পুনঃসজ্জা ও পুনঃগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। জেনারেল পালিত বলেন যে ৫০,০০০ মিলিয়ন রুপীর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তখন সম্পন্ন করা হচ্ছিল আর ভারতের যুদ্ধ যন্ত্রের শক্তিবর্ধন করতে তখনও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাকী ছিল। তিনি বলেন:

"সেনাবাহিনীতে, লোকবলের সংস্থান তখনও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি আর অনেক ইউনিট তখনও নিম্নশক্তির ছিল। কিছু সাঁজোয়া বাহিনী তখনও উন্নয়ন ও পুনঃসজ্জা সম্পূর্ণ করেনি। মোবাইল অপারেশন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও লজিস্টিক ইউনিটের ঘাটতি ছিল। বিমান বাহিনীতে, মিগ-২১-এর যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তখনও পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়নি আর কিছু স্কোয়াড্রনে বাড়তি সৈন্যের অভাবে তাদের সেবার মান কমে গিয়েছিল। নৌবাহিনীতেও পুনঃসজ্জার প্রকল্প তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেনাবাহিনীর যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে আরও কয়েক মাসের ক্র্যাশ প্রোগ্রামিং-এর দরকার ছিল। ..... এর চেয়ে গুরুতর ব্যাপার ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য তোলা দাবী যা সেনাবাহিনীর শক্তির ভারসাম্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। দু'টি ডিভিশনকে (তাদের ভারী অস্ত্র ছাড়া) পশ্চিমবঙ্গে আর নাগাল্যান্ড ও মিজো পার্বত্য এলাকায় একটি করে ডিভিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে বিমান বাহিনীও নিজেদেরকে হাত-বাঁধা পায় কারণ বাংলাদেশে অপারেশনের জন্য আমাদের বেজগুলোকে তৈরি করা হয়নি। শিলচরে কুড়িগ্রাম এয়ারফিল্ড, যেটি কুমিল্লা সেক্টরের উপর দিয়ে অপারেশন চালানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা, কাজ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।" (ডি কে পালিতের The Lightneing Campaign, পৃ: ৪০-৪২।)



পরে জনাব কে সুব্রামানিয়াম, The Liberation War -এর সহ-রচয়িতা হিসেবে, পাকিস্তানের সাথে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের জন্য নয় মাসকে ন্যূনতম সময় হিসেবে বেঁধে দেন। তিনি বলেন, "..... এমন একটা সফল কার্যক্রম আরম্ভ করার আগে সকল প্রস্তুতি নেয়া, আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিজ্ঞা নেয়া ইত্যাদি করার জন্য আমাদের নয় মাস সময় প্রয়োজন ছিল।" (মোহাম্মদ আইয়ুব ও কে, সুব্রামানিয়ামের The Liberation War, নয়া দিল্লী, পৃ: ১৭৭।)

সামরিক প্রস্তুতি ছাড়াও, চীনের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে কূটনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করা আর সুবিধাজনক বিশ্বমত তৈরি করার জন্য ভারতের সময়ের দরকার ছিল। তারা এই সবগুলো ক্ষেত্রে একসাথে কাজ শুরু করল। যখন তাদের সেনাপ্রধানরা তাদের বাহিনীর পুনঃসজ্জা আর পুনঃগঠনের জন্য তাড়াহুড়া করছিল, তখন তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারত-সোভিয়েত "শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা" চুক্তির প্রাথমিক প্রস্তাব উত্থাপন করে ও ১৯৭১-এর ৯ই আগস্ট তা স্বাক্ষর করে। বিশ্বমতকে প্রভাবিত করে তাদের অনুকূলে নিতে তারা পূর্ব পাকিস্তানের অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে ভারতে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের উপস্থিতির সংখ্যাকে বাড়িয়ে দেখিয়ে তা কাজে লাগায়।

এদিকে, ভারত বিদ্রোহ দমন করতে পাকিস্তানকে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দেয়নি। তারা একটি বিদ্রোহী দল গঠন করে, সাধারণভাবে যাকে মুক্তি বাহিনী নামে সবাই জানে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদ্রোহ করেছিল, তারা এই বাহিনীর মেরুদন্ড হিসেবে আবির্ভূত হল। এদের সাথে যোগ দিয়েছিল ছাত্র, আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক আর শক্তসমর্থ উদ্বাস্তুরা। কর্নেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী হলেন এদের কমান্ডার-ইন-চিফ।

এই বিদ্রোহী বাহিনীর উপর রাজনৈতিক ছত্রছায়া হিসেবে ভারত আওয়ামী লীগের নেতাদের উপস্থিতিকে কাজে লাগাল যারা ২৫শে মার্চ সেনাবাহিনীর অ্যাকশনের শুরুতেই কোলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী ও মুশতাক আহমেদ খন্দকার। তারা একজোট হয়ে মুক্তিবাহিনীর সাহায্য আর ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাংলাদেশকে স্বাধীন' করার মিশন নিয়ে একটা নির্বাসন-সরকার গঠন করেন।

ভারতীয় সেনাপতিরা মুক্তিবাহিনীর জন্য নিম্নোক্ত কার্যধারা স্থির করে রেখেছিল:



"বাংলাদেশে নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শুরুতে নিষ্ক্রিয় করে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে নিজের দেশের মাটিতে সেনা মোতায়েন করা, পরবর্তীতে গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এর তীব্রতা বাড়ানো, ইস্টার্ন সেক্টরে পাকিস্তান বাহিনীর প্রাণরস শুষে নিয়ে ক্ষয় করে ফেলা, এবং সবশেষে আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শুরু করা শত্রুতার ঘটনায় ইস্টার্ন ফিল্ড ফোর্সের সাথে স্থায়ী সেনাবাহিনীদের অঙ্গীভূত করার সুযোগ নেয়া।" (প্রাণ চোপড়ার India's Second Liberation, দিল্লী, পৃ: ১৫৫।)

মুক্তি বাহিনী এই পরিকল্পনা ধাপে ধাপে কার্যকর করার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রথম ধাপে, তাদেরকে অতর্কিত হামলা করা, গুলি করা, গ্রেনেড ছোঁড়া আর রাইফেল চালানোর জন্য চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরবর্তীতে, প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়িয়ে আট সপ্তাহ করা হয় আর এতে সব ধরণের ক্ষুদ্র অস্ত্র পরিচালনা করা সহ আরও কিছু কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সবশেষে, তাদের ৩০,০০০ জনকে অস্ত্র দেয়া হয় ও ভারতের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি থেকে নিয়মমাফিক যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়, অন্যদিকে বাকী ৭০,০০০ জনকে গেরিলা যুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুত্থানের কর্মকান্ডকে তিনটি পর্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়:

১ম পর্যায় (জুন-জুলাই): তারা সীমান্ত এলাকায় অপারেশন চালায় যেখানে তাদেরকে নৈতিক ও বস্তুগতভাবে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ফৌজ কাছাকাছি থাকে। এই পর্যায়ে, বিদ্রোহীরা খুব ভীতসন্ত্রস্ত আচরণ করত আর ধরা পড়ার কিংবা পাল্টা আক্রমণের সামান্য লক্ষণ দেখলেও তাদের আশ্রয়স্থলে দ্রুত পিছু হটে যেত। তাদের মূল অর্জন ছিল কিছু ছোটখাট কালভার্ট উড়িয়ে দেয়া, অব্যবহৃত রেল লাইনে মাইন বসানো, গ্রেনেড নিক্ষেপ করা অথবা কোন নগণ্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হয়রানি করা।

২য় পর্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর): তারা তাদের প্রশিক্ষণ ও অপারেশনগুলোতে কৌশলের উন্নতি সাধন করে। তাদেরকে দেখে আরও আত্মবিশ্বাসী, আরও উদ্দীপ্ত ও আরও ভালো নেতৃত্বাধীন মনে হত। এখন তাদের কৃতিত্বের মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর গাড়ির বহরে অ্যামবুশ করা, থানায় আক্রমণ চালানো, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো উড়িয়ে দেয়া, নৌবহরগুলোকে ডুবিয়ে দেয়া আর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা। তাদের অপারেশন ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।



৩য় পর্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর): তারা সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ দুই এলাকাতেই ভালোমত সক্রিয় ছিল। ভারতের ফৌজ আর আর্টিলারীর সহায়তায় তারা সীমান্ত চৌকিগুলোতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে আর গুরুত্বপূর্ণ নগর ও শহরগুলোতে ঝামেলা উসকে দিতে থাকে। এই দ্বৈত আক্রমণ আমাদের সম্পদের উপর অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দিতে থাকে আর আমাদের মানসিক শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই পর্যায়েই ভারতীয় সেনাবাহিনী কিছু গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণের পাদভূমি তৈরি করে ফেলে যা তারা যুদ্ধে লাভজনকভাবে ব্যবহার করে।

তাদের ভূমিকা বাড়ার সাথে সাথে মুক্তি বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের সংখ্যাও বাড়তে থাকল, মে-তে ৩০ থেকে বেড়ে আগস্টে ৪০ আর সেপ্টেম্বরে ৮৪-তে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি শিবিরে একটি প্রশিক্ষণ পর্বে ৫০০ থেকে ২০,০০০ জন করে বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধের আগেই তাদের মোট শক্তি গিয়ে দাঁড়ায় ১০০,০০০-এ।

শুরুতে, বিদ্রোহীদের জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি পেতে ভারতের একটু সমস্যা হচ্ছিল, কিন্তু ইউএসএসআর-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর তারা অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল শক্তি পেয়ে গেল। "সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে বিদ্রোহীদের কাছে পৌঁছে দেয়া অস্ত্রের ঘাটতি পূরণ করে দিবে বলে আশ্বাস দেয়ার পর গেরিলাদের কাছে ভারতীয় অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।" (New Reviw on Pakistan, The Institute of Strategic Strudies and Analysis, নয়া দিল্লী, নভেম্বর, ১৯৭১।) ঢাকায় একজন বৃটিশ মহিলা সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন যে তিনি বিদ্রোহীদেরকে অতীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বাতিল সোভিয়েত অস্ত্র হাতে দেখেছেন যেগুলো এর আগে পূর্ব ইউরোপে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এর সাথে, বাংলাদেশ নির্বাসন-সরকার ভারতের সাহায্য আর বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের দূতদের সংগ্রহ করা সাহায্যের অর্থ নিয়ে কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিনেছিল।

পাকিস্তান এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কিভাবে করেছিল? অভ্যুত্থানের ক্রমবর্ধমান বিপদ মোকাবিলা করার জন্য তার ছিল ১,২৬০ জন অফিসার আর অন্যান্য র‍্যাংকের ৪১,০৬০ জন। এই লোকবলকে ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কাজ করতে হয়েছে। কিংবদন্তী গেরিলা নেতা টি ই লরেন্স প্রতি চার বর্গমাইলে ২০ জনের অনুপাত স্থির করে দিয়েছিলেন। (টি ই লরেন্সের Seven Pillars of Wisdom, লন্ডন, পৃ: ১৯২।) এই সংখ্যাটি তিনি স্থির করেছিলেন মরুভূমির যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের মত এত



গাছপালা নেই যা পর্যবেক্ষণের জন্য বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এমন কি মরুভূমির সূত্র দিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাকিস্তানের ৩৭৫,৬৪০ জন লোক দরকার ছিল, যা প্রাপ্ত ফৌজের সংখ্যার প্রায় সাতগুণ। একজন বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ডেভিড লুসাক প্রয়োজনীয় ফৌজের সংখ্যা ধরেন ২৫০,০০০। (ডেভিড লুসাকের Pakistan Crisis, লন্ডন, পৃ: ১৩০।) তারপরও যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পাকিস্তান পুরো নয় মাস ব্যাপক অভ্যুত্থানকে কার্যকরভাবে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

পাকিস্তান স্পর্শকাতর সীমান্ত চৌকিগুলো আর গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও সাব-ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারগুলো ধরে রেখে তার উপস্থিতি বজায় রেখেছিল। তারা ৩৭০টি সীমান্ত চৌকির মধ্যে ৯০টি এবং প্রায় সবগুলো প্রধান শহর দখল করে রেখেছিল। শহরে তাদের বেজগুলো রেখে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কর্মকান্ডের খবরের ভিত্তিতে আশেপাশের এলাকায় অপারেশন চালাত। এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণত ঘটে, শাস্তি দিতে যাওয়া ফৌজ বিদ্রোহীদের উপর কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আগেই তারা হাওয়া হয়ে যেত। তবে অভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়ে, বিদ্রোহীরা একেক সময় ক্লিয়ারিং ফৌজদের প্রতিরোধ করত আর শুধু তখনই তাদের লুকানোর জায়গাগুলো ছেড়ে যেত যখন শক্তিশালী কলামের হাতে তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত।

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের ফৌজ খুবই সক্রিয় ছিল, যখন অভ্যুত্থান তার শৈশব পার করছিল। যতই বিপদ বাড়তে থাকল, কমান্ডাররা ততই নিস্পৃহ হয়ে পড়লেন আর একান্ত অপরিহার্য না হলে অ্যাকশনে যেতেন না। শেষ পর্যায়ে (অক্টোবর-নভেম্বর), তারা সাধারণত বেজগুলোতেই আঠার মত লেগে থাকতেন আর তাদের নেতৃত্বের ঝুঁকি নিতেন না। এর হয়ত অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে মূল কারণ ছিল, কোন বিশ্রাম ছাড়া দীর্ঘায়িত অনিয়মিত যুদ্ধ।

অভ্যুত্থান অপারেশনের পরিণতির সাথে সাথে বাঙালীদের আচরণও ওঠানামা করছিল। তারা সাধারণত জয়ী দলের পক্ষ নিত। যখন আমাদের ফৌজ থাকত, তখন জনগণ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে থাকত, কিন্তু যখনই তাদেরকে সরিয়ে নেয়া হত, তারা পূর্ণ উষ্ণতার সাথে তাদের নতুন প্রভু (মুক্তি বাহিনী)-কে বরণ করে নিত। কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি দুই সেট পতাকা রাখত - পাকিস্তান আর বাংলাদেশের - পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তাদের ছাদে ওড়ানোর জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু একেকটা পতাকা ওড়ানোর মত সহজ



ছিল না। তারা যখন প্রাচীরের ভুলদিকে ধরা পড়ত, তখন চরম দুর্দশা ভোগ করত। প্রতীকস্বরূপ এ ধরণের একটি ঘটনার কথা বলি।

এটি ঘটেছিল আগস্টে নোয়াখালী জেলায়। এক বিদ্রোহী-অধ্যুষিত এলাকায় অভিযান চালাতে একজন নিম্নপদস্থ সেনাপতিকে সাতজন লোক দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তরুণ সেই অফিসার আদেশ মোতাবেক 'কৌশল ও নমনীয়তা' খাটিয়ে তার পাঁচজন লোককে বিদ্রোহীদের হাতে নৃশংসভাবে হত্যা করাল। এবার একজন ক্যাপ্টেনের অধীনে শক্তিশালী একটা বাহিনী পাঠানো হল। বিদ্রোহীদের কাছে ভালো অস্ত্রের মজুদ ও ভালো লুকোনোর জায়গা থাকায় তারা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিল। পূর্বের উদাসীনতার কারণে পড়ে থাকা কিছু মৃতদেহ ক্যাপ্টেনের নজরে পড়লে তিনি দিব্যচোখে তার ফৌজেরও একই পরিণতি দেখতে পেলেন যদি তিনিও পরিস্থিতি নরমভাবে সামাল দিতে চান। তিনি চিৎকার করে বিদ্রোহীদেরকে দুইবার সতর্ক করলেন, কিন্তু কোন কাজ হল না। তিনি তখন সমস্ত এলাকা ঘেরাও করে তার কাছে যত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব একত্র করলেন। কান্নার উঁচু আওয়াজ আর ধোঁয়ার ঘন কুন্ডলী উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ লোক সাদা পতাকা হাতে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাব গৃহীত হল, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো জীবন ধ্বংস হল।

বিদ্রোহীরাও একই রকম শাস্তি দিয়ে যাচ্ছিল, কখনও কখনও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'দোসরদের' এর চেয়েও ভয়ংকররূপে।

মূল সমস্যা ছিল বিদ্রোহীদেরকে নিরীহ জনগণ থেকে আলাদা করা। তারা সাধারণত মিশে থাকত যেমন করে পানিতে মাছ থাকে। জেনারেল টিক্কা খানকে পরামর্শ দেয়া হয় যে সীমান্তের ৩ কিলোমিটার এলাকা জনশূণ্য করে ফেলা হোক যাতে করে ফৌজরা ঐ এলাকায় সকল সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গুলি করতে পারে। অবশ্য জেনারেল টিক্কা খান পরামর্শটি ফিরিয়ে দেন। তিনি মনে করলেন এতে পুনর্বাসন সমস্যা আরও বেড়ে যাবে আর এর মধ্যেই ৪ই সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে ভারত থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

তাই বিদ্রোহী আর তাদের সাহায্যকারীরা এভাবেই মিশে যেতে থাকল। তাদের একজনকে অন্যদের থেকে আলাদা করা মুশকিল ছিল কারণ তারা সবাই দেখতে একই রকম ছিল। স্টেনগান বহন করা কোন বিদ্রোহী দরকার পড়লে ক্ষেতে তার অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে নিরীহ



কৃষক হিসেবে কাজ শুরু করে দিতে পারত। অন্যদিকে, নিরীহ চেহারার কোন জেলে তার কাজ ফেলে কোন গাড়ীর বহর আসার পথে মাইন পুঁতে রেখে হাওয়া হয়ে যেতে পারত। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সত্যি ঘটনার কথা বলি।

রাজশাহীতে একটি খবর পাওয়া গেল যে রোহনপুর এলাকায় বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়েছে আর তাদেরকে খাবার, টাকা আর আশ্রয় দেয়ার জন্য লোকজনের উপর জোর করছে। একদল সৈন্য এলাকায় তল্লাশি চালাল কিন্তু ক্ষেতে কাজ করতে থাকা তিনজন কৃষক ছাড়া আর কাউকেই পেল না। তারা যখন ফিরে আসছিল তখন একজন দাঁড়িওয়ালা লোককে পেয়ে তার বুকে বেয়নেট ঠেকিয়ে জোর করে খবর বের করতে চাইল যে বিদ্রোহীরা কোথায় আছে। তার ইঙ্গিতে ফৌজ ঐ তিন কৃষককে ঘিরে ফেলল আর ক্ষেত থেকে বেশ কিছু গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য আর প্রচারমূলক লিফলেট খুঁজে পেল। তিনজনই মুক্তি বাহিনীর বিশ্বস্ত সদস্য বলে প্রমাণিত হল।

সেনাবাহিনীর চোখে ধাঁধা দেয়ার জন্য তারা আরও কিছু কৌশল কাজে লাগিয়েছিল। যেমন, বেনাপোল ও রঘুনাথের মাঝামাঝি (যশোর সেক্টর) নিয়মিত চৌকির দায়িত্বরত দুই সৈন্য দেখে যে একজন দুঃস্থ চেহারার লোক একটি সবজি ভর্তি বস্তা নিয়ে আসছে। যেহেতু তাদের সময় কাটানোর জন্য তারা কোন বিদ্রোহীকে পায়নি, তারা এমনিই চিৎকার করে লোকটিকে বলল, "কী নিয়ে যাচ্ছ, বাবা?" বৃদ্ধলোকটি ভয়ে কাঁপতে থাকল। তারা যখন তার বস্তা খুলল, দেখল বস্তা ভর্তি টাইম ফিউজ (অতর্কিত হামলার জন্য) যা সবজি ছিটিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। একইভাবে, লেফটেন্যান্ট ফাররাখ ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চলে তল্লাশি চালিয়ে মৌসুমী ফল বোঝাই একটা নৌকা পাকড়াও করেন। ফলের নীচে নৌকা ভরা মাইন আর গ্রেনেড ছিল।

অভ্যুত্থানকারীরা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য বিভিন্ন রাস্তাও কাজে লাগাত। সাধারণত, তারা গ্রামের ভিতরের পথে অপারেশন চালাত, যেখানে আমরা মূল সড়ক ব্যবহার করতাম। বিদ্রোহীরা এটা জানত আর এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত। সীমান্তের ওপারের কমরেড-ইন-আর্মস-এর কাছে পাঠানো রংপুরের এক বিদ্রোহীর চিঠিতে লেখা ছিল, "পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের কখনই ধরতে পারবে না। তারা শুধুমাত্র মূল প্রবেশ পথ, জনপ্রচলিত ফেরী আর প্রধান ঘাটগুলো পাহাড়া দেয়, যেখানে আমরা শুধুমাত্র চোরা গলি, ছোট রাস্তা আর জনবিরল পথ ব্যবহার করি। আবার, তারা নৌকাগুলোর ভিতরে কী নেয়া



হচ্ছে তার তোয়াক্কা না করেই সেগুলো তল্লাশি করে। আমাদের আশ্রয়স্থল হল মসজিদের ইমামদের (স্থানীয় ধর্মীয় নেতা) অথবা শান্তি কমিটির মূল নেতাদের নিজেদের বাড়ি, যেহেতু সেনাবাহিনী তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ করে না। আমাদের কৌশলগুলো দুর্বোধ্য, আমাদের লক্ষ্য উঁচু। আমরাই জয়ী হব।"

সময়ের সাথে সাথে, তাদের অতর্কিত হামলার কাজগুলো কিছুটা আধুনিক হয়ে উঠল। যেমন, শুরুতে তারা বুবি ট্র্যাপস বা সেফটি ভালভ ব্যবহার করত, কিন্তু আমরা যখন বিপদ এড়ানোর জন্য প্রধান বহরের সামনে একটা খালি মালগাড়ি বা রেলের বগী ঠেলে দেয়া শিখে গেলাম, তারা তখন কৌশল পাল্টে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর ব্যবহার শুরু করল, যার ফলে তারা ইচ্ছামাফিক লক্ষ্যকে উড়িয়ে দিতে পারত। যখন তাদের ডায়নামোগুলো জব্দ করা হল তখন তারা ড্রাই ব্যাটারী ব্যবহার করা শুরু করল যেগুলো সাধারণ টর্চ কিংবা বাঁশের খোলের ভিতরে নিয়ে সহজেই পাচার করা যেত।

নদীপথে অপারেশনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। তারা শুরু করেছিল জাহাজ, বার্জ বা কোস্টারের সাথে সাধারণ বোমা বেঁধে দিয়ে; কিন্তু আগস্টের মধ্যে তারা সেটা পাল্টে লিমপেট মাইনের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করল যেটা লক্ষ্যের যে কোন জায়গায় খুব সহজে এর চৌম্বকীয় পৃষ্ঠ দিয়ে বসিয়ে দেয়া যেত। যখন এটাও তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠল তখন তারা ডুবুরিদের কাজে লাগাল যারা জাহাজের অলক্ষে সাঁতরে গিয়ে মাইন বসিয়ে ফিরে আসতে পারত। ভারতীয় নৌবাহিনী এই কাজের জন্য ৩০০ জন ফ্রগম্যানকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। (ডি আর মানকেকারের Pakistan cut to size, দিল্লী, ১৯৭২, পৃ: ১৩৩।) একেক সময় তারা পানির নিচে ডুবুরিদের বাতাসের যোগানের জন্য এয়ার পাইপ হিসেবে নলখাগড়া ব্যবহার করত। পরবর্তীতে, তারা এর বদলে কোন ভাসমান বস্তু - বাঁশের লাঠি কিংবা কলাগাছের গুঁড়ির সাথে - লিমপেট মাইন আটকে ভাসিয়ে দিত যেটা এর স্টিলের আবরণের জন্য একাই গিয়ে লেগে যেত।

তাদের অতর্কিত হামলার তালিকায় ছিল, ২৩১টি সেতু, ১২২টি রেললাইন আর ৯০টি বিদ্যুৎ স্থাপনার ক্ষতি বা ধ্বংস। বড় ধরণের উদ্দীপনা ছাড়া এই সংখ্যায় তারা পৌঁছাতে পারত না। তাদের উদ্দীপনার একটা উদাহরণ দিই। ১৯৭১-এর জুনে রোহনপুর এলাকায় (রাজশাহী জেলা) অতর্কিত হামলার চেষ্টার জন্য এক বাঙালী কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়, কিন্তু সে কোনরকম



তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। যখন অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হয়, মেজর 'আর' তার বুকে স্টেনগান ঠেকিয়ে বলেন, "এটাই তোমার শেষ সুযোগ। তুমি যদি সহযোগিতা না কর, এই বুলেটগুলো তোমার শরীর চিরে বের হয়ে যাবে।" সে ঝুঁকে পড়ে মাটিতে চুমু খেল আর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার রক্ত নিশ্চয়ই আরও দ্রুত আমার পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা বয়ে নিয়ে আসবে।"

কৌশলে এমন আধুনিক আর এত বেশী উদ্দীপ্ত অভ্যুত্থানকারীদের সমূলে উৎপাটন করা সেনাবাহিনীর জন্য কোন সহজ কাজ ছিল না। তারপরও তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল। শুরুতে তারা সড়কপথে কলাম পাঠাত, কিন্তু কিছু বিস্ফোরণের ঘটনার পর ফৌজরা গ্রামের ভিতর দিয়ে অপারেশন চালায়। এর ফলে তারা গুলিবর্ষণ ও অ্যামবুশের শিকার হয়। বর্ষাকালে তারা বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করতে দেশী নৌকা ব্যবহার করে কিন্তু প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারেনি যদিও তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় 'ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স' ছিল। একেক সময় নৌকাগুলো নিজে নিজেই ডুবে যেত অথবা বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে উল্টে যেত। এরপর আমরা কাদাজলে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন করলাম, যেখানে শুধুমাত্র আগাছা আর জোঁকই থাকবে জ্বালাতন করার জন্য। সমভূমি থেকে আসা মানুষগুলোকে হয়রানির জন্য ঐ জোঁকই যথেষ্ট ছিল। আমি এক লেফটেন্যান্টকে দেখেছিলাম, শহীদ তার নাম, তার পায়ে অনেকগুলো জোঁকের কামড়ের দাগ ছিল। যুদ্ধের পরেও অনেকদিন সে ঐ ঘা বয়ে বেড়িয়েছিল।

এই অপারেশনের সময় কিছু ফৌজ, সবার জন্য লজ্জা বয়ে নিয়ে এসে লুট, হত্যা আর ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছিল। সরকারীভাবে নয়টি ধর্ষণের খবর রিপোর্ট করা হয় ও অপরাধীদের চরম শাস্তি দেয়া হয় - কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গিয়েছিল। এরকম ঘটনা সব মিলিয়ে কতগুলো ঘটেছিল তা জানি না - তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন মাত্র সৈন্যও যদি ধর্ষণ করে থাকে তো সেটা পুরো সেনাবাহিনীর সৎকর্মকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

পাশবিকতার এই ঘটনাগুলো স্বভাবতই বাঙালী জনগণকে বিদ্বেষী করে তুলল। তারা আগেও আমাদের খুব একটা পছন্দ করত না, কিন্তু এখন তারা আমাদের তীব্র ঘৃণা করা শুরু করল। এই প্রবণতা ঠেকানোর জন্য বা ঘৃণা লাঘবের জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা চালানো হয়নি। সুতরাং, বাঙালীদের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার কোন প্রশ্নও আর



ওঠে না। শুধু তারাই আমাদের সাথে হাত মেলালো যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে সবকিছুর ঝুঁকি নিতে পারে।

এই দেশপ্রেমিকেরা দুই অংশে ভাগ হয়ে সংগঠিত হয়। বয়স্ক ও বিশিষ্টজনেরা মিলে তৈরি করে শান্তি কমিটি, অন্যদিকে তরুণ ও শক্ত-সমর্থরা রাজাকার (স্বেচ্ছাসেবক) হিসেবে যোগ দেয়। পল্লী এলাকার মত ঢাকায়ও কমিটিগুলো গঠিত হয় আর তারা সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে কার্যকর সংযোগ হিসেবে কাজ করে। একই সাথে তারা বিদ্রোহীদের রোষানলেও পড়ে আর তাদের ২৫০ জনকে হত্যা, জখম করা কিংবা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য আর স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা অনুভবের জন্য রাজাকারদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। এই লোকবল ৫০,০০০-এ উন্নীত করা হয়, ১০০,০০০ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে। সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল জেনারেল নিয়াজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি জামায়াত-ই-ইসলামীর মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়েছেন। জেনারেল আমাকে তার অফিসে ডেকে বললেন, "এখন থেকে তুমি রাজাকারদের আল-বদর ও আশ-শামস বলে অভিহিত করবে, যাতে বোঝা যায় যে এরা একটি মাত্র দল থেকে আসেনি।" আমি আদেশ মান্য করলাম।

আল-বদর ও আশ-শামস ছিল নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়া দল, তারা সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে উদগ্রীব থাকত। তারা কঠোর পরিশ্রম ও কঠোর সাজা ভোগ করেছিল। তাদের বা তাদের পরিবারের প্রায় ৫,০০০ জন সহযোগিতার অপরাধে মুক্তি বাহিনীর হাতে শাস্তি পেয়েছিল। তাদের কয়েকজন আত্মত্যাগের এমন মহিমা দেখিয়েছিল যা বিশ্বের সেরা ফৌজের সাথে তুলনীয়। যেমন, নওয়াবগঞ্জ থানার গালিমপুর থেকে আসা এক রাজাকার, বিদ্রোহীদের এক লুকানোর জায়গায় হামলা করার জন্য সেনাবাহিনীর এক কলামের সাথে পথপ্রদর্শক হিসেবে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে দেখে, তার তিন ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে আর মেয়েকে তুলে নেয়া হয়েছে। তার এই ত্যাগ শুধু সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের প্রতি তার বিশ্বস্ততাই নিশ্চিত করে। আরেকজন রাজাকার, গোমস্তপুরে (রাজশাহী) একটি সড়ক-সেতু পাহারা দেয়ার সময় বিদ্রোহীদের কাছে ধরা পড়ে যারা তাকে জয় বাংলা বলার জন্য জোর করে, কিন্তু সে বেয়নেটের খোঁচায় মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে চিৎকার চালিয়ে যায়।



অবশ্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের বিচারে রাজাকাররা কোনভাবেই মুক্তি বাহিনীর সমকক্ষ ছিল না। তাদের দুই বা চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হত যেখানে মুক্তি বাহিনী আট সপ্তাহের নিবিড় প্রশিক্ষণ পর্বের মধ্য দিয়ে যেত। রাজাকারদের অস্ত্র বলতে ছিল বিলুপ্ত পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্র রাইফেল আর মুক্তিবাহিনী বহন করত স্বয়ংক্রিয়সহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। এজন্য রাজাকাররা যতক্ষণ সেনাবাহিনীর সাথে কাজে নিয়োজিত থাকত ততক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য তাদের উপর নির্ভর করা যেত না।

এজন্য, অভ্যুত্থানের মূল ধকলের বোঝাটা নিয়মিত ফৌজকেই টানতে হয়েছিল, যারা বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার সাথে বিরোধ সহ্য করে গিয়েছিল। তাদের দুর্দশার অবস্থা শুধুমাত্র হতাহতের সংখ্যা দিয়ে মাপা যাবে না। মানসিক দিক দিয়ে আরও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ফৌজের মনোবলের উপর যে বাস্তবতাটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল তা হল, না তো আহতদের সব সময় চিকিৎসার জন্য সামরিক হাসপাতালে সরিয়ে নেয়া যেত, আর না মৃতদের দেহ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো যেত। একেক সময় আহতরা হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়ার আশায় দিনের পর দিন সীমান্ত চৌকিতে পড়ে থাকত, কারণ সীমান্ত চৌকির সংযোগ সড়কে সাধারণত মাইন পোঁতা থাকত অথবা গোলাবর্ষণ দিয়ে প্রতিরক্ষা করা থাকত। আর হেলিকপ্টারও আসতে পারত না যদি না রেজিমেন্টাল মেডিকেল অফিসার (আরএমও) প্রত্যয়ন দিতেন যে আহতদের অবস্থা আকাশপথে বহন করার নির্দেশ দেয়ার মত গুরুতর। অন্যদিকে, আরএমও আহতদের কাছে পৌঁছাতে পারতেন না, কারণ তিনি থাকতেন বেশ কয়েক কিলোমিটার পিছনের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে। অ্যামবুশ আর মাইনের জন্য আহতদেরই যদি সড়কপথে সরিয়ে না নেয়া যায়, তাহলে ডাক্তারই বা কিভাবে সে জায়গায় যাবে?

তবে কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। যে কারও পক্ষে এই দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। কারুর হাত-পা কাটা ছিল, কারুর মুখ সম্পূর্ণ ঝলসে গিয়েছিল। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে অন্ধ বা বধির হয়ে গিয়েছিল। তাদের বেশির ভাগ, চিকিৎসার পরেও, পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করবে। আরও অনেককে সামান্য জখম, পায়ের পাতার পচন, ছত্রাক ও জোঁকের ঘা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার দায়িত্বের বোঝা বইতে হচ্ছিল। তারা মাসের পর মাস কোন বিশ্রাম, স্বস্তি বা বিনোদনের চেহারা দেখেনি।



আর মৃতদের ব্যাপারে, আমরা শুরুতে তাদের দেহ পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাতাম, কিন্তু জুলাই-আগস্টে যখন তাদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল আমরা তাদের স্বজনদের কাছে মরদেহ পাঠানো বন্ধ করে দিলাম কারণ 'অহেতুক ভীতির সঞ্চার' হবার ভয় ছিল। যখন সফররত চিফ অব জেনারেল স্টাফকে এই অপ্রিয় সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, রিপোর্ট করা হয় যে তিনি নির্বিকারভাবে মন্তব্য করেছিলেন, "মৃতরা পূর্বে যেমন অকেজো, পশ্চিমেও তেমনই।"

তবে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বজনরা সব সময় চাইত যেন তাদের মৃত স্বজনকে বাড়িতে পাঠানো হয়। আমার মনে পড়ে ৩১ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারের কাছে এক অফিসারের বোন চিঠি লিখেছিলেন। একটি অংশে তিনি বলেন, "আপনি যখন করাচী ছেড়ে যাচ্ছিলেন, আমি আমার সুদর্শন ভাইকে আপনার দায়িত্বে সঁপে দিয়েছিলাম। আপনি যদি তাকে অক্ষত ফিরিয়ে আনতে না পারেন, তো তাকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসতে ভুলবেন না।" তিনি তার ভাইকে আর কখনই দেখেননি, জীবিত বা মৃত।



১৩শ অধ্যায়: রাজনীতি, ঘরে বাইরে

২৫শে মার্চ সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়ার পর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান দীর্ঘ মানসিক ছুটিতে চলে যান। আপাতদৃষ্টিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পরিণতি নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন আর তার ফৌজ তাদের ঘাম, রক্ত আর জীবন দিয়ে যে সময়টুকু বের করেছিল তার কোন সুবিধাও ভোগ করেননি।

ইয়াহিয়ার নিষ্ক্রিয়তার পেছনে বেশ কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, যার কয়েকটা ছিল অনুমানভিত্তিক। প্রফেসর জি ডব্লিউ চৌধুরী বলেন যে এই কয়েকটা মাসে ইয়াহিয়াকে "ভাবলেশহীন দেখাত আর মনে হত যে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন না।" (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৯১।) তিনি এমন একটা ইঙ্গিত দেন যে ইয়াহিয়া খান, একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ, তার ফৌজের বর্বরতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আর বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে তা ক্ষমার যোগ্য করে তুলবেন। অন্যদিকে, ইয়াহিয়ার অধীনস্থদের মধ্যে একজন জেনারেল আমাকে বলেন যে রাষ্ট্রপতি জুনে পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন বলে পরিকল্পনা করেন ও করাচী যান, কিন্তু "সেখানে গিয়ে নারীসঙ্গে মত্ত হয়ে ওঠেন ..... ।" (সম্ভবত তিনি প্রায়ই যাদের সঙ্গ পেয়ে হালকা বোধ করতেন তাদের একজন।) অবশ্য ইয়াহিয়ার দলের একজন তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আবার আরেক কারণ দেখান। তিনি তার ঢাকা সফরগুলোর একটায় এসে উচ্চস্বরে বলেন, "এই 'জুয়াড়ীদের' সাথে কোনরকম রাজনৈতিক সমঝোতা করা যাবে না, যতক্ষণ না তাদেরকে ভালোভাবে ও যথাযথরূপে বেছে নেয়া হয়।" ইয়াহিয়া নিজে এক সাংবাদিককে বলেন, "যতবারই আমি ঢাকায় সফরের জন্য মনস্থির করি, আমার অধীনস্থরা আমাকে বলে যে এই সফর কোন দরকারী কাজে আসবে না।"

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান সফরে না এসেও কার্যকর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। আট মাসের দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে তিনি দুটি মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: গভর্নর টিক্কা খানকে বদলি করা আর বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা অনুমোদন করা। তার বন্ধুমহল থেকে বারবার পরামর্শ আসার পরই শুধু তিনি তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে কাজে লাগান।



প্রথমে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে বোঝানো হয় যে জনাব নুরুল আমিনকে প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিৎ যিনি একজন প্রবীণ বাঙালী এমএনএ এবং প্রদেশের সাবেক মুখ্য মন্ত্রী, কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে এই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মনোনয়ন করা হয় ডা: এ এম মালিককে, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের একই রকম একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। ৭৫ বছর বয়সী ডা: মালিক ছিলেন শিক্ষায় একজন দন্ত চিকিৎসক, চর্চায় একজন শ্রমিক নেতা আর পেশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ। তিনি এই দায়িত্ব কাঁধে নিলেন।

পরামর্শ দেয়া হয় যে জেনারেল টিক্কা খানকে ঢাকায় রাখা হোক, হয় ফৌজের কমান্ডার হিসেবে অথবা আঞ্চলিক মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে। জেনারেল ফরমান রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন যে দুটির অফিস একত্র করে জেনারেল টিক্কা খানকে দেয়া হোক ও জেনারেল নিয়াজীকে ফিরিয়ে নেয়া হোক। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব ছিল।

জেনারেল টিক্কা খান নিজেও তার অপসারণ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ অফিসার্স মেসে তার সম্মানে দেয়া বিদায়ী নৈশভোজে তিনি আমাদের সবার উপস্থিতিতে বলেন (আমি ভাষান্তর করে বলছি):

"৪ঠা মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব বুঝে নিতে আমাকে তাড়াহুড়া করে রাওয়ালপিন্ডিতে আসতে বলা হয়। এখন হঠাৎ করে আমাকে বলা হচ্ছে যেন আমার দায়িত্ব ডা: মালিককে হস্তান্তর করি। এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, যেহেতু সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা একমাত্র রাষ্ট্রপতিই জানেন। আমি যতদূর উপলব্ধি করছি, এই মাঝরাস্তায় তোমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আমি আমার উপর অর্পণ করা দায়িত্ব সম্পন্ন করে যেতেই আগ্রহী ছিলাম। যা হোক, আশা হারিও না। তোমাদেরকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ কমান্ডার (নিয়াজী) আছেন। তবে একটা জিনিস মনে রেখ: তোমাদের হাত শিথিল করো না। শক্ত করে ঢাকনা আটকে রেখ। নইলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ..... ।"

পরদিন সকালে তাকে বিদায় জানাতে আমরা সবাই বিমান বন্দরে জড়ো হলাম। অল্প সংখ্যক বেসামরিক কর্মকর্তাও সেখানে ছিলেন। ছয় মাস আগে এই একই বিমান বন্দরে অবতরণ করা প্রত্যাশা আর আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল সেই প্রাণবন্ত জেনারেল আর তিনি নেই। এখন তিনি অনেক বেশী বিষণ্ন।



৩রা সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় নতুন গভর্নরকে শপথ পাঠ করানো হয়। অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, কুটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সদস্যগণ আর কিছু প্রবীণ রাজনীতিবিদ যেমন সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং মোনেম খান। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়, আমি নতুন গভর্নরের ন্যুজ দেহ, ঘোলা চোখ আর ঝুলে পড়া চোয়াল দেখছিলাম যিনি টিক্কা খানের মত একজন লৌহ মানবের জুতায় পা দিতে যাচ্ছেন।

ডা: মালিকের অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ শহরে দৃশ্যত উত্তেজনা কমিয়ে আনল। বাঙালীরা বিশেষভাবে তার ভক্ত ছিল না, কিন্তু যে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলের চেয়ে তাকে পছন্দ করত। নতুন গভর্নরও এইচ এস সোহরাওয়ার্দি, ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার (সমাধিস্থল) জিয়ারত করে শান্তিসূচক বার্তা ছড়িয়ে দিলেন। তিনি শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, বায়তুল মোকাররমে শুক্রবার জুমার নামাযও পড়লেন।

অবশ্য অবাঙালীরা, বিশেষ করে বিহারীরা, জেনারেল টিক্কা খানের বিদায়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তারা মনে করেছিল যে ঢাকায় একজন দুর্বল গভর্নরের সুযোগে বিদ্রোহীরা আরও বেশি করে তাদের জীবন বিপর্যস্ত করতে পারবে আর সম্পদের বেহিসাবী ক্ষতি সাধন করতে পারবে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, এক বিহারী সাংবাদিক ফোন করে আমার কাছে ব্যক্তিগত একটি ব্যাপারে সাহায্য চাইলে আমি তাকে স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দিই। তিনি দুঃখ করে বলেন, "আমাদের জন্য কোন স্থানীয় সরকার নেই। আমাদের গভর্নর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন।"

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত - সাধারণ ক্ষমা - ৪ঠা সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয়। সাধারণ ক্ষমায় সকল 'দুর্বৃত্তকে' ক্ষমা করা হয় ও যারা আটক আছে তাদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়। যদিও যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট করা হয়েছিল তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য করা হয়নি। সিদ্ধান্তটি যদিও ভালো উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছিল তারপরও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল কারণ তা অনেক দেরিতে এসেছিল। এতদিনে বিদ্রোহীরা ভারতের কাছে দলবদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে তাদের মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ নেতাদের নব্বইজন যারা এপ্রিলের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তার সহজ বিনিময়ে আমাদের সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিলেন তারা শেষ পর্যন্ত 'স্বাধীনতা যুদ্ধে' সাহায্য



করতে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য আর মুজিবের মুক্তির গুজবের কারণে বিদ্রোহীদের কাছে সাধারণ ক্ষমা গ্রহণযোগ্যতা পেল না।

সাধারণ ক্ষমার নির্দেশের ফলে যে অর্জনটুকু হয়েছিল তা ছিল প্রায় দুইশ' রাজবন্দীর মুক্তি। আমার উপস্থিতিতেই জয়দেবপুর জেল থেকে তাদের একশ' ষাটজনকে মুক্তি দেয়া হয় আর ঢাকায় মুক্তি দেয়া হয় আরও আটজনকে। বাকিদেরকে মফস্বল জেলাগুলো থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এদের সবাইকেই ইন্টার সার্ভিসেস স্ক্রিনিং কমিটি (আইএসসিসি) তদন্ত করে 'সাদা' (নির্দোষ) ঘোষণা করে। আরও সাতাশিজন বন্দীকে 'ধূসর' (সন্দেহজনক) ঘোষণা করে তাদেরকেও মুক্তি দেয়া হয়।

আমার জানামতে, মুক্তি বাহিনীর কোন সক্রিয় সদস্য সাধারণ ক্ষমার লোভে পড়ে আমাদের কাছে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের বিস্ফোরক দ্রব্য, মাইন আর গ্রেনেড চালানের কাজে লাগায়। সীমান্ত বরাবর স্থাপিত অভ্যর্থনা শিবিরগুলোতে শুধু ফেরৎ আসা অল্প কিছু উদ্বাস্তুদের বরণ করা হয়, যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হামলাকারীরা সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে অবৈধ পথ দিয়ে বন্যার মত আসতে থাকে।

কিছু বাঙালী আশা করেছিল যে মুজিবর রহমানও সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসবেন। তাদের এই আশা আরও উদ্দীপ্ত হয়েছিল এই গুজব ছড়িয়ে পড়ায় যে বিশ্বের কিছু প্রভাবশালী রাজধানী মুজিবের উপর থেকে মামলা তুলে নিয়ে তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ দিচ্ছিল। ইয়াহিয়ার আস্থাভাজন এক জেনারেল রাওয়ালপিন্ডি থেকে এসে এসব জল্পনা-কল্পনার উপর তার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, "হয়তো মুজিবকে শারীরিকভাবে হত্যা করার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দেয়াটাই ভালো হবে কারণ একজন জীবিত মুজিবের চেয়ে একজন মৃত মুজিব আরও বেশি বিপজ্জনক হবে।" তিনি আরও যোগ করলেন যে মুজিব বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞানামায় স্বাক্ষর করার জন্য আর অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্য ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। "আপনাদের কি মনে হয় না যে এর ফলে তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া সরে যাবে?" আমি বললাম, "প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই মুজিবের পরিণতির ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। দ্বিতীয়ত, এমন নিশ্চয়তা কে দিবে যে মুজিবকে একবার মুক্তি দিয়ে দিলে তিনি একটা না একটা ছুতো দেখিয়ে পাল্টি দেখাবেন না।" জেনারেল



আরও আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "আরে, আমি তো শুধু অনুমানভিত্তিক একটি পরিস্থিতির কথা বলছিলাম।"

তবে এটি নিখাঁদ অনুমানভিত্তিক পরিস্থিতি ছিল না। এক বন্ধু রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের নিয়ে কিছু অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ইয়াহিয়াকে বোঝানো হয় যে তাকে এক ধনী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে মুজিবের জীবন রক্ষা করা হবে, তবে তার মুক্তির সময়টা অবশ্যই তার (ইয়াহিয়ার) উপর ছেড়ে দিতে হবে।

১৯৭১-এর অক্টোবরে, লারকানায় ভুট্টোর সাথে দেখা করার পর এক জার্মান সাংবাদিক ঢাকায় এলেন। তিনি আমাকে বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ঘনিয়ে আসছে আর ভুট্টো তাকে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন 'যে তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন তো মুজিবকে মুক্ত করে দিবেন' কারণ তিনি এই ব্যাপারে জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হননি।

এই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তর অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৭৮টি আওয়ামী লীগ সংসদের আসন পূরণ করতে উপ-নির্বাচনের আদেশ দেয়া হয়। মেজর জেনারেল ফরমান আলীকে এর দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তিনি ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের পুরস্কৃত করতে চাইছিলেন যারা সেনাবাহিনীর অ্যাকশনের পর চরম দুঃসময়ে সহযোগিতা করেছিল। আসন ছিল অল্প, আর পদপ্রার্থী অনেক। এজন্য তিনি ডানপন্থীদেরকে তাদের প্রার্থীদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করতে বললেন। তারা এইভাবে তাদের দর পেশ করল: পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, ৪৬; জামায়াত-ই-ইসলামী, ৪৪; কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ২৬; কনভেনশন মুসলিম লীগ, ২১; এবং নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, ১৭। এরপর ফরমান তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করার একটা প্রণালী তৈরির চেষ্টা করলেন, এটি মাথায় রাখলেন যে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় জোট সরকার গঠনের জন্য জনাব নুরুল আমিনকে পর্যাপ্ত আসন দিতে চেয়েছেন।

ফরমান যখন এই সংখ্যাগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন, তখন জেনারেল পীরজাদার একটা নতুন আদেশ পেলেন যেখানে বলা হয়, "কাইয়ুম লীগকে ২১টি এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টিকেও ১৮টি আসন দিও।" "তাহলে আমি ডানপন্থীদের সবাইকে কিভাবে জায়গা করব?" "ঠিক আছে। পিপিপি-কে ১৩টি দাও।" পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে রাষ্ট্রপতি



তিন রাজনীতিবিদের সাথে খেলা খেলছিলেন - নুরুল আমিন, কাইয়ুম আর ভুট্টো - প্রত্যেককেই প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে। আমি জানি না রাওয়ালপিন্ডিতে তার খেলা কেমন এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঢাকার ব্যাপারে যতদূর জানি, উপ-নির্বাচনগুলো ছিল ডাঁহা ভাওতাবাজী। কার্যত, আসনগুলো জেনারেল ফরমান বন্টন করেছিলেন।

উপনির্বাচনে নিজের দলের সম্ভাবনা যাচাই করতে এক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শালও ঢাকায় এসেছিলেন। ১লা অক্টোবর বিকাল ৫:৩০-এ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আরেকজন সাংবাদিককে নিয়ে আমি তার সাথে দেখা করলাম। তিনি যখন উপ-নির্বাচন নিয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন, আমি বললাম, "আমি পরামর্শ দিব, আপনি সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখার জন্য গ্রামের দিকে একটা সফর করুন। বেশির ভাগ মানুষ উপ-নির্বাচনে আগ্রহী নয়। তারা তাদের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত।" এই কথার সূত্র ধরে দীর্ঘ তর্কের অবতারণা হল। "তোমার কথা অনুযায়ী সমস্যা যদি এতই জটিল হবে, তাহলে তোমার মতে কে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে?" "এটা অবশ্যই জেনারেল, এয়ার মার্শাল আর ফিল্ড মার্শালদের উর্ধ্বে। দেশের এখন একজন জাতীয় মর্যাদার রাজনীতিবিদের ভীষণ প্রয়োজন।" তিনি বললেন, "আমার মনে হয় মুজিবই এর সমাধান, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া উচিৎ। ইতোমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।" আমি প্রতিবাদ করলাম, "কিন্তু তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক। তিনিই এই সবকিছুর জন্য দায়ী।" "আপনাদের সেনাবাহিনী যদি সব খুনীকে ক্ষমা করতে পারে (সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে) তাহলে তারা মুজিবের মুক্তিও হজম করতে পারবে যিনি নিজের হাতে একটা প্রাণও হত্যা করেননি। আমি বলে দিচ্ছি, পশ্চিম পাকিস্তান তার মুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত আছে।" তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার দলের প্রতিনিধিত্বের কোন সম্ভাবনা না দেখে রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে গেলেন।

অন্য রাজনীতিবিদরা যখন পূর্ব পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে ভাগ বসানো নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, তখন ভুট্টো ১৯৭০-এর নির্বাচনের ভিত্তিতে 'জনগণের প্রতিনিধিদের' হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপর পুরো জোর দিলেন। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের কাছে এই মুহূর্তের গুরুতর সংকটের ভিত্তিতে এই দাবী অবান্তর মনে হলেও যারা জান্তার মানসিক দেউলিয়াপনার অবস্থা জানত তারা শীঘ্রই সরকার পরিবর্তনের প্রার্থনা করছিল যাতে খারাপ পরিস্থিতি থেকে সর্বোচ্চ ভালোটুকু বের করে আনা যায়। ইয়াহিয়া আর তার সহকর্মীদের ব্যাপারে যতদূর পর্যন্ত বোঝা গিয়েছে, এটা যথেষ্টই প্রকাশ পেয়েছিল।



আমরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম যখন জানলাম যে রাষ্ট্রপতি, জনাব জে এ ভুট্টোর নেতৃত্বে এক উচ্চ-ক্ষমতার প্রতিনিধি দলকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা জানতাম যে একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জনাব জে এ ভুট্টো ছিলেন চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের প্রধান স্থপতি, আর আশা করছিলাম যে কোন না কোনভাবে তিনি আগুন থেকে বাদামগুলো টেনে বের করে আনবেন। আট-সদস্যের প্রতিনিধি দলে পিএএফ প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান এবং চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল গুল হাসানের অন্তর্ভুক্তির কারণে এটি একদম পরিষ্কার বোঝা গেল যে চীনের সামরিক সাহায্যপ্রাপ্তির চেষ্টাও করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি দল নভেম্বরের শুরুতে পিকিং সফরে গেল আর চীনা নেতাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করল। সফরকালে ভুট্টো এই ঘোষণা দিতে সক্ষম হলেন যে, "এই আলোচনার ফলাফল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।" (পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিন্ডি, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭১।) এর ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ঘটনায় চীনা সাহায্যের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের পূর্বের ঘোষণা নিশ্চিত হয়। এর সাথে পাকিস্তানী ও চীনা নেতাদের দেয়া প্রেস বিবৃতির ফলেও যে কেউ বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ হয় যে যুদ্ধের ঘটনায় চীনের সাহায্য আসতে যাচ্ছে। আমি যখন আমার আশাবাদ নিশ্চিত করতে ভুট্টোর প্রতিনিধি দলের কাছের এক সূত্রের কাছে খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম, সে বলে, "হ্যাঁ, চীনারা খুব ভালো বন্ধু। তারা আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মন জয় করার উপদেশ দিয়েছে।"

১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের সাথে স্বাক্ষর করা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীন প্রতিশ্রুতির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মান করবে কি না এ ব্যাপারে জানতে ওয়াশিংটনেও প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেখানেও সাহায্যের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বদলে আমরা সেই একই উপদেশ পাই। "ইয়াহিয়া নিক্সন ও চীনা নেতাদের সাথে তার পত্র বিনিময়গুলো আমাকে দেখিয়েছিলেন, যারা তীব্র আশা পোষণ করছিলেন যে বাঙালীদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা সম্ভব হতে পারে।" (জি ডব্লিউ চৌধুরীর Last Days of United Pakistan, পৃ: ১৯২।)

পাকিস্তানের চেয়ে ভারত আরও ভালো কুটনৈতিক ফলাফল পেল। তারা চীন বা ইউএসএ-র হস্তক্ষেপের হুমকী নিষ্ক্রিয় করতে জোর প্রচেষ্টার সাথে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি আঁকড়ে ধরল। তারা চুক্তির ৫ ও ৭ ধারা অনুযায়ী সাহায্য প্রার্থনা করল যেখানে



স্বাক্ষরকারীদের এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হয় যে তারা একে অপরকে পরামর্শ দিবে "যখন যে কোন এক পক্ষের উপর কোন হামলা বা সেরকম হুমকীর ঘটনা ঘটবে"। পরবর্তীতে ভারতীয় লেখকরা নিশ্চিত করেছিল যে, "এই চুক্তিতে সামরিক সমর্থনের ব্যাপার আছে।" (হিন্দুস্তান টাইমস-এ ডি কে পালিত, নয়া দিল্লী, ২০শে অক্টোবর, ১৯৭১।)

ফলশ্রুতিতে মস্কো আর নয়াদিল্লীর ভিতর যোগাযোগ ব্যাপক হারে বেড়ে গেল। সোভিয়েত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিনের নেতৃত্বে পাঁচ-সদস্যের একটি কুটনৈতিক দল ও চিফ অব এয়ার স্টাফের নেতৃত্বে ছয়-সদস্যের একটি সামরিক প্রতিনিধি দল স্বল্প বিরতির মধ্যে ভারত সফর করে গেলেন। চরম ব্যাপারটি ঘটে যখন সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকো নিজে সফরে আসেন। এমন খবরও আসে যে নয়াদিল্লীতে একটা ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও পাইলটরা এর সাথে স্থায়ীভাবে জড়িত আছেন।

২৪শে অক্টোবর থেকে ইন্দিরা গান্ধী নিজে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলো যেমন ইউএসএ, পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যান্ড সফরে যান যাতে তাদের সমর্থন নিশ্চিত করা যায় বা অন্তত পাকিস্তানের জন্য এইসব এলাকা থেকে যে কোন সম্ভাব্য সাহায্যকে নিষ্ক্রিয় করা যায়।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সামরিক মোকাবিলার মোড় বিশ্ব উদ্বেগের সাথে দেখছিল, কিন্তু এই সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কার্যকরভাবে এগিয়ে আসতে অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক ছিল বলে মনে হল। জাতিসংঘের ছাব্বিশতম সাধারণ অধিবেশনে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আনা এর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অভিযোগটি বিবেচনা করা হয় ও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের দুই দিকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব করা হয়। পাকিস্তান সাথে সাথে একমত পোষণ করে, কিন্তু ভারত অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে ভারত এমন কোন উদ্যোগকেই মেনে নেয়নি যা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারে। তারা তাদের 'শতাব্দির সেরা সুযোগটি' হারাতে চায়নি।



১৪শ অধ্যায়: বিপর্যয়ের দিন ঘনিয়ে এল

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক কোন রাজনীতি দিয়েই প্রভাবিত হচ্ছিল না। কোন বিরাম ছাড়াই তা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকল যেন কোন পূর্ব-নির্ধারিত পথ অনুসরণ করছে। না তো ডা: মালিকের বেসামরিক ক্যাবিনেট কোন পরিবর্তন আনতে পারল, আর না পারল বহির্বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের করা কোন কাকুতি-মিনতি।

ঢাকার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। এমন কোন দিন পার হয়নি যেদিন কোন লুট, আগুন লাগানো, রাজনৈতিক হত্যা বা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেনি। নমুনা হিসেবে এখানে অল্প কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। ২৩শে অক্টোবর সাবেক গভর্নর আব্দুল মোনেম খানকে প্রকাশ্য দিবালোকে তার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর কয়েক দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক প্রাদেশিক মন্ত্রীর গাড়ি উড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর এক চুরি করা গাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য ভরে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, এতে পাঁচজন নিহত ও তেরজন আহত হয়। পরের দিন, স্টেট ব্যাংকের বিশাল ভবনে এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর গভর্নর হাউসের পাশে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভবন, যেখানে টেলিভিশন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে আগুন লেগে যায়।

এমন ঘটনাগুলো যখন দৈনিক ঘটনায় পরিণত হল জনগণ তখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এ কারণে বিদ্রোহীদের তখন এমন বিশেষ কিছু অর্জন করা দরকার ছিল যা দেশে-বিদেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তা করতে তারা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালর শৌচাগারের অংশটি উড়িয়ে দেয়, যার ফলে ভবনটির একটি বড় অংশ ধ্বসে পড়ে। বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় এই ক্ষতির সংস্কার করতে।

১১ই অক্টোবর বিদ্রোহীরা তাদের অপারেশনে নতুন সংযোজন করল। তারা ঢাকায় প্রথমবারের মত মর্টার ব্যবহার করল। রাত ১:৪০-এ বিমানবন্দরের সাথে লাগোয়া পিআইএ-র রান্নাঘরের কাছে হওয়া এই বিস্ফোরণের শব্দ আমি নিজের কানে শুনেছি। ঠিকমত না দেখে ত্রুটিপূর্ণভাবে দুটি শেল নিক্ষেপ করা হয় বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তারা লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। যাই হোক, এই ঘটনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে



বিচলিত করে তুলল কারণ তারা এই ভয় পাচ্ছিল যে পরের বার হয়ত এই গোলাবর্ষণ এতটা ত্রুটিপূর্ণ নাও হতে পারে।

ঢাকার শহরতলীগুলোও বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। আসলে, প্রত্যন্ত এলাকাগুলোই তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল কারণ আমরা সাধারণত আমাদের সার্চ অপারেশনগুলো মূল শহরে সীমাবদ্ধ রাখতাম। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধিরগঞ্জের ঘটনার কথা বলা যায়। বিদ্রোহীরা সেখানে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে তার আউটগোয়িং তারগুলো কেটে দেয়। এই ক্ষতি মেরামত করতে কোন বাঙালী কর্মী রাজী ছিল না। এজন্য পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - দুইজন সহকারী প্রকৌশলী, একজন লাইন সুপারিনটেনডেন্ট, একজন সহকারী ফোরম্যান ও একজন লাইনম্যান -এর একটি দল পাঠাল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। ৩০শে অক্টোবর, ঘটনাস্থলে কাজ করার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের উপর বিদ্রোহীরা হামলা করে। পাঁচজনের সবাই নিহত হয়। বিদ্রোহীরা ট্রফি হিসেবে সহকারী ফোরম্যান বদর-ই-ইসলামের লাশ নিয়ে যায়। ৩০শে অক্টোবর বিকাল ৫ টায় অন্য চারটি লাশ উদ্ধার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ঢাকা ও এর শহরতলী থেকে ভিতরের দিকে যাওয়ার সময় কেউই এটা না ভেবে পারত না যে সে শত্রুর এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রহরী ছাড়া চলাফেরা করাই তখন অসম্ভব ছিল, যা বিদ্রোহীদের জন্য উল্টো উত্তেজকের কাজ করত। তারা এমন দলকে অ্যামবুশ করত অথবা তাদের রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখত। কেউ যদি তার গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছাতে পারত তো সে পেছনে ফিরে তাকিয়ে তার এই যাত্রাকে একটা ইতিবাচক অর্জন বলে ধরে নিতে পারত।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিস্থিতি থেকে মফস্বলের স্থানীয় কমান্ডারদের কোন মুক্তি বা বিশ্রাম ছিল না। তাদের সামান্য কিছু ফৌজ নিয়ে নানান সমস্যার সমাধান করতে হত। তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল জনতার শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারী সম্পদ রক্ষা করা, শিল্প কারখানা চালু রাখা ও সন্দেহজনক এলাকাগুলো পরিস্কার করা। সেখানে সাধারণত প্লাটুন বা কোম্পানীর শক্তি নিয়ে ফৌজ পাঠানো হত কিন্তু তাদের দায়িত্বের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে তাদেরকে আরও ছোট ছোট দলে ভাগ করা লাগত। যত ছোট দলে ভাগ করা হত, বিদ্রোহীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিপদও তত বেশি ছিল। তাদের শক্তি কিছুটা বাড়ানোর জন্য তাদের সাথে কিছু রাজাকার, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস



(ইপিসিএএফ)-এর সদস্য, ওয়েস্ট পাকিস্তান রেঞ্জার্স ও পুলিশ নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এই বহুসংকর লোকের ভিড় তেমন কোন সংযোগশীল লড়াইয়ের দল তৈরি করতে পারল না। কিন্তু সংখ্যার মধ্যে সব সময়ই একটা নৈতিক শক্তি থাকে। এজন্য, যখন কোন দলে দশ জনের জায়গায় ত্রিশ জন থাকত, একে আরও সুরক্ষিত ও টেকসই ধরে নেয়া হত।

বাস্তবিক অর্থে, দলগুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত কিংবা শক্তিশালী ছিল না। তাদের কোন কোনটি, বিশেষ করে যেগুলো আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে তৈরি ছিল, এগুলো বিদ্রোহীদের জন্য লোভনীয় বস্তু ছিল, এদেরকে তারা প্রায়ই আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিত। এর ফলে সাধারণভাবে একটি ভীতির সঞ্চার হয় আর এদের মধ্যে ভীতু বা অবিশ্বস্তরা বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখোমুখি হবার আগেই তাদের কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২৯শে অক্টোবর নওয়াবগঞ্জ থানায় ৩৯ জন রাজাকারের মধ্যে ৩২ জনই তাদের কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাকী সাতজন পরদিন বিদ্রোহীদের কবলে পড়ে আর থানাটি শত্রুর হাতে চলে যায়। আবার, লোহাগঞ্জ থানায় ইন্টার সার্ভিসেস স্ক্রিনিং কমিটি কর্তৃক (আইএসএসসি) ৫৭ জন বাঙালীকে বাছাই করে সাধারণ ক্ষমার অধীনে মুক্তি দেয়ার জন্য রাখা হয়। তাদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ ও রেঞ্জার্সের ত্রিশজন রাইফেলম্যান নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ২৮শে অক্টোবর ৫৭ জন বাঙালীর সবাই পালিয়ে যায়। পরের রাতে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে ও ত্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে হত্যা করে। এভাবে এই থানাও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই একই পরিণতি ঘটে আরও বেশ কিছু থানার, বেশির ভাগ নোয়াখালী, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত।

সীমান্তের কাছে এগিয়ে যেতে থাকলে যে কেউ ঘনঘন ভারতীয় অস্ত্রের প্রচন্ড শব্দ শুনতে পেত যেগুলো ক্রমাগত সীমান্ত চৌকিগুলো ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। এই ঘটনা মূলত জুনের শেষ দিকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিদ্রোহীদের কার্যক্রম বাড়ার সাথে সাথে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের এলাকার উপর গোলাবর্ষণের রাউন্ডের সংখ্যা দৈনিক ৫০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে ছিল। গোলাবর্ষণের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, এটি ছিল শত্রুতার 'নিয়ন্ত্রিত তীব্রতাবৃদ্ধির' জন্য ভারতীয় নীতির একটা কৌশল। তারা সীমান্ত উত্তপ্ত রাখতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সীমান্তে অপারেশনরত বিদ্রোহীদের জন্য এটি একটি শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করত। তৃতীয়ত, এটি একটি কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। এর ফলে বিদ্রোহী ও তাদের



পৃষ্ঠপোষকেরা অরক্ষিত এলাকাসমুহ, সীমান্তের কোণাগুলো ও ছিটমহলগুলো দখল করে রাখতে পারছিল। এখান থেকে তাদেরকে বের করতে গিয়ে আমরা অনিবার্যভাবে তাদের আর্টিলারীর গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়তাম বা অ্যামবুশের শিকার হতাম কিংবা বড় ধরণের হতাহতের সম্মুখীন হতাম। তারা ক্রমেই আমাদের সীমান্তের বেশ কিছু বাঁক ও এলাকা খুবলে খুবলে দখল করে নিল।

তারপরও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, ১২ই অক্টোবর তার রেডিওতে প্রচারিত ভাষণে জাতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, "আপনাদের বীর সৈনিকরা পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি রক্ষা ও নিরাপদ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে।" (পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিন্ডি, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭১।) ততদিনে, সীমান্তের প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল এলাকা ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

জেনারেল নিয়াজী রাষ্ট্রপতির ঘোষণাকে সমর্থন দেয়ার জন্য বিজয়ের দাবীকে বাড়িয়ে বলাটা তার দায়িত্ব বলে ধরে নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতীয় এলাকায় যুদ্ধ নিয়ে যাবেন। তার বড় বড় আজগুবী কল্পনায়, তার আক্রমণ একবার কোলকাতার দিকে আরেকবার আসামের দিকে রওনা দিচ্ছিল। তার জনসংযোগ প্রতিনিধি হিসেবে আমি যখন তাকে অসাধ্য আশার কথা তুলতে মানা করলাম, তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না, ধাপ্পাবাজী আর ফাঁকিবাজী হচ্ছে যুদ্ধের কুট চাল?"

এটা আসলে শত্রুকে ধাপ্পাবাজীর ব্যাপার ছিল না। তিনি শুধু নিজেকেই ধাপ্পা দিচ্ছিলেন। আমার মনে পড়ে, ১৯৭১-এর ২৪শে অক্টোবর, তার অফিসে আমি তার সাথে একান্তভাবে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "তোমার বন্ধুরা (বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধিরা) কী বলে?" "তারা বলে যুদ্ধ একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে গিয়েছে।" "আরে, আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমার প্রতিরক্ষার কাজ সম্পন্ন করা আছে। আমার ৭০,০০০ সশস্ত্র লোক আছে। স্থলভূমিতে আমি খুবই শক্তিশালী।" "কিন্তু আপনার আকাশপথ ও সমুদ্রপথের অবলম্বন খুবই সামান্য।" "আমি বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী ছাড়াই যুদ্ধ লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" "তারপরও আমার মনে হয় না অভ্যুত্থানের সাথে সাথে বহির্দেশীয় আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য তা যথেষ্ট। আমার ভয় হচ্ছে ....." "কী ভয় হচ্ছে তোমার?" "আমরা পুরো সীমান্ত জুড়ে অবস্থান করছি। শত্রুরা ভিতরে বাইরে দুই জায়গাতেই আছে। আমরা হলাম স্যান্ডউইচের মাঝখানের পুরের মত। তাদের শুধু যা করা লাগবে তা হল তাদের পছন্দমত



একটা জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়ে জোড়বদ্ধ হওয়া। ওতেই আমাদের কেয়ামত এসে যাবে।"

"তোমার আশংকা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তুমি মনে হয় সংখ্যা দিয়ে যাচাই করছ। যুদ্ধে সংখ্যা নয়, বরং সেনাপতিত্বই আসল। আর তুমি কি জানো সেনাপতিত্ব কী জিনিস? এটি হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক সংখ্যার ফৌজ নিয়োগ করার শিল্প।"

ধাপ্পাবাজী শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান বা তার কমান্ডার নিয়াজীরই পদাধিকার বলে অর্জিত ক্ষমতা ছিল না। তাদের অধীনে যারা ছিল সবাই একই কাজে লিপ্ত ছিল। জেনারেল নিয়াজীর ডিভিশনাল বা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সফরে আমি সব সময় তার সাথে থাকতাম আর প্রায় সবগুলো সামরিক ব্রিফিং-এ যোগ দিতাম। একজন মেজর-জেনারেল ও একজন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া সকল ডিভিশনাল কমান্ডার ও ব্রিগেড কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাদের অপ্রতুল অস্ত্রশস্ত্র ও অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, তারা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবে। এই সবগুলো ব্রিফিং-এর জিকির ছিল, "স্যার, আমার সেক্টর নিয়ে চিন্তা করবেন না, সময় এলেই আমরা শত্রুর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।" এর বাইরে অন্যরকম কোন মন্তব্য করলেই সেটাকে আত্মবিশ্বাস ও পেশাদারী দক্ষতার অভাব বলে ধরে নেয়া হত। কেউই তাদের ভবিষ্যৎ পদোন্নতির পথ ধ্বংস করতে চাইত না।

কমান্ডারদের অভিলাষী ইতিবাচকতার পুরো বিপরীত ছিল ফৌজরা, যারা প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও মনোবলের দিক থেকে অনেক নীচু অবস্থানে ছিল। তারা পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন না দেখে দেখে দীর্ঘ আটটি মাস পার করেছিল। তারা পুরোদস্তুর যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় পায়নি। মাসের পর মাস তারা কোন বিশ্রাম বা স্বস্তি পায়নি। তাদের অনেকের বুটজুতা, মোজা বা খাটিয়াও ছিল না। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপারটা হল, তাদের অনেকেরই অপারেশনের জন্য মন থেকে ইচ্ছা ছিল না। তারা মনে করত বাঙালীরা যারা তাদের মুসলিম ভাইদের হত্যার জন্য হিন্দুদের পক্ষ বেছে নিয়েছে তাদের জন্য এভাবে জীবন বিসর্জন দেয়ার কোন মানে হয় না।

বলা হয় যে, ফৌজের মনের মধ্যে কী চলছে তা জানার মধ্যে নেতৃত্বের তিন-চতুর্থাংশ নিহিত থাকে। কিন্তু আমাদের কমান্ডাররা সাধারণত এই গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ব্যাপারটি উপেক্ষা করতেন, আর শুধু তাদের অধীনে মাথা আর রাইফেলের বাটের সংখ্যাই গুণতেন। যখন তাদের বলা হল যে অভ্যুত্থান-বিরোধী অপারেশনে আমরা ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬



জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও অন্যান্য র‍্যাংকের ৩,৩৫৯ জনকে হারিয়েছি, তারা বরং যারা বেঁচে গেছে তাদেরকে গুণতেন। তারা সামান্যই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে শারীরিক ক্ষতির চেয়ে মানসিক ক্ষতি আরও কয়েক গুণ বেশি ছিল।

মনোবলের এই দুর্বলাবস্থার ফলে, ফৌজরা টহল কাজে মারমুখোভাব আর লড়াইয়ে জিদ হারিয়ে ফেলেছিল। সীমান্ত এলাকায়ও অনুরুপ টহল কাজ শিথিল হয়ে পড়েছিল। ফৌজের একটা বিচ্ছিন্ন দল যেত, সপ্তাহে হয়তো একবারের মত, তাদের দায়িত্বের এলাকা একবার টহল দিয়ে এসে যার যার বেজে ফিরে এসে রাতের ঘুম দিত। ১২ই নভেম্বর এমন একটি বিচ্ছিন্ন দল তাদের নিয়মিত টহল দায়িত্ব পালন করতে ধর্মদহ এলাকায় (যশোর সীমান্ত এলাকার প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে) গিয়ে দেখে যে ঐ এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১ নাগা ব্যাটেলিয়নের একটা প্লাটুন দখল করে রেখেছে। অনধিকার প্রবেশকারীরা ৫ই নভেম্বর চুপচাপ সীমান্ত পার হয়ে এসে এক সপ্তাহ যাবৎ নির্বিঘ্নে সেখানে বসে আছে। তাদেরকে ১৩ই নভেম্বর উৎখাত করা হয়। তাদের চারজনকে আটক করে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে রাখা হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে বেলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় আমাদের জন্য একই রকম একটা চমক ছিল, যেখানে আমরা আবিষ্কার করি যে ১০ই নভেম্বরের মধ্যে ঐ এলাকার অর্ধেকটাই বিদ্রোহী আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের হাতে চলে গিয়েছে। কয়েক দিন পর, তাদের প্রতিরক্ষার কবজা খোলার জন্য একটি নৈশ অপারেশন চালানো হয়। এতে সাফল্য আসে। একই সপ্তাহে, ১৩ই নভেম্বর, বয়রার কাছে (যশোর সেক্টর) শত্রুপক্ষ সীমান্ত পার করে। তারা সবার অলক্ষে সাত দিন ধরে সেখানে অবস্থান করে, এর মধ্যে তারা তাদের দল থেকে দুটি ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে ফেলে - জম্মু ও কাশ্মীর এবং ২ শিখ লাইট। আমরা তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে অনেক দেরীতে, ১৯শে নভেম্বর জানতে পারি। স্থানীয় ব্রিগেডের উপর (যশোর) এই অনধিকার প্রবেশকারীদের হটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২২ ও ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুটি কোম্পানীকে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়, সাথে আমাদের বড় ধরণের ক্ষতিও হয়। পরবর্তীতে শত্রুরা আক্রমণ করে আমাদের ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ফৌজদের তাদের প্রতিরোধের অবস্থান থেকে জোর করে পিছু হটিয়ে দেয়, তাদের সব অস্ত্রশস্ত্র পিছনে পড়ে থাকে।



এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, একদিকে আমাদের ফৌজ তাদের অবস্থান ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে, অন্যদিকে শত্রুপক্ষ পুরোপুরি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদেরকে উৎখাত করতে একটি সত্যিকারের গুরুতর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ডিভিশন এই আক্রমণের জন্য ২১ পাঞ্জাব (আর এন্ড এস) ও ৬ পাঞ্জাবকে নিয়োজিত করল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ইমতিয়াজ ওয়ারাইচ ও লেফটেন্যান্ট- কর্নেল শরীফের অধীনে যথাক্রমে টাস্ক ফোর্স 'আলফা' ও টাস্ক ফোর্স 'ব্রাভো' গঠন করে নিয়োগ করা হল। তাদেরকে ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন ও আর্টিলারীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্টের গোলাবর্ষণের সহায়তাও দেয়া হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর সকাল ৬ টায় আক্রমণ চালানো হয়। শুরুতে এটি ভালোই এগুচ্ছিল, কিন্তু যখনই আক্রমণকারী বাহিনী গাছের সারির ফাঁকে শত্রুপক্ষের পজিশনের কাছে এগিয়ে গেল, লুকানো পজিশন থেকে শত্রুর ট্যাংক বের হয়ে এল। এটি আমাদের জন্য বিরাট চমক ছিল, কারণ আমরা সব সময়ই এই এলাকাকে 'ট্যাংক ব্যবহার করা যাবে না এমন এলাকা' বলে ধরে নিয়েছিলাম। শত্রুপক্ষের আর্টিলারীও সীমান্ত এলাকা থেকে এসে যুদ্ধে যোগ দিল। আমরা পিএএফ-এর সাহায্য চাইলাম। দ্রুতই মাথার উপর তিনটি সেবর এসে হাজির হল। তারা ভারতীয় মিগ-এর মুখোমুখি হল। আমরা দুটি বিমান ও সবগুলো ট্যাংক হারালাম। আক্রমণ প্রত্যাহার করা হল। শত্রুপক্ষ মাটি ছাড়ল না, তবে আমরা তাদেরকে তিন দিক থেকে ঘেরাও করে রাখলাম যাতে আরও ছড়িয়ে পড়া থেকে তাদেরকে আটকানো যায়। এই ঘেরাও ৩রা ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পুরোদস্তুর যুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। একে বড় ধরণের অর্জন বলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়, যদিও কৌশলগতভাবে আমরাই শত্রুর হাতে ধরা খেয়েছিলাম। যেহেতু ডিভিশনের একটি বড় বাহিনী এই এক 'ঘা'-এর জায়গায় ব্যস্ত ছিল, এটি শত্রুর জন্য ডিভিশনাল এলাকার যে কোন দুর্বল নিরাপত্তার জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়ার বিরাট সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে, শত্রুর লক্ষ্য তখনও পর্যন্ত সীমিত ছিল।

জনসমক্ষে আমরা ২১শে নভেম্বরের যুদ্ধকে মিগ, অস্ত্রশস্ত্র আর আর্টিলারীর সহায়তা নিয়ে শত্রুর আক্রমণ বলে চালিয়ে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল শত্রুকে ছুঁড়ে বের করে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের দিক থেকে চালানো আক্রমণ, যারা ঐ এলাকা ১৩ই নভেম্বর থেকে দখল করে রেখেছিল।



একই সপ্তাহে (২০-২৫শে নভেম্বর), ভারত সিলেট এলাকার জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম, দিনাজপুরের হিলি ও রংপুর জেলার পঞ্চগড়ে আক্রমণ করে। শত্রুরা সীমান্ত এলাকায় সুবিধাজনক কেন্দ্রগুলো দখল করে রাখতে চেয়েছিল যাতে ভবিষ্যৎ অপারেশন চালানোর জন্য সেগুলোকে স্প্রিং-বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আমরা নিজেরা এই বলেই বিকটভাবে চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সিলেট আর রংপুর সেক্টরে কিছু প্রতিরোধকারী ফৌজকে হটিয়ে দেয়া হল, যেমনটা যশোর সেক্টরে ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে করা হয়েছিল, আর তাদেরকে তাদের পজিশন খালি করে দিতে বাধ্য করা হল, তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর রান্নার তৈজসপাতিও সরিয়ে নিতে পারল না।

এই তিনটি ঘটনায় জেনারেল নিয়াজী ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন, যিনি আমার উপস্থিতিতে, অকৃতকার্যদের ভর্ৎসনা করে এই আদেশ দিলেন, "পঁচাত্তর শতাংশ হতাহত না হওয়া পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার চলবে না। এর পরেও, প্রত্যাহারের অনুমতি শুধুমাত্র জিওসি দিবেন।" এই মৌখিক নির্দেশ পরবর্তীতে লিখিতরূপে নিশ্চিত করা হয়।

২২শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর প্রায় প্রতিদিনই জেনারেল নিয়াজী সীমান্ত এলাকায় সফর করতেন। আমি তার এই পুরো সফরে তার সাথে ছিলাম। ২৭শে নভেম্বর হিলি এলাকায় সফরে যাওয়ার সময় জেনারেল নিয়াজী সাংবাদিকদের একটি দলের সাক্ষাৎ পেলেন যাদেরকে হিলিতে ভারতীয় আক্রমণের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেখানে আমাদের সীমান্ত এলাকায় একটি অকেজো ভারতীয় ট্যাংক পড়ে ছিল। অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রায় আধা ঘন্টা ধরে প্রেস সাক্ষাৎকার হল। শেষে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয়, পুরোদস্তুর যুদ্ধ কবে শুরু হবে?" চিকেন টিক্কার (টুকরো) থালা থেকে মাথা উঠিয়ে তিনি বললেন, "আমার মতে পুরোদস্তুর যুদ্ধ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।" তার এই উত্তর কেউই বিশ্বাস করল না কারণ আমরা সবাই জানতাম যে ভারত যদি তার সমস্ত শক্তি - বিমান, অস্ত্রশস্ত্র ও আর্টিলারী - লেলিয়ে দিত তো জেনারেল নিয়াজী এখন চিকেনের থালা সামনে নিয়ে বসে সাংবাদিকদের সাথে মশকরা করতে পারতেন না।

সাংবাদিকের দল যখন হিলির উদ্দেশ্য রওনা দিল, জেনারেল নিয়াজী ঢাকার উদ্দেশ্যে উড়াল দিলেন, এই সামান্য আশংকাটুকুও করলেন না যে শত্রুর জেট বিমানের আক্রমণ



হতে পারে। তিনি সাথে করে এক তরুণী সাংবাদিককে নিয়ে গেলেন, ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে একান্ত সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য।



৩য় অংশ : সামরিক

১৫শ অধ্যায়: পরাজয়ের জন্য সেনাবিন্যাস

নভেম্বরের শেষ দিকে জেনারেল নিয়াজীর পুরোদস্তুর যুদ্ধ লড়ার দাবীর সাথে তার ফৌজের বিন্যাসের ধরণ ছিল পরস্পর-বিরোধী। তারা যেভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সীমান্ত বরাবর সন্নিবদ্ধ ছিল তা দেখে মনে হয় যে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের অনুপ্রবেশ অথবা ভারতীয়দের আক্রমণ হচ্ছে কি না তা দেখা। যদিও এই যুদ্ধ অপরিহার্যরূপে ভিন্ন ধরণের সেনাবিন্যাসের দাবী করছিল। জেনারেল নিয়াজীর সামনে সেনাবিন্যাসের যে বিকল্পগুলো ছিল সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার আগে তাকে যে এলাকা প্রতিরক্ষা করতে হত তা মনে হয় আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার।

পূর্ব পাকিস্তান, যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত, তিন দিক থেকে শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয় এলাকা দিয়ে ঘেরা ছিল। চতুর্থ দিকে ছিল বঙ্গোপসাগর যেখানে সহজেই ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃত্ব করতে বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারত। শুধু দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের একটি ছোট প্রান্ত বার্মার দিকে উন্মুক্ত ছিল। এই উন্মুক্ত এলাকা বরাবর অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ছিল একটা পাহাড়ী এলাকা যেখানে জঙ্গল, মিজো ও বন্য প্রাণীদের কর্তৃত্ব ছিল। অনুপ্রবেশ ও অভ্যুত্থান ছাড়া এটি কোন সামরিক অপারেশনের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

প্রদেশের বাকীটুকু পলিমাটি দিয়ে তৈরি, যা উন্মত্ত যমুনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা দিয়ে চারটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চল আবার অসংখ্য নদী-নালা দিয়ে আড়াআড়িভাবে ভাগ করা ছিল যেন কোন শিল্পীর তুলির আঁকিবুকি। নদী-নালার মাঝের টুকরো জমিগুলো ঢাকা ছিল গাছের ঘনপল্লব, ঝোপ-ঝাড় আর ফসল দিয়ে। এর পাশাপাশি, দুটি ভয়ংকর বন ছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন আর উত্তরে টাঙ্গাইলের কাছে মধুপুর।



জলবায়ুগতভাবে, পূর্ব পাকিস্তান ছিল খুবই সহনীয়, শুধু বর্ষাকাল ছাড়া, যেটি আনুষ্ঠানিকভাবে মে-র মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে গিয়ে শেষ হত। বাস্তবে, বৃষ্টি আরও এক মাস আগে শুরু হয়ে আরও এক মাস পর শেষ হত। কদাচিৎ এই প্রদেশটিতে বন্যা তার বার্ষিক সফরের সুযোগ হারাত। এরা বিশাল এলাকা প্লাবিত করে একমাত্র নৌপরিবহন ছাড়া বাকী সব ধরণের যাতায়াত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিত। এমন কি যখন বন্যার পানি নেমে যেত আর স্বাভাবিক সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হত, তখনও পথগুলো ভেজা থাকত, যার ফলে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা সামরিক কার্যচালনার জন্য অনুপযুক্ত থাকত।

নদীমাতৃক অঞ্চলগুলোর দীর্ঘ মৌসুমী বন্যার ফলে ভারতের উপরও কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিল। তারা গ্রীষ্মের সময় 'বজ্রের ঝলকানির প্রচারণা' চালাতে পারেনি। যা হোক, তারা এই সময়টিকে দীর্ঘ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমাদের ফৌজকে শারীরিক ও মনোবলের দিক দিয়ে পরাস্ত করার কাজে লাগিয়েছিল। এর মধ্যে তারা নিজেদের সামরিক যন্ত্রেও তেল দিয়েছে আর পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে নতুন ফৌজের আটটি ডিভিশন নিযুক্ত করেছে।

আমাদের যশোর সেক্টরের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ২ নং কোরের অধীনে দুটি ভারতীয় ডিভিশন নিযুক্ত করা হয়, যেখানে উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর জন্য ২৩ নং কোরের অধীনে আরও তিনটি ডিভিশনকে চিহ্নিত করা হয়। (এটি করা হয় প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশকে যোগ করে নেয়ার জন্য যা দক্ষিণে গঙ্গা আর পূর্বে যমুনা দিয়ে সীমা নির্দেশ করে।) আমাদের উত্তর সীমান্তের মাঝামাঝি ছিল তাদের ১০১ কমিউনিকেশন জোন, যাকে ফাইটিং ফরমেশনে রূপান্তরিত করা হয় ও একজন মেজর-জেনারেলে অধীনে রাখা হয়। আমাদের পূর্বদিকে ৪ নং কোরের অধীনে তিনটি ডিভিশন নিযুক্ত করা হয়। আটটি ডিভিশন ও একটি কমিউনিকেশন জোন নিয়ে গঠিত এই তিনটি কোরের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্টিলারীর পূর্ণ শক্তি ছিল। তাদের ১০টি মিডিয়াম ও ৪৮টি ফিল্ড রেজিমেন্ট ছিল। পরবর্তীতে সেগুলো বাড়িয়ে যথাক্রমে ১২টি ও ৬০টি রেজিমেন্ট করা হয়।

ভারতীয় আর্টিলারীর মধ্যে ছিল ১৩০ এমএম রাশিয়ান বন্দুক যা ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরের লক্ষ্যকেও তাক করতে পারত। তাদের অস্ত্রসম্ভারের মধ্যে আরও ছিল টি-৫৫ ট্যাংকের একটি রেজিমেন্ট আর পিটি-৭৬ ও শার্ম্যান ট্যাংকের প্রত্যেকটির দুটি করে রেজিমেন্ট। এর সাথে, তাদের ছিল পিটি-৭৬ ট্যাংকের দুটি স্বতন্ত্র স্কোয়াড্রন আর দুটি



ব্যাটেলিয়ন বহন করার মত যথেষ্ট অস্ত্রসজ্জিত সেনাসদস্য বহন করার মত বাহন। তাদের বেশির ভাগ ট্যাংকেরই রাতে কার্যচালনার ক্ষমতা ছিল। তারা নদীপথের বাধাও পার করতে পারত।

তাদের বিমান বাহিনীর শক্তির মধ্যে ছিল মিগ-২১ (ইন্টারসেপ্টর), ক্যানবেরা (বম্বার), ন্যাট (গ্রাউন্ড সাপোর্ট এয়ারক্রাফট) ও এসইউ-৭ (ফাইটার-বম্বার)-এর দশটি স্কোয়াড্রন। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে এক বিশেষ এয়ারফিল্ড নেটওয়ার্ক বসিয়েছিল যাতে এই এলাকায় আক্রমণাত্মক অপারেশন চালাতে পারে। তারা অনেকগুলো পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টারও জড়ো করেছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তানের আঁকাবাঁকা নদীগুলো আকাশপথে পাড়ি দিতে পারে।

ভারত তার ইস্টার্ন থিয়েটারের জন্য একটি শক্তিশালী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছিল। এরকম একটি ক্যারিয়ার বিক্রান্তের ছিল ৬টি অ্যালাইজ (রিকনেসেন্স এয়ারক্রাফট), ১৪টি সী হক (ফাইটার) আর ২টি সী কিং (অ্যান্টি-সাবমেরিন হেলিকপ্টার)-এর পাশাপাশি তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেটের একটা প্রহরী দল। টাস্ক ফোর্সে চারটি যুদ্ধজাহাজ (আইএনএস বিয়াস, আইএনএস ব্রহ্মপুত্র - লেপার্ড ক্লাস, আইএনএস কমোর্তা ও আইএনএস করার্টি - পিয়েটিয়া ক্লাস), দুটি ডুবোজাহাজ (আইএনএস খান্ডারি ও আইএনএস কালবরি), একটি মাইন-সুইপার, পাঁচটি গান-বোট ও তিনটি ল্যান্ডিং ক্র্যাফটও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ নৌপথ আটকে দেবার ক্ষমতা এই ফোর্সের ছিল।

এর পাশাপাশি, ভারতের একটি প্যারাট্রুপস ব্রিগেড ও তিনটি ব্রিগেড দল ছিল। তার সম্পদের মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ২৯টি ব্যাটেলিয়ন ও ১০০,০০০ শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীকেও গুণতে হবে। আর পূর্ব পাকিস্তানের পঁচাত্তর মিলিয়ন মানুষের কথা যতদূর বলা যায়, তারা সাধারণভাবে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল যা শত্রুদের পক্ষে মূল্যবান সাহায্য হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারত।

আমাদের দিক থেকে এই বিশাল ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের ছিল হালকা অস্ত্রে সজ্জিত তিনটি পদাতিক ডিভিশন, এফ-৮৬ সেবরের একটি স্কোয়াড্রন আর চারটি গান-বোট। (অতিরিক্ত এয়ারফিল্ড ছাড়া আরও বিমান আনা অর্থহীন হত।) এই সামরিক শক্তির পাশাপাশি, আমাদের সাথে ছিল প্রায় ৭৩,০০০ আধাসামরিক সদস্য যাদের মধ্যে ছিল ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস, স্কাউট, মুজাহিদ ও রাজাকারেরা। কিভাবে



আমরা এই শক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারি, তার অনেকটাই নির্ভর করছিল শত্রুর অভিপ্রায় সঠিকভাবে নিরূপণ করার উপর।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের উদ্দেশ্য কী ছিল? আজ, এই প্রশ্নটা মূর্খের মত মনে হচ্ছে, আর উত্তরটাও পুরোপুরি স্পষ্ট; কিন্তু ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সমরবিদদের অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে ভারতের লক্ষ্য খুব বেশি উঁচু নয়, তারা শুধু 'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি বিশাল এলাকার ভূমিখন্ড' দখল করতে চায় যাতে তারা বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর কোলকাতা থেকে সরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসতে পারে আর তাদের স্তুপীকৃত উদ্বাস্তুর বোঝাটি 'স্বাধীন এলাকায়' স্থানান্তরিত করতে পারে। এটি হবে পাকিস্তানের জন্য একটি নিত্য যন্ত্রণা - ভারতের জন্য অনেকখানি স্বস্তি। সমরকৌশলের অনুমানের ভিত্তিতে আমরা এটুকুই বের করতে পেরেছিলাম।

এজন্য, ফৌজরা এই 'বিশাল এলাকার ভূমিখন্ডটি' বিদ্রোহী বা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তুলে দিতে অস্বীকার করার জন্য নিযুক্ত ছিল। তারা এই ভূমিকা প্রায় আট মাস ধরে পালন করেছিল, আর এর জন্য পুরো কৃতিত্বের দাবী রাখে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে, ভারত কোন বিশাল এলাকা কেটে নেয়ার জন্য তাদের শক্তিশালী যুদ্ধ যন্ত্রকে লেলিয়ে দেয়নি। তারা জানত এর অর্থ দাঁড়াবে পুরোদস্তুর যুদ্ধ। আর তারা এমনটি চায়নি যতক্ষণ না তারা কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়। এজন্য, তারা সীমিত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল যার মধ্যে ছিল বিদ্রোহীদের সহায়তা করা, আমাদের ফৌজকে পরাস্ত করা আর আক্রমণের পাদভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

যদিও, শুরুতে ইস্টার্ন কমান্ডকে দেয়া মিশন ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তাকে রক্ষা করা'। কাগজে কলমে এই মিশন অপরিবর্তনীয় ছিল আর ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার - আবারও সেই কাগজে কলমেই - তা পালন করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বোচ্চ কতখানি ভালোভাবে রক্ষা করা যায় - এই ছিল একটি প্রশ্ন যা জেনারেল নিয়াজী ও তার পূর্বগামীদের মন বিচলিত করে রেখেছিল। বিভিন্ন সময়ে চারটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছিল। নিয়াজী সবচেয়ে ভালোটি বেছে নিয়েছিলেন কি না তা নির্ধারণ করতে সেগুলোর প্রত্যেকটি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখার যোগ্যতা রাখে।

পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার একটি পথ ছিল ঢাকাকে রক্ষা করার প্রতি মনোযোগী হওয়া, যা পুরো প্রদেশের নিয়তি নির্ধারণ করবে। ঢাকা রক্ষার কাজটি তিনটি বড় নদীর তীর ধরে



সবচেয়ে ভালোভাবে বন্দোবস্ত করা যাবে - গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র - যা একটি কৌশলগত ত্রিভুজের সীমানা তৈরি করে, সাধারণভাবে যাকে 'ঢাকা বোল' বলা হয়। এই কৌশলের দুটি সুস্পষ্ট ক্ষতিকর দিক ছিল। প্রথমত, এর অর্থ ছিল বোলের বাইরে অবস্থিত সমস্ত এলাকা - যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, সিলেট, ভৈরব বাজার, কুমিল্লা আর চট্টগ্রাম - প্রতি ইঞ্চির জন্য যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুর হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রতিরক্ষার পরিধি কমিয়ে আনার ফলে, আমরা ভারতকে তাদের আটটি ডিভিশনের অন্তত চারটিকে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ দিয়ে দিব, যেখানে ইতিহাসে প্রথমবারের মত (আর সম্ভবত শেষ বারের মত), আমরা শক্তির ক্ষমতার দিক দিয়ে কাছাকাছি ছিলাম। এটা আর বলা লাগে না যে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের পরিস্থিতি যতটা সম্ভব অনুকূলে রাখা দরকার ছিল কারণ 'পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার মূলমন্ত্র ছিল পশ্চিমে' - জাতীয় কৌশল পরিকল্পনার গতাণুগতিক ধারণা অনুসারে।

পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষকদের সামনে দ্বিতীয় যে পথটি খোলা ছিল তা হল সীমান্তে ফৌজ নিয়োগ করা ও ক্রমে তা প্রত্যাহার করে 'ঢাকা বোল'-এর দিকে নিয়ে আসা। এটি একটি যুক্তিসম্মত কৌশল ছিল কিন্তু একটি বড় বিষয় একে অকার্যকর প্রমাণিত করল: দিনের বেলা আকাশপথে শত্রুদের কর্তৃত্ব আর রাতের বেলা বিদ্রোহীদের তীব্র সক্রিয়তা সীমান্ত থেকে বোলের দিকে সেনা প্রত্যাহার করাকে অসম্ভব করে তুলবে।

তৃতীয় বিকল্প পথটি ছিল 'অস্থাবর যুদ্ধবিগ্রহ', যা এর প্রবক্তাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার জন্য আদর্শরূপে উপযুক্ত। যদিও, এর বিরোধীরা তর্ক করল যে এই কৌশল যদি অবলম্বন করা হয়, আমরা আক্রমণকারীদের পাশাপাশি বিদ্রোহীদের হাতেও ধরা পড়ব।

চতুর্থ এবং চূড়ান্ত যে পথটি নিয়াজীর সামনে খোলা ছিল তা হল প্রতিরক্ষার 'নগরদুর্গ' ধারণা যার মানে হল গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহরগুলো, বিশেষ করে যেগুলো শত্রুদের অগ্রগতির মূল পথের মধ্যে পড়ে সেগুলোকে নগরদুর্গে (তবরুকের মত) রূপান্তরিত করা আর শেষ পর্যন্ত সেগুলো রক্ষা করা। এই ধারণা, যদিও আধুনিক রণকৌশল অনুযায়ী সেকেলে হয়ে গিয়েছিল, এর দুটি বড় ধরণের সুবিধা ছিল। প্রথমত, এটি আমাদের বিশাল এলাকা সমর্পণ করে দেয়ার ব্যাপারটি ঠেকায়। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে যা খোলাখুলি গতাণুগতিক যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এটি অনুভব করা যাচ্ছিল যে এই 'নগরদুর্গগুলো' শত্রুর অগ্রগতির পথে বড় বাধা হিসেবে প্রমাণিত



হবে। তাদেরকে হয় এগুলো নিষ্ক্রিয় করতে হবে অথবা পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। নিষ্ক্রিয় করতে চাইলে তাদেরকে প্রতিরক্ষাকারীদের শক্তির কয়েক গুণ বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ব্যাপারটি ছিল কামারের নেহাইয়ের উপর হাতুড়ি পেটানোর মত, যেখানে হাতুড়ি ধরে রাখা হাতগুলো নেহাইয়ের কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করার আগেই ক্লান্ত হয়ে যাবে। আর নগরদুর্গকে পাশ কাটিয়ে যেতে যাইলে তাদেরকে এটি অবরোধ করার জন্য অন্তত এর সমান শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে, হিসাবমতে, এগিয়ে যাবার জন্য তাদের হাতে পর্যাপ্ত সৈন্য বাড়তি হিসেবে থাকবে না।

জেনারেল নিয়াজী এই চতুর্থ পথটিই বেছে নিলেন আর নির্দেশ দিলেন যেন এই শহরগুলোকে নগরদুর্গে পরিণত করা হয়: যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ভৈরব বাজার, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম। (সীমান্ত এলাকার অন্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই কেন্দ্রগুলো স্থানীয় কমান্ডাররা নির্বাচন করবেন।) নগরদুর্গগুলোতে অবস্থান নেয়ার আগে, যেখানে ৬০ দিনের গোলাবারুদ আর ৪৫ দিনের খাদ্য মজুদ করার কথা, ফৌজদেরকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার জন্য সীমান্তে লড়াই করতে হবে।

এজন্য ইস্টার্ন কমান্ডের গৃহীত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যধারাগুলো বিবেচনা করা হয়েছিল:

- জিওসি কর্তৃক প্রত্যাহারের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সীমান্তে নিযুক্ত ফৌজ লড়াই চালিয়ে যাবে।
- নগরদুর্গের দিকে সরে আসার সময় তারা কার্যক্রম বিলম্বিত করতে লড়াই করবে যাতে 'হাতে ভালো সময় বাঁচানো যায়'।
- পরিশেষে তারা নগরদুর্গে অবস্থান নিবে ও শেষ পর্যন্ত সেগুলো রক্ষা করবে।

এমন পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল। কেউই এর বিরুদ্ধে কোন গুরুতর আপত্তি তুলল না। ঢাকায় জেনারেল হামিদের এক সফরে এটি তার সামনে পেশ করা হল। তিনি নীতিগতভাবে এটি মেনে নিলেন। পরবর্তীতে এটি জেনারেল হেডকোয়ার্টারে পেশ করা হয় যেখানে নিচের সুপারিশগুলোসহ এটি অনুমোদিত হয়:



- ইংলিশ বাজারের (রাজশাহীর বিপরীতে) বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- এই পরিকল্পনার মধ্যে ফারাক্কা বাঁধ ধ্বংস বা নষ্ট করে দেয়ার জন্য কমান্ডো অ্যাকশন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- একটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন দিয়ে চট্টগ্রামে কেন্দ্র গঠন করতে হবে (যা পরবর্তীতে সমুদ্রপথে বাড়ানো হবে)।
- ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার 'মূল ভিত্তি' হিসেবে গণ্য করতে হবে।

জেনারেল নিয়াজী জেনারেল হেডকোয়ার্টারকে নিশ্চিত করলেন যে পরিকল্পনায় সকল সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যাপারটি মিটমাট হয়েছে বলে মনে হল।

ইস্টার্ন কমান্ডও হুমকীর গভীরতা সম্পর্কে আঁচ করেছিল ও শত্রুর আক্রমণের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু অনুমানও বের করেছিল। এর ফলে এই নিষ্পত্তিতে আসা গেল যে মূল আক্রমণটি আসবে পশ্চিম থেকে (যশোর সেক্টরের বিপরীতে) আর তার সাথে সম্পূরক বলপ্রয়োগ করা হবে পূর্ব থেকে (কুমিল্লা সেক্টরের বিপরীতে)। ব্যবহারযোগ্য সেনাশক্তিকে সেই হিসেবে বন্টন করা হল।

যশোর সেক্টর: মেজর-জেনারেল এম এইচ আনসারীর অধীনে ৯ ডিভিশন যার হেডকোয়ার্টার যশোরে।
১০৭ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার যশোরে; ৫৭ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার ঝিনাইদহে; আর্টিলারীর দুটি ফিল্ড রেজিমেন্ট; একটি রিকনেসেন্স এন্ড সাপোর্ট (আর এন্ড এস) ব্যাটেলিয়ন।

উত্তরবঙ্গ: মেজর-জেনারেল নজর হোসেন শাহের অধীনে ১৬ ডিভিশন যার হেডকোয়ার্টার নাটোরে।
২৩ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার রংপুরে; ২০৫ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার বগুড়ায়; আর্টিলারীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট; দুটি মর্টার ব্যাটারী; একটি আর এন্ড এস ব্যাটেলিয়ন; একটি আর্মার্ড রেজিমেন্ট - যা পূর্ব পাকিস্তানে একটিমাত্রই ছিল।

পূর্ব সীমান্ত: মেজর-জেনারেল আব্দুল মজিদ কাজীর অধীনে ১৪ ডিভিশন, যার হেডকোয়ার্টার ঢাকায়।



১১৭ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার কুমিল্লায়; ২৭ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহে; ২১২ ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার সিলেটে; আর্টিলারীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট; দুটি মর্টার ব্যাটারী; চারটি ট্যাংক।

চট্টগ্রাম সেক্টর: ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লাহর অধীনে ৯৩ স্বতন্ত্র ব্রিগেড যার হেডকোয়ার্টার চট্টগ্রামে।

এই নিয়মিত ফৌজের পাশাপাশি প্রতিটি ডিভিশনের শক্তি বাড়াতে তাদের সাথে ইপিসিএএফ সদস্য, মুজাহিদ ও রাজাকারদের দেয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে তাদেরকে দেয়া হয়েছিল 'প্রতিরক্ষাকে মজবুত করতে'। যুদ্ধের সময় তারা সবচেয়ে দুর্বল দল বলে প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হয়ে গেলে, জেনারেল নিয়াজী আরেকটি বড় ধাপ্পাবাজীর চেষ্টা করলেন। তিনি হঠাৎ দুটি অ্যাড হক ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার ও চারটি অ্যাড হক ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সৃষ্টি করলেন। ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারগুলো ঢাকা ও চাঁদপুরে অবস্থিত ছিল, যথাক্রমে ইপিসিএএফ-এর মহাপরিচালক মেজর-জেনারেল জামশেদ এবং ডেপুটি মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর-জেনারেল রহিম খানের অধীনে। জামশেদ দুটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন পেয়েছিলেন যাদেরকে ২৭ ব্রিগেড থেকে ছাটিয়ে এনে ময়মনসিংহ থেকে ভৈরব বাজারে সরানো হয়েছিল, আর রহিমকে দেয়া হয়েছিল ৫৩ ব্রিগেড যাদেরকে ঢাকার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৪ ডিভিশন থেকে ১১৭ ব্রিগেডকে (কুমিল্লা) বের করে এনে রহিমের অধীনে দেয়া হয়েছিল। এই অ্যাড হক ব্রিগেড, এদের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

জেনারেল নিয়াজী তার এই 'সৃষ্টি' নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন। "দেখ, এই অতিরিক্ত হেডকোয়ার্টারগুলো দেখে শত্রুরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। এই অনুযায়ী তারা মানসিকভাবে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। এটি অবশ্যই তাদের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হবে।" আমার উপস্থিতিতে তিনি প্রায়ই এভাবে দম্ভ করে বলতেন, কিন্তু তার এই অ্যাড হক সেনাদল হেডকোয়ার্টার তৈরীর 'সৃষ্টি' ফৌজের অপ্রতুলতাকে পূরণ করতে পারেনি, আর নভেম্বরের মাঝামাঝি জেনারেল নিয়াজী মেজর-জেনারেল জামশেদ ও তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকীকে অতিরিক্তি ফৌজের আবেদন নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি পাঠাতে বাধ্য হন। ততদিনে, সীমান্তের উপর চাপ বেড়ে গিয়েছিল, প্রধান এলাকাগুলোর বেশির



ভাগই হারাতে হয়েছিল আর অভ্যন্তরের অনেক এলাকা শত্রুর হাতে চলে গিয়েছিল। দলটি জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ব্যাপারটি উপস্থাপন করে আরও দুটি ডিভিশন চাইল। তাদেরকে আটটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন দেয়ার কথা দেয়া হল। এদের পাঁচটি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এসে পৌঁছাল; বাকী তিনটি ব্যাটেলিয়ন আর আসেইনি। নতুন ব্যাটেলিয়নগুলোকে কোম্পানীতে বিভক্ত করে অতিরিক্ত চাপের মুখে থাকা এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া হল। এভাবে তারা সম্মিলিত যুদ্ধ ইউনিটের পরিচিতি হারাল।

১৯শে ডিসেম্বর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ-এর আগের দিন। এই দিনে জেনারেল হেডকোয়ার্টার ইস্টার্ন কমান্ডকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠায়। এতে বলা হয় যে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শত্রুর মূল আক্রমণ আসবে পূর্ব (কুমিল্লা) থেকে, আর সম্পূরক আক্রমণটি আসবে পশ্চিম (যশোর) থেকে। এও বলা হয় যে আক্রমণের সম্ভাব্য দিন হল ঈদের দিন, যখন ফৌজ ও তাদের কমান্ডাররা উৎসব পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এই অনুযায়ী অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করতে ইস্টার্ন কমান্ডকে পরামর্শ দেয়ার জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টারকে বোঝানো হয়েছিল।

বার্তাটিকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল, আর সীমান্ত অবস্থানগুলো, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরগুলোতে, দ্রুত নিরীক্ষা করে নেয়া হল। দেখা গেল যে কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যকার বেল্টটি একেবারেই অরক্ষিত, তাই ৫৩ ব্রিগেডকে দ্রুত ঢাকা থেকে ফেনীতে সরিয়ে নেয়া হল। জেনারেল রহিম তার মার্শাল ল স্টাফ সাথে নিয়ে চাঁদপুরে গেলেন এই স্পর্শকাতর সেক্টরটি রক্ষা করার জন্য। ফেনী ও কুমিল্লার প্রতিটিতে একটি করে ব্রিগেড পাঠিয়ে তাকে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী মনে হল। যশোর সেক্টরে মেজর-জেনারেল এম এইচ আনসারীর কাছে সাবধানবাণী পৌঁছে দেয়া হল, যেখানে সম্পূরক আক্রমণ হবার আশংকা করা হচ্ছিল। অন্য সকল কমান্ডারকেও জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যা হোক, ইস্টার্ন কমান্ড তার প্রতিরক্ষাকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুনর্বিন্যাস করতে ব্যর্থ হল। এই পর্যায়ে তাদেরকে পুরো ২,৭০০ কিলোমিটার সীমান্ত বরাবর নিযুক্ত করা হল, মূলত অনুপ্রবেশ ও বহির্দেশের আক্রমণ ঠেকাতে। রাওয়ালপিন্ডির পরামর্শ সত্ত্বেও, এই বিন্যাস বদলানো হয়নি।



সৌভাগ্যক্রমে, শত্রুরা ঈদের দিন পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে দেয়নি, তারা শুধু নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে তাদের চাপ বৃদ্ধি করেছিল। এই চাপ ঠেকিয়ে, নিয়াজী ভেবেছিলেন যে তিনি জোয়ারে বাঁধ দিয়ে ফেলেছেন, যা আসলে তখনও শুরুই হয়নি। ভারতীয় জেটগুলো ঢাকাকে একেবারেই বিরক্ত করেনি। বাস, রেল আর ফেরীগুলো স্বাভাবিক - কিংবা অস্বাভাবিকভাবে - আগের মতই চলছিল। জেনারেল নিয়াজী তার হেলিকপ্টারে করে রোজকার সীমান্ত সফর চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে চলছিল তার অশ্লীল কৌতুক বকে যাওয়া আর গাদা গাদা চিকেন টিক্কা খাওয়া।

এত কিছুর পরেও, জেনারেল নিয়াজী জোর গলায় এটাই বলছিলেন যে তার জন্য ২১শে নভেম্বরই (বয়রা ঘটনা) পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তিনি তা সফলভাবে লড়ে আসছেন। পূর্বে উল্লেখ করা সেই একই সাক্ষাৎকারে তিনি তার সীমান্তে সেনা নিয়োগের পক্ষে বলেন যে এটা হল 'সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রতিরক্ষা করা'। বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সীমান্ত চৌকিগুলোতে আমার ফৌজরা হল একটি খোলা হাতের বাড়িয়ে দেয়া আঙুলের মত। তারা যতক্ষণ সম্ভব সেখানে লড়াই করবে, তারপর ভাঁজ হয়ে নগরদুর্গে ফিরে এসে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে শত্রুর মাথায় ঘুষি মারবে।"

এই তুলনায় আমি মুগ্ধ হলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল তার সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা যেখানে তিনি পঁচাত্তর শতাংশ হতাহতের ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার নিষেধ করে দিয়েছেন। যখন চারটি আঙুলের তিনটিই ভেঙে যায় বা আহত হয়, হাত মুষ্টিবদ্ধ করা কি তখন সম্ভব? আমার তো একটি নখের ক্ষতি হয়ে গেলেও ওরকমটা করতে পারব না!

এটি ছিল জেনারেল নিয়াজীর অপারেশনাল পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য এক শিক্ষানবিশের চিন্তা, পেশাদাররা একে বিবেচনা করেন, 'সামর্থ্য অনুযায়ী মাত্রাহীন আত্মবিশ্বাস' হিসেবে। বাস্তবতা হল, তিনি এটি মানতে অস্বীকার করেন যে তিনি পরাজয়ের জন্য সেনাবিন্যাস করেছিলেন।



১৬শ অধ্যায়: দিন গণনা শুরু

ঢাকার বাইরে জেনারেল নিয়াজীর শেষ সফর ছিল ৩রা ডিসেম্বর ময়মনসিংহে। সফর শেষে, আমি যখন আমার অফিসে বসে দিনের ঘটনাবলী লিখে রাখছিলাম, তখন বিকাল ৫:১০-এর দিকে তার চিফ অব স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার বকর আমাকে ফোন দিলেন। তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন। প্রায় চিৎকার করে আমাকে বললেন, "তুমি কী ধরণের প্রেস অফিসার? রেডিও পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার ঘোষণা দিয়ে ফেলল আর তুমি আমাকে জানাওনি?" আমি বললাম, "আমি মনে করেছিলাম আপনার কাছ থেকেই আমি খবরটা শুনব।" "ছুতো খোঁজার চেষ্টা করো না ..... এক্ষুণি ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টারে চলে এসো।"

ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টারটি ছিল প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ক্যান্টনমেন্টের একটি জনশূণ্য এলাকায়। ১৯শে নভেম্বর জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে দেয়ার পর ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার সেখানে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। ভূ-গর্ভস্থ ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টারটি একটি বিশাল শিশু গাছের তলে মাটি থেকে প্রায় তিন মিটার নিচে তৈরি করা হয়েছিল। আমি সিঁড়ির প্রায় ছয়টি ধাপ নেমে বাম দিকে মোড় নিলাম আর দুই দিকে তিনটি করে কুঠুরি পার হয়ে করিডোরের শেষ প্রান্তের বড় ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলাম। এটিই ছিল ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টারের 'অপারেশনস রুম' - পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অপারেশনের স্নায়ুকেন্দ্র।

আমি যখন ঢুকলাম, জেনারেল নিয়াজী তখন অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তার পরণে ছিল গ্রীষ্মকালীন ট্রাউজার্স, একটি ধূসর বুশ-শার্ট ও সিল্কের স্কার্ফ। সাত মিটার দীর্ঘ অপারেশনস রুমের চারটি দেয়ালের সবগুলো জুড়ে ছিল বিশাল অপারেশনাল মানচিত্র। ঘরটির এক পাশে টেলিফোন আর ওয়্যারলেস সেট রাখার জন্য সারি করে টেবিল পাতা ছিল। জেনারেল নিয়াজী ঘরের মাঝখানে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার সামনে বসা ছিলেন প্রায় ত্রিশজন অফিসার, যার মধ্যে ছিলেন মেজর-জেনারেল জামশেদ, মেজর-জেনারেল ফরমান ও রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ।

এটি কোন আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা ছিল না। তিনি তাদের সাথে হালকাভাবে কথা বলছিলেন, দেয়াল আর তার শ্রোতাদের মাঝে মৃদু চালে পায়চারি করতে করতে। তার চেহারায়



উদ্বিগ্নতা বা চাঞ্চল্যের কোন ছায়া ছিল না। কিন্তু পরিবেশটি এতই গুরুগম্ভীর ছিল যে তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ তার শ্রোতাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যাচ্ছিল। তার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল এই যে দীর্ঘ-প্রতিক্ষীত উন্মুক্ত যুদ্ধের মুহূর্তটি আঘাত হেনে ফেলেছে। এখন, কোন কিছু বলতে বাধা নেই, আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘনে কোন নিষেধ নেই, আর অনুপ্রবেশকারীদের তাদের এলাকায় ধাওয়া করে নেয়াতেও কোন সীমাবদ্ধতা নেই। সমস্ত মেঘ তুলে নেয়া হয়েছে।

বক্তব্যের পর, আমি অফিসারদের মধ্যে স্বস্তির স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারা দীর্ঘদিন অভ্যুত্থানের কর্দমাক্ত যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এর শেষ দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারা ভাবলেন, এখন এসব শেষ হবে। এর ফলে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই কৌশলগত ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে যে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার মূলমন্ত্র নিহিত আছে পশ্চিমে'।

যখন সবাই অপারেশনস রুম ছেড়ে চলে গেলেন, জেনারেল নিয়াজী তার অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন আর তার জন্য 'দিবসের নির্দেশ'-এর খসড়া তৈরি করে দিতে বললেন। তিনি বলেন যে নির্দেশটিতে অবশ্যই দুটি বিষয়ে জোর দিতে হবে। প্রথমত, এটি ফৌজদের বলবে যে এখন তারা আন্তর্জাতিক সীমানার ব্যাপারটি বিবেচনা করা বাদ দিয়ে শত্রুকে দেখামাত্র আক্রমণ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এটি যেন তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের জন্য স্থল, জল বা আকাশ কোন পথই খোলা নেই সরে আসার জন্য। দিবসের নির্দেশটির খসড়া করা হল, পরদিন অনুমোদন ও নকল করা হল, কিন্তু পরিবহনের অভাবে ফৌজের কাছে পৌঁছানো গেল না। সবগুলো অনুলিপি পরে পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল।

যদিও ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেই পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে পিএএফ-এর জেট আইএএফ-এর সাতটি বেজে আক্রমণ করে ফেলেছিল ও স্থল বাহিনী বেশ কয়েকটি জায়গা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ফেলেছিল, আমরা ঢাকায় বসে পরদিন মাঝরাতের পর পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিশোধের কোন আভাস পেলাম না। রাত ২:৪০-এর দিকে আমার ঘুম ভেঙে গেল অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ও ভারতীয় ক্যানবেরার শব্দে। আমি আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে এক ঘন্টা ধরে ট্রেসার বুলেটের ছোটাছুটি দেখলাম। শত্রুর বিমান বহর পূর্ণ ক্ষিপ্রতায় বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু ক্রমাগত



লাইট অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্টের দৃঢ়চেতা গোলন্দাজদের আক্রমণের ফলে পিছু হটে যাচ্ছিল। আরও বেশ কিছু অস্ত্র যেমন মেশিন গান আর লাইট মেশিন গানও ভূমি থেকে ছোঁড়া গোলাবর্ষণে যোগ দিয়ে এর আয়তন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিমানবন্দরের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই রাতের অনুপ্রবেশকারীদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করল। পিএএফ সেবরগুলো এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নেয়নি কারণ তাদের রাতে কাজ করার ক্ষমতা ছিল না।

দিনের আলো ফুটতে ফুটতে আকাশপথের আক্রমণ স্তিমিত হয়ে এল। আমি দাঁড়ি কামিয়ে কাপড় পাল্টে ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টারে গেলাম, কিন্তু সেখানে তেমন কর্মচাঞ্চল্য দেখলাম না, শুধু একটা প্রাতঃকালীন সভা ছাড়া যে প্রসঙ্গে আমি পরে আবার আসছি। তার আগে চলুন আমাদের নৌবাহিনী ও পিএএফ এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমে যা নিয়ে পর্যালোচনা করব তা হল পাকিস্তান বিমান বাহিনী। আইএএফ-এর জেটগুলো সকালের নাস্তার সময় আবার এসেছিল আর সারাদিন তাদের আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছে। শত্রুর এই আক্রমণের ঢেউ ঠেকাতে, আমাদের ছিল মোট ১৪টি এফ-৮৬ই সেবর, ১৪ জন ফাইটার পাইলট এবং ১৪ দিনের গোলাবারুদ। প্রথম দিন, পিএএফ ৩২টি অপারেশনাল সর্টি ওড়াল ও ৩০,০০০ রাউন্ড গোলাবারুদ খরচ করল। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ইতিহাসে এটি ছিল এক দিনে এক বিমানের পিছনে খরচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি। একইভাবে, ভূমির অস্ত্রগুলোও অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের ভূমিকায় নিযুক্ত থেকে ৭০,০০০-এর মত গুলি ব্যবহার করে ফেলেছিল। এমন আশংকা করা হচ্ছিল যে, এই হারে চললে গোলাবারুদের মজুদ কোনমতে সাত থেকে দশ দিন চলবে। এজন্য এরপর থেকে গোলাবারুদ বাঁচানোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার হল, কারণ এমন আশংকা করা হচ্ছিল যে আমাদের দীর্ঘদিন যুদ্ধ লড়তে হবে। কিন্তু যখন সমাপ্তিটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এসে গেল, তখন সঞ্চয় করে রাখা মজুদ পুড়িয়ে ফেলতে হল।

প্রথম দিন ভারত রানওয়ের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই দশ-বারোটি বিমান হারাল। বিমান বন্দরের কাছাকাছি মাত্র চারটি বোমা পড়েছিল আর এগুলো আমাদের অপারেশনাল কার্যক্ষমতায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যদিও এর ফলে ভারত তাদের আকাশপথের কৌশল পাল্টে ফেলে, রানওয়েতে সরাসরি বোমাবর্ষণের বদলে আমাদের যোগাযোগের



মাধ্যমগুলো বিচ্ছিন্ন করা শুরু করে। এজন্য মিগ-২১-এর বদলে এসইউ-৭ ও হান্টার নিযুক্ত করা হয় ফেরী ও ঘাটগুলোতে বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করার জন্য, এর পাশাপাশি তারা সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় স্থল বাহিনীকে নিবিড় গোলাবর্ষণের সহায়তাও দিতে থাকল। ভারতীয় কৌশলের এই পরিবর্তন ৫ই ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরের উপর চাপ কমিয়ে দিল, এর ফলে পিএএফ কুমিল্লা ও অন্যান্য এলাকায় কিছু সর্টি পাঠাতে পারল আমাদের স্থল বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। কোন সম্মুখ লড়াই হয়নি কারণ ভারতীয় এসইউ-৭ ও হান্টারগুলোর তুলনায় আমাদের সেবরগুলোর টিকে থাকার ক্ষমতা কম ছিল (আকাশপথে যুদ্ধের জন্য ৩৫ মিনিট)। এজন্য, দ্বিতীয় দিন বিশটি সর্টি কোনমতে ১২,০০০ রাউন্ড খরচ করতে পেরেছিল।

সারাটি দিন (৫ই ডিসেম্বর) আর তার পরের রাত, অ্যাক-অ্যাক গানগুলো ঢাকা বিমান বন্দর থেকে অনুপ্রবেশকারীদের দূরে রাখল। ৬ই ডিসেম্বর, যখন আমাদের সেবরগুলো একট গ্রাউন্ড সাপোর্ট মিশন থেকে ফিরে এল আর বিমান বন্দরে তখন কোন সিএপি (কমব্যাট এয়ার পেট্রলিং) ছিল না, দশটি ভারতীয় মিগ-২১, সাথে ফাইটারসহ, চলে এল। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানগুলো এই আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল। শত্রুর বম্বাররা ছয়টি আধুনিক রাশিয়ান বোমা ফেলল, প্রতিটি ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের, যেগুলোর দুইটি রানওয়েতে পড়ল।

প্রতিটি চকচকে বোমা ছিল মিশ্র পদার্থের কাঠামোতে তৈরি যার ভিতর ছিল বিলম্বিত ফিউজ ব্যবস্থা, এর ফলে এটি মাটিতে ঢুকে যাওয়ার এক সেকেন্ডের এক চতুর্থাংশ সময় পর বিস্ফোরিত হয়। এগুলো রানওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে, ১,২০০ মিটারের ব্যবধানে পড়ল, যা রানওয়েকে ব্যবহারের অযোগ্য করে ফেলল। প্রতিটি গর্ত প্রায় দশ মিটার গভীর ও বিশ মিটার চওড়া ছিল। রানওয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি না এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোর একটিও মেরামত করা যায়। এভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদের সেবরগুলোর বিমান বন্দর ব্যবহার ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সফল হল, যেখানে আমাদের দুই দিনে বাইশ থেকে চব্বিশটি বিমান হারাতে হয়েছে - পিএএফ-এর সাতটি আর বাকীগুলো ৬ লাইট অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্টের।

পূর্ণ একাগ্রতার সাথে রানওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোর মেরামতের কাজ করা হচ্ছিল। বিমান বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সামরিক প্রকৌশলী কর্মকর্তারা গর্তগুলো ভরাট করতে



অমানুষিক পরিশ্রম করছিলেন। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় প্রকৌশলী ব্যাটেলিয়নের ফৌজ ও গুটিকয়েক উর্দ্ধ জানা বেসামরিক শ্রমিক। থেমে থেমে আকাশপথে আসা আক্রমণে তাদের প্রচেষ্টায় বাধা পড়ছিল, কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তাদের এগারজন নিহত ও বিশজন আহত হল।

পরের রাতে (৬ই/৭ই ডিসেম্বর) গর্তগুলো দ্রুত ভরাট করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হল যাতে পরদিন সকালে আমাদের জেটগুলো উড্ডয়ন করতে পারে। ৭ই ডিসেম্বর ভোর ৪:৫০-এর মধ্যে কাজের বড় অংশটুকুই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর মাত্র ছয় থেকে আট ঘন্টা প্রয়োজন ছিল মাটির উপর পিচ ঢালাই করার জন্য। কিন্তু ভোর হবার সাথে সাথে, শত্রুর বিমানবহরের একটি নতুন ঢেউ চলে এল আর রানওয়ের আরও তিনটি সংযোগস্থলে গর্ত বানিয়ে দিয়ে গেল। এখন কাজটা শেষ করতে কমপক্ষে ৩৬ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে। আক্রমণকারী বিমান এতটা বিরাম কখনই দেয়নি, তাই যুদ্ধের বাকী সময়টুকুতে রানওয়েটি ব্যবহারের অযোগ্যই রয়ে গেল।

তেজগাঁও (ঢাকা) থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কুর্মিটোলায় আরেকটি বিমান বন্দর তৈরির কাজ চলছিল। এর প্রধান রানওয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রান্তগুলোতে তখনও কিছু কাজ বাকী রয়ে গিয়েছিল। শত্রুরা এই অসম্পূর্ণ বিমান বন্দরের দিকেও সমান নজর রাখছিল আর প্রথম দিনই সফলভাবে এর উপর বোমাবর্ষণ করেছিল।

যখন পুরনো বিমান বন্দরের সাথে সাথে নতুনটিও অকেজো করে দেয়া হল, কেউ একজন পরামর্শ দিল যে দ্বিতীয় রাজধানীর চওড়া রাস্তাগুলো রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ, কিন্তু পিএএফ বেজ কমান্ডার তা নাকচ করে দেন কারিগরী সমস্যা ও দুর্গমতার জন্য। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পিএএফ-এর পরিণতির সমাপ্তি ঘটে। ৬ই ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তা ধরাশায়ী হয়ে থাকে।

পিএএফ ফাইটার পাইলট, ঢাকায় যাদের আর কোন কাজে লাগানো যাচ্ছিল না, এক মিত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ৮ই ডিসেম্বর তাদের দশজনকে ও পরদিন চারজনকে বের করে নেয়া হয়। হেলিকপ্টার পাইলট ও প্রশিক্ষকরা, সেনাবাহিনীর এভিয়েশনের মত, পেছনে পড়ে থাকে।



পিএএফ-এর কোন আফসোস ছিল না। তারা ষাট ঘন্টা টিকে ছিল, যেখানে তাদের আশঙ্কিত বেঁচে থাকার চুক্তি ছিল চব্বিশ ঘন্টার। তারা এতটা লম্বা সময় ধরে টিকে ছিল শুধুমাত্র তাদের মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প ও পেশাদারী যোগ্যতার বলে।

পিএএফ-এর অবর্তমানে ঢাকার আকাশপথ রক্ষার একান্ত দায়িত্ব গিয়ে বর্তালো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানগুলোর উপর যেগুলো ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বর্ষণ করা ও সর্বশেষে চুপ হয়ে পড়া অস্ত্র। আমি নিজে গানপিটে থেকে তাদের কাজ দেখেছি। গোলন্দাজরা ধুসর টুপি পরে অকুণ্ঠচিত্তে তাদের গানগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের চোখ অবিরাম আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকত। যেই তারা ঢাকার দিকে কোন শত্রুর বিমান উড়ে আসতে দেখত, দ্রুত তাদের গানগুলো সেদিকে তাক করত ও সেটির উদ্দেশ্যে একের পর এক গোলাবর্ষণ করে যেত। তাদের গোলাবর্ষণকে আরও শক্তিশালী করতে তারা উদ্দিপ্ত চিৎকার দিত, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। তাদের সাথে কাটানো সেই সময়টুকু আমার জন্য প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীও বিমান বাহিনীর চেয়ে এমন কোন ভালো অবস্থায় ছিল না। এর মোট শক্তি ছিল চারটি পেট্রল বোট (কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর ও সিলেট নামে) আর একজন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। শেষের জন, যদিও একজন প্রতিভাধর কমান্ডার ছিলেন, তার কাছে এমন কোন সম্পদ ছিল না যা দিয়ে তিনি ভারতের নৌবাহিনীর টাস্ক ফোর্সের মোকাবিলা করবেন, যাদের ছিল একটি ক্যারিয়ার আর বেশ কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট ও আরও অনেক যুদ্ধের নৌযান। পেট্রল বোটগুলো মূলত চোরাচালানের বিরুদ্ধের অভিযানের জন্য কেনা হয়েছিল, এখানে লাগানো হয়েছিল ৫০/৬০ এমএম বন্দুক আর প্রতিটিতে ছিল ঊনত্রিশজন করে নাবিক। বন্দুকের রেঞ্জ ছিল মাত্র ৫,০০০ মিটারে সীমিত। দ্রুততম চলার গতি ছিল প্রায় বিশ নট। ভারতীয় টাস্ক ফোর্সের সবগুলো বাহনই সহজে তাদেরকে বন্দুক ও দুরত্বে ছাড়িয়ে গিয়ে দখল করতে পারত।

অ্যাডমিরাল শরীফ বেসামরিক সূত্র থেকে সতেরটি নৌযান জোগাড় করে সেখানে ১২.৭ এমএম কিংবা ২০ এমএম বন্দুক লাগিয়ে নিয়েছিলেন আর তার নৌবহরে যোগ করে নিয়েছিলেন। এই 'উন্নয়নকৃত' নৌযানগুলোর কয়েকটিতে পয়েন্ট ফাইভ অথবা পয়েন্ট থ্রি ব্রাউনিং মেশিন গান ছিল যেগুলো অভ্যুত্থান-বিরোধী অপারেশনগুলোতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে তারা সামান্যই কাজে এসেছে।



পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীকে একটি অসম্ভব দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বার্মিজ সীমান্তের টেকনাফ থেকে ভারতীয় সীমার পাশার পর্যন্ত সমুদ্রতটরেখা ছিল ৬০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। করাচীর দিকে কয়েক হাজার কিলোমিটার জুড়ে দীর্ঘ সমুদ্রপথগুলোতে ভারতীয় নৌবাহিনীর দাপট ছিল। অভ্যন্তরীণ নৌপথ এত বেশি ছিল যে শুধু সেগুলোর নজরদারি করতেই কয়েকশ' নৌযানের প্রয়োজন ছিল। অ্যাডমিরাল শরীফ, যুদ্ধের আগেই বেশ কয়েকবার সবার কাছে এই বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে নৌবাহিনীর যা শক্তি আছে তা দিয়ে তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সম্ভবত এই খোলাখুলি মূল্যায়ণের জন্যই জেনারেল নিয়াজী 'নৌবাহিনীকে ছাড়াই যুদ্ধ লড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন'।

নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে উপকূল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে সমুদ্রতটরেখার বাকীটুকু খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে কোস্টাল ডিফেন্স ব্যাটারির দুটি বন্দুক স্থাপন করে (৪-ইঞ্চি বন্দুক যার সর্বোচ্চ রেঞ্জ ১২,০০০ মিটার), আর চট্টগ্রাম বিমান বন্দর দেখাশোনা করে একটি অ্যাড হক ব্যাটারি। এর পাশাপাশি, একটি মেরিন ব্যাটেলিয়নের ৪০০ সদস্য এবং একটি নৌবাহিনীর প্লাটুন যথাক্রমে বন্দরের পশ্চিম ও পূর্ব দিকের এলাকাগুলোতে নজর রাখে। মংলা সমুদ্র বন্দরটি ছিল একটি গ্যারিসন কোম্পানী (হালকা অস্ত্রসহ), একটি ইপিসিএএফ কোম্পানী, তিনটি উন্নয়নকৃত গানবোট ও দুটি ২৫-পাউন্ডার বন্দুকের হাতে।

৩রা ডিসেম্বর বিকালে আকস্মিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সময় পেট্রল বোটগুলো সব জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পাওয়া গেল। খুলনায় উন্নয়নকৃত গানবোটগুলো রোজকার টহল দায়িত্বে বের হয়েছিল, ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী বের হয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে ঘুরছিল, যা ছিল চট্টগ্রামের সাথে বাকী প্রদেশের একমাত্র যোগাযোগের সূত্র। সিলেট এরই মধ্যে কারিগরী ক্রুটির জন্য ডকইয়ার্ডে পড়ে ছিল। কুমিল্লা ছিল একমাত্র নৌযান যা জেটিতে নিরাপদে ভিড়ানো ছিল।

নৌবাহিনী বহু আগেই এই নির্দেশ জারি করে রেখেছিল যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে গানবোটগুলো পোতাশ্রয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে থাকবে। নৌযানগুলোর পক্ষে পালন করার জন্য এটি খুবই সহজ একটি নির্দেশ ছিল; কিন্তু বাইরে নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষায় থাকা তেইশটি বিদেশী জাহাজ আর সাতটি কোস্টারের কী হবে? সেগুলোকে লুকোনোও



যাবে না, আর খোলা সমুদ্রেও রক্ষা করা যাবে না। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কোন নির্দেশ পৌঁছানো গেল না কারণ তারা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের যোগাযোগ যন্ত্রগুলো খোলা রাখে। তাদের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল সশরীরে তাদের সাথে দেখা করা। একজন সাহসী অফিসার বাছাই করা কয়েকজন নাবিককে সাথে করে একটি নৌযান নিয়ে গেলেন ও অবশেষে তাদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারলেন। তারা আকাশপথের আক্রমণ এড়ানোর জন্য তাদের বিদেশী পতাকা উড়িয়ে দিল।

৪ঠা ডিসেম্বর রাত ২টায় যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটা খেল চট্টগ্রাম, যখন একটি তেলের ভান্ডারে শত্রুর বিমান এসে আঘাত হানল। পরদিন, সমুদ্রের দিক থেকে একটি নিরীহ চেহারার হালকা বিমান এসে হাজির হল আর শহরের উপর দিয়ে অলসভাবে গুঞ্জন করে উড়তে থাকল। সমুদ্রতীরের বন্দুকগুলোর চালনায় থাকা রাজাকাররা বিপদের আঁচ করতে পারেনি, যতক্ষণ না তারা চট্টগ্রাম রিফাইনারি উড়িয়ে দিল। এরপর এল পাঁচটি ক্যানবেরার একটি দল। অ্যাড হক অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ব্যাটারি এদের দুটিকে গুলি করে ভূপাতিত করতে পারল। বাকী তিনটি নৌবাহিনীর বেজ, বিমান বন্দর ও রিফাইনারির কাছে তাদের বোমা ফেলে দিয়ে ফিরে গেল।

ইতোমধ্যে এক রাতের অনিশ্চিত খবর এসে চট্টগ্রামে পৌঁছাল যে শত্রুরা কুতুবদিয়া দ্বীপে অবতরণ করছে। চট্টগ্রাম বেজের কমোডর ইন চার্জ এই অবতরণের সত্যতা যাচাই করতে কুমিল্লা, রাজশাহী ও (উন্নয়নকৃত গান-বোট) বালাঘাট-কে পাঠানো সুবিবেচনাপূর্ণ মনে করলেন কারণ তার মতে যুদ্ধ যখন দ্বারপ্রান্তে তখন নৌযানগুলোকে লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

রাজশাহী যখন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবতরণের এলাকায় গিয়ে পৌঁছাল, এটি শত্রুর ফৌজের কোন লক্ষণ খুঁজে পেল না। যদিও, পরে এটি শত্রুর চারটি হান্টার দ্বারা আক্রান্ত হয়। নৌযানটি এর ৪০/৬০ এমএম বন্দুক দিয়ে তাদের তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই সরাসরি ছয়টি আঘাত পায়। এর ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় আর মূল প্রকোষ্ঠে হুড় হুড় করে পানি ঢুকতে শুরু করে। আগুন আর পানি, যারা ঐতিহ্যগতভাবে একে অপরের শত্রু, এখন একজোট হয়ে এই দুর্ভাগা নৌযানটিকে ডুবানোর চেষ্টা করতে থাকে। কমান্ডিং অফিসারসহ নাবিকদের সাতজন সদস্য আহত হয়েছিল (তাদের একজন পরে মারা যায়)। কিন্তু তারা এত সহজে নৌযানটি ডুবে যেতে দেয়নি। কেউ আগুন নিয়ন্ত্রণের



চেষ্টা করছিল, আর বাকিরা পানির ঢুকে পড়া আটকাচ্ছিল। সোভাগ্যক্রমে নৌযানটি আগুনে জ্বলতে দেখে শত্রুর বিমান ফিরে যায়। নাবিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে তারা নৌযানটিকে বাঁচাতে সক্ষম হয় আর একে পোতাশ্রয়ে ফিরিয়ে আনে।

প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে থাকা কুমিল্লা, রাজশাহী-র সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেনি কারণ এটি নিজেও আক্রান্ত হয়েছিল - এবার নয়টি বিমান দ্বারা। পাইলটরা এই বেচারার উপর তাদের নিশানা অনুশীলন করছিল। যেমন করে একজন লাইট-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা তার অসম প্রতিপক্ষের ক্রমাগত ঘুষি খেয়ে খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, তেমনি কুমিল্লা-ও অবশেষে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াল। নাবিকরা আহত হওয়া সত্ত্বেও একে বাঁচিয়ে রাখতে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, যতক্ষণ না এর জ্বালানী ট্যাংকে আঘাত লেগে এর কার্যক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়। কমান্ডিং অফিসার উপলব্ধি করতে পারলেন যে পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছয়শ' রাউন্ড গোলাবারুদে আগুন ধরে যাবে আর সবকিছু বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই তিনি দুজন অফিসার আর ২১ জন নাবিককে লাইফ জ্যাকেট পরে জাহাজ খালি করে দিতে বললেন। তিনি আর তার নাবিকরা সাগরে ঝাঁপ দিতেই, বিশাল এক বিস্ফোরণে নৌযানটি খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল। দ্রুতই এটি উল্টে গিয়ে ডুবে গেল।

বালাঘাট, যেটি শত্রুর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, অবশেষে কুমিল্লা-র নাবিকদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম বেজে নিয়ে এল। রাজশাহী আর কুমিল্লা-র বেঁচে যাওয়া নাবিকরা একবার ফিরে আসার পর, পোতাশ্রয়ের বাইরে আর কোন নৌযান পাঠানো হয়নি, না তো অবতরণ যাচাই করতে আর না এর চেয়ে মহৎ কিছু করতে। আসলে পাঠানোর যোগ্য আর কোন নৌযানই ছিল না।

খুলনা বেজ, যা আকারে ও গুরুত্বের দিক দিয়ে ছোট ছিল, অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি পেল। এর ছিল একটি উপযুক্ত গান-বোট, যশোর, আর চারটি উন্নয়নকৃত নৌযান। যুদ্ধের প্রথম দিন, নৌযানগুলোর দুটি আকাশপথের আক্রমণে ধ্বংস হয় ও বাকি তিনটি নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এটিই ছিল বাস্তবিকরূপে পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধের সমাপ্তি। যুদ্ধের বাকী সময়টুকুতে নৌবাহিনী তার লোকবল সেনাবাহিনীর ফৌজের সাথে একজোট করে সমুদ্রতীরের প্রহরা ও পরবর্তীতে 'নগরদুর্গ' প্রতিরক্ষায় অংশ নিয়েছিল। কিছু নৌযান



অভ্যন্তরীণ নৌপথে ফৌজদের পরিবহন করার কাজে সাহায্য করেছিল, আর এই ভূমিকায় তারা যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অটলভাবে কাজ করে গিয়েছিল।

এভাবে যুদ্ধের শুরুর পর্যায়েই নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়, পূর্ব পাকিস্তানের পরিণতি নির্ভর করছিল জেনারেল নিয়াজী ও তার ৪৫,০০০ সামরিক ও ৭৩,০০০ আধাসামরিক ফৌজের উপর। জেনারেলের নৈতিক মনোবল আর তার ফৌজের শারীরিক সাহস - এদেরকেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হত।

যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে আমি জেনারেল নিয়াজীকে খুবই প্রফুল্ল মেজাজে দেখেছি। তিনি নিয়মিত সকাল ৮:৩০-এ প্রাতঃকালীন বৈঠক ডাকতেন আর তার কাছে আসা যে কোন অফিসারের সাথে উৎফুল্লভাবে সাক্ষাৎ করতেন। আমি অবাক হতাম এই দেখে যে তিনি এই সময় তার নিজ দায়িত্বের এলাকার চেয়ে পশ্চিম অংশের যুদ্ধের অগ্রগতির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাতেন। তিনি অপারেশনস রুমের একটি দেয়ালে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টের একটি এক-ইঞ্চি মানচিত্র লাগিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিদিন সকালে নিয়াজী আসার আগে, একজন স্টাফ অফিসার এই মানচিত্রের উপর জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সর্বশেষ সংকেত অনুযায়ী যুদ্ধের চিত্র সযত্নে চিহ্নিত করে রাখতেন। (জেনারেল হেডকোয়ার্টার প্রতিদিন যুদ্ধের অবস্থার চরমভাবে সেন্সর করা খবর প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছিল।)

মানচিত্রে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাহিনীকে যথাক্রমে লাল ও সবুজ পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রে আন্তর্জাতিক সীমারেখার কয়েক সেন্টিমিটার বাইরে তিন-চারটি সবুজ ফোঁটা ছিল, এটি শত্রুদের এলাকায় আমাদের ঢুকে পড়া নির্দেশ করত। যদিও আমার কাছে এটা খুব একটা চিত্তাকর্ষক মনে হত না, বিশেষজ্ঞরা জোর দিতেন যে এগুলো বড় ধরণের অর্জন।

৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের দিকে যখন আমি অপারেশনস রুমে ঢুকলাম, দেখলাম সেখানে এই খুশির খবরে সবাই কলকল করছে যে অমৃতসরের পতন হয়েছে আর আমাদের ফৌজ ফিরোজপুরের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গিয়েছে। রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ, যিনি কাছেই ছিলেন, বাস্তবধর্মী প্রশ্ন করলেন, "খবরটি যদি সত্যিই হবে, তাহলে ওরা (জেনারেল হেডকোয়ার্টার) এমন সংকেত পাঠাচ্ছে না কেন?" তাকে বলা হল, "আহা, তারা তাদের অর্জনগুলো থিতু না হওয়া পর্যন্ত লিখিতভাবে বা বেতার সম্প্রচারে নিজেদের ব্যস্ত করতে চায় না।"



এই খবরটা যখন জেনারেল নিয়াজীর কুঠুরীতে গিয়ে পৌঁছাল, আমি তার সাথে ছিলাম। চেয়ারে বসে থেকেও তিনি কুস্তিগীরের মত লাফ-ঝাঁপ শুরু করলেন। আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "তুমি সব সময় আমাকে পরামর্শ দাও যে আমি যেন অতি উচ্চাশা না করি এই বলে যে আমি ভারতীয় এলাকায় যুদ্ধ টেনে নিয়ে যাব। এখন, দেখ, আমি না পারি, আমার বড় ভাই (পশ্চিম পাকিস্তান) ঠিকই ভারতীয় এলাকায় যুদ্ধ টেনে নিয়ে গিয়েছে।" তিনি তাড়াতাড়ি গভর্নরকে ফোন দিয়ে এই বিরাট অগ্রগতির খবরটি দিলেন। তিনি এমন নির্দেশও দিলেন যে এই তথ্য ফৌজদের কাছে প্রকাশ করে দিতে হবে কারণ 'এটি তাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য ভালো হবে'। কিন্তু রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ পরামর্শ দিলেন যে এর পূর্ণ সত্যতা আগে যাচাই করে নেয়া উচিৎ।

যে অফিসার এটি প্রথম শুনেছেন তার কাছ থেকে আমাকে এটি আবার যাচাই করতে বলা হল। আমি সেই অফিসারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বললেন যে পিএএফ প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম সম্ভবত এই খবরটি ঢাকার পিএএফ বেজে পাঠিয়েছেন। আমি যখন বেজে ফোন দিলাম, তারা বিমান বাহিনীর প্রধানের কাছ থেকে এমন কোন খবর পাওয়ার কথা অস্বীকার করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আপনারা এই খবর তো শুনেছেন?" "হ্যাঁ।" "কোথা থেকে?" "ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারের অপারেশনস রুম থেকে।" রাওয়ালপিন্ডিতেও টেলিফোন করা হল কিন্তু তারাও এই কাহিনী নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত বের হল যে এই গুজবটি মিথ্যা। যে আশা এটি তৈরি করেছিল হঠাৎ করে তা নিরাশায় পরিণত হল।

পরদিন সকালে কোন খুশির খবর এল না। চব্বিশ ঘন্টা আগে সবুজ পিনগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে আমাদের অর্জনগুলো যেভাবে দেখাচ্ছিল, সেখানেই রয়ে গেল। আমরা রেডিও পাকিস্তান ছেড়ে রেখে সবগুলো নিউজ বুলেটিন শুনলাম কিন্তু তারা 'প্রতিরক্ষার শক্তিবৃদ্ধি' ছাড়া আর কিছুই বলল না।

৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে, জেনারেল নিয়াজী পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত-ভেদ করার সব ধরণের আশা ছেড়ে দিলেন। এজন্য তিনি সকালের ব্রিফিং-এ জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে আসা সংকেতের ব্যাখ্যা পড়া ছেড়ে দিলেন আর দেয়াল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার নিজের আশ্রয়স্থলে ঢুকে পড়লেন আর আরও মনোযোগ দিয়ে অপারেশনাল মানচিত্র নিয়ে পর্যালোচনা



করতে থাকলেন। এখানে ফৌজের গতিবিধি নির্দেশ করা তীরচিহ্নগুলো পশ্চিম সীমান্তের পুঁচকে পিনগুলোর চেয়ে অনেক বেশী বড় ছিল। এই তীরচিহ্নগুলো সাধারণত শত্রুর অগ্রগতি আর আমাদের পিছু হটার পথগুলো নির্দেশ করত।



১৭শ অধ্যায়: প্রথম নগরদূর্গের পতন(৯ ডিভিশন)

৯ ডিভিশন এলাকাটি ছিল নিখুঁতভাবে কাটা কেকের টুকরার মত। উত্তরদিক দিয়ে গঙ্গা (পদ্মা) আর পূর্ব দিক দিয়ে যমুনা দিয়ে কাটা ছিল। [এখানে লেখকের অথবা বইয়ের ছাপার ভুল আছে, যমুনা হবে না, এটা হবে মেঘনা।] ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সাথে লাগোয়া এই অংশে ছিল খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল ও ফরিদপুরের মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শহর।

ভারতের সাথে বিভাগীয় সীমান্ত ছিল ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ যা গঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে শুরু হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে গিয়েছিল। সীমান্তের পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রায় সমান্তরালভাবে খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়াকে সংযুক্ত করে একটি সড়ক গিয়েছিল। সীমান্ত থেকে আরও বয়ে চলেছিল প্রায় এক কিলোমিটার চওড়া মধুমতী নদী, যা জরুরী সময়ে একটি ভালো প্রতিরক্ষা সীমানা হিসেবে কাজে লাগতে পারে। এলাকার বাকী অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত শুকনো, যার ফলে ফৌজ, ট্রাক ও ট্যাংকগুলো সচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারত।

উত্তর সীমান্তের প্রায় অর্ধেকটুকু, রাজাপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত, এর দায়িত্ব ব্রিগেডিয়ার মনজুরের অধীনে ৫৭ ব্রিগেডের উপর ন্যস্ত ছিল যার হেডকোয়ার্টার ছিল ঝিনাইদহে, আর জীবননগরের নিম্নসীমা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অংশ ১০৭ ব্রিগেডের অধীনে ছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মখমদ হায়াত। ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার যশোরে অবস্থিত ছিল। শান্তিপূর্ণ সময়ে ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারও যশোরে ছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিনই একে মাগুরায় সরিয়ে নেয়া হয় যা ছিল ঝিনাইদহ ও মধুমতীর প্রায় মাঝামাঝি। কিছু ইপিসিএএফ সদস্য ও রাজাকার নিয়ে গড়ে তোলা একটি অ্যাড হক ব্রিগেডকে খুলনায় কেন্দ্রস্থিত করা হয়েছিল।

অপারেশনাল পরিকল্পনা অনুযায়ী, ফৌজের বেনাপোল-দর্শনা-রাজাপুর সীমান্ত রেখা বরাবর শত্রুদের দেরী করানোর কথা, তারপর 'হাতে সময় বাঁচিয়ে' এলাকার দুই নগরদুর্গ, যশোর ও ঝিনাইদহের দিকে পিছু হটার কথা। হিসাব করা হয়েছিল যে শত্রুরা এই নগরদুর্গগুলোর একটি অথবা উভয়ই নিষ্ক্রিয় না করা পর্যন্ত তাদের ঘাড় খুব বেশি দূরে



বাড়ানোর ঝুঁকি নিবে না। শত্রুরা যদি সেগুলো অবরোধ করতে চায়, তাদেরকে প্রতিটি নগরদুর্গের জন্য একটি ডিভিশন নিযুক্ত করতে হবে যার ফলে তাদের কাছে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ফৌজ অবশিষ্ট থাকবে না।

এও হিসাব করা হয়েছিল যে শত্রুরা তিনটি প্রধান পথের যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারে: কোলকাতা-বেনাপোল-যশোর, কৃষ্ণগড়-দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা অথবা মুর্শিদাবাদ-রাজাপুর-কুষ্টিয়া। প্রতিটি পথই ডিভিশনাল বাহিনীকে নিয়ে আসতে পারে, তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সংক্ষিপ্ত ছিল বেনাপোল পথ। অতএব এটিই ছিল সবচেয়ে সম্ভাব্য প্রবেশ পথ; আর বলা হয়, বিজ্ঞ শত্রু কখনও সবচেয়ে সম্ভাব্য রাস্তা অনুসরণ করে না। সে সেখানেই আঘাত করে যেখানে সে সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত।

ভারত এই তিনটি পথের কোনটিই ব্যবহার করল না। তারা বরং সিদ্ধান্ত নিল সীমান্তের এপারে আমাদের দিকে যেসব অস্থায়ী ঘাঁটি তারা গড়ে তুলেছিল সেগুলোর ফায়দা লুটবে। এই অস্থায়ী ঘাঁটিগুলোর মধ্যে একটি, যা আগেই বলা হয়েছে, গরীবপুরে অবস্থিত ছিল যেখানে আমরা ২১শে নভেম্বর থেকে শত্রুবাহিনীকে ঘেরাও করে রেখেছিলাম। আরেকটি অস্থায়ী ঘাঁটি নভেম্বরের শেষ দিকে গড়ে তোলা হয়েছিল, এটি ছিল দর্শনার কাছে দুই ব্রিগেড জেলার মধ্যবর্তী সীমান্তের কাছাকাছি। প্রথমটি ছিল ১০৭ ব্রিগেড এলাকায় আর দ্বিতীয়টি ৫৭ ব্রিগেড এলাকায়।

গরীবপূরের অস্থায়ী ঘাঁটিটি ছিল প্রায় ১৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের, যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে নাক বরাবর মোটে এগার কিলোমিটার দূরে। নভেম্বর থেকে, শত্রুদের বন্দুক ছাড়া ছাড়া ভাবে ক্যান্টনমেন্ট ও এয়ারফিল্ড এলাকায় গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল, তবে তাদের প্রবলতা সহনীয় ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর, তারা গোলাবর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বুরিন্দা, ৮আর (সাধারণভাবে এই নামেই পরিচিত) ও মোহাম্মদপুর দিয়ে ঘেরাও ভাঙার চেষ্টা করল। কিন্তু আমাদের ফৌজ তাদেরকে আটকে রাখল: ৬ পাঞ্জাব, ১২ পাঞ্জাব, ২১ পাঞ্জাব (যেখানে একটি কোম্পানী কম ছিল) ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানী নিয়ে গঠিত আমাদের বাহিনী শত্রুদেরকে পুরো ষাট ঘন্টা সফলভাবে আটকে রেখেছিল। যদিও এমনটা আশংকা করা হচ্ছিল যে শত্রু যদি সাফল্য অর্জন করতে পারে তাহলে সে সরাসরি যশোরে আঘাত হানবে, ব্রিগেড কমান্ডারকে তার ফৌজ সীমান্ত থেকে প্রত্যাহার করে এনে নগরদূর্গের প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য কোন সময় দিবে না। তার



সবচেয়ে নিকটবর্তী ফৌজ ছিল বেনাপোলে আর সবচেয়ে দূরবর্তী সাতক্ষীরায়, যশোর থেকে যথাক্রমে তেতাল্লিশ ও নব্বই কিলোমিটার দূরে।

ব্রিগেডিয়ার মখমদ হায়াত, যিনি ছিলেন পুরোদস্তুর পেশাদার, এই বিপদ দেখতে পেলেন আর জিওসি-র অনুমতি চাইলেন যেন তার ছড়িয়ে দেয়া আঙ্গুলগুলো সময়মত ভাঁজ করে এনে যশোরে মুঠি পাকাতে পারেন (যেখানে কোন নিয়মিত ফৌজ ছিল না)। পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পেছনে বসে থাকা জেনারেল আনসারী এই অনুমতি প্রার্থনা নাকচ করে দিলেন, তিনি জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশের উদ্ধৃতি দিলেন যে সীমান্তে পঁচাত্তর শতাংশ হতাহতের ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কোন সেনা প্রত্যাহার করা যাবে না।

ব্রিগেডিয়ার হায়াত উপলব্ধি করলেন যে আফরা পথে গরীবপুর প্রতিরক্ষাকে প্রত্যাহার করতে চাইলে, শত্রুদের সাথে যশোরে সাক্ষাৎ হবার চেয়ে তাদেরকে খুলনার দিকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ভালো হবে। এজন্য তিনি গোলাবারুদের মজুদের একটি অংশ যশোর থেকে খুলনায় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিলেন। তার সামনে মাগুরায় সরে যাওয়ার সুযোগও খোলা ছিল যেখানে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। সেখানে যুদ্ধ লড়ে দেরী করানোর পর তিনি মধুমতী নদীতে পিছু হটে এসে শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘায়িত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। মাত্র কয়েক কিলোমিটার পিছনে, ফরিদপুরে তার জন্য যথেষ্ট গোলাবারুদ ও খাবারের মজুদ পড়ে ছিল।

ব্রিগেডিয়ার হায়াতের অফিসাররা আপত্তি তুলল যে মধুমতী প্রতিরক্ষা সীমানার কথা কোন অপারেশনাল পরিকল্পনায় কখনই উল্লেখ করা হয়নি। তারা বলল, তাদের কাছে 'অভেদ্য সীমানা' হিসেবে যা নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে যশোর-ঝিনাইদহ সড়ককে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জেনারেল নিয়াজীর চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর অবশ্য জোর দিয়ে বলেন যে মধুমতী প্রতিরক্ষা সীমানা নিয়ে জেনারেল আনসারীর সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছিল কিন্তু একে অপারেশনাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যাতে 'অভেদ্য সীমানা'-র উপর থেকে বিশ্বাস দুর্বল না হয়ে যায় আর প্রতিরক্ষাকারীরা পেছনে তাকানো না শুরু করে। পরিকল্পনায় থাকুক বা না থাকুক ব্রিগেডিয়ার হায়াত এটি নাকচ করলেন আর তার খুলনার দিকে সরে যাওয়ার প্রাথমিক ধারণাতেই স্থির থাকলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি গোপন রাখলেন। তিনি শুধু তার বিশ্বস্ত একজন কমান্ডিং অফিসারের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ৫ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের দিকে তিনি



তাকে পশতুতে বলেন, "ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়ো না। আমরা যদি যশোর ছাড়ি, তো আমরা খুলনা যাব।"

এদিকে শত্রুরা ১২ পাঞ্জাব, ২১ পাঞ্জাব ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানীকে পিছু হটিয়ে তাদের গরীবপুর অস্থায়ী ঘাঁটির সীমা প্রায় তিন কিলোমিটার বাড়িয়ে ফেলেছিল। এখন আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা সীমানা ছিল কায়েমকোলা-সন্তোষনগর-অমৃত বাজার, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কলার তখনও শত্রুর ঘাড় জুড়ে ছিল।

নতুন প্রতিরক্ষা বেষ্টনীতে পার্শ্ববর্তী ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পজিশন পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল যারা বেনাপোল পথকে পাহারা দিচ্ছিল। বেনাপোলের কোম্পানীকে চার কিলোমিটার পেছনে শার্শাতে সরিয়ে নেয়া হল, আর রঘুনাথপুরের দ্বিতীয় কোম্পানীটিকে ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারসহ সরিয়ে যশোর রোডের ঝিকরগাছায় আনা হল।

শত্রুরা ৬ই ডিসেম্বর আফরা পথে ৯ ডিভিশনের উপর তাদের পূর্ণ শক্তি চাপিয়ে দিল। সকালের চেষ্টা নিষ্ফল হল আর সকাল ১১টার দিকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও একইভাবে অফলপ্রসু হল। মধ্যাহ্নভোজের পর পর, তৃতীয় প্রচেষ্টা আংশিক সাফল্যের মুখ দেখল। তারা আফরা পথের ডানদিকে একটি প্লাটুনকে ছারখার করে দিল। এটি একটি ছোট ভাঙন ছিল, কিন্তু পূরণ করা গেল না, কারণ কোন অতিরিক্ত বাহিনী ছিল না। ৮ পাঞ্জাবের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ইয়াহিয়া এই অগ্রগতির ব্যাপারে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারকে জানানো সমীচীন মনে করলেন। তিনি বার্তা পাঠালেন যে ফাঁকা অংশটি দিয়ে শত্রুর ট্যাংক আর সশস্ত্র সদস্যদের বহন করা বাহনগুলো ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের দিকে অবাধে ঢুকে পড়ছে। বিকাল ৩ টার দিকে বার্তাটি ব্রিগেডিয়ার হায়াতের কাছে পৌঁছাল, যখন ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল শামস তার সাথে ছিলেন। তিনি শামসকে নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি তার ব্যাটেলিয়নকে বেনাপোল-যশোর সড়ক থেকে সরিয়ে এনে খুলনার দিকে ১৯ কিলোমিটার দূরে নবপাড়ায় নিয়ে যান, আর যশোর শহরের তেরাস্তার মোড়ে একটি কোম্পানী রেখে আসেন যাতে অন্য ব্যাটেলিয়নগুলোর নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা যায়। এই অনুযায়ী সকল কমান্ডিং অফিসারকে নির্দেশ পৌঁছে দেয়া হল।

৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৫:৩০-এ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার কোন গোলাগুলি ছাড়াই নগরদুর্গটি খালি করে যশোর ছেড়ে গেল। এমন কি তারা তাদের গোলাবারুদ ভরা ভান্ডারও ধ্বংস



করে গেল না। অবশ্য শত্রুরা, যারা যশোরের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অনুমান করেছিল, পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্তও তা দখল করেনি। এমন কি যশোর পতনের দুই দিন পরেও ইস্টার্ন কমান্ড দাবী করে যাচ্ছিল যে সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। এদিকে, বহু বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধি, যারা ভারতীয় ফৌজের সাথে যশোরে প্রবেশ করেছিল, তারা ঢাকায় এসে পৌঁছালে আমাদের এই অবাস্তব দাবী নিয়ে টিটকারী দিল। তারা বলল যে তারা আমাদের ব্রিগেড কমান্ডারের শূণ্য তাঁবু দেখেছে যেখানে তার আধ-পোড়া সিগারেট পড়ে ছিল, যেমনটা দেখেছে আমাদের খালি করে যাওয়া ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার যেখানে দপ্তরীরা টাইপরাইটার থেকে কাগজগুলো খুলে রাখারও সময় পায়নি।

৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর পর্যন্ত অনেক অফিসার যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের সাথে সাথে যশোর-মাগুরা সড়ক ব্যবহার করেছিলেন, তারা ব্রিগেড প্রত্যাহারের এই সম্ভাব্য পথগুলোতে শত্রুর উপস্থিতির কোন লক্ষণ খুঁজে পাননি। বাস্তবে, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এহসান দেখলেন যে মাগুরা সড়কের একটি ঘাটে আমাদের সামরিক পুলিশকে নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে সরে আসা বাহিনীকে মাগুরার দিকে পথ দেখিয়ে দিতে পারে। একইভাবে, আমাদের সরবরাহ ও পরিবহনের (এসএন্ডটি) বাহনগুলো শত্রুর কোনরকম বাধা ছাড়াই ঝিনাইদহ সড়কে মুক্তভাবে চলাচল করছিল। এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে ব্রিগেডিয়ার হায়াত এই পথ দুটোর যে কোনটি ব্যবহার করে তার ব্রিগেডকে মাগুরায় সরিয়ে নিতে পারতেন।

৬ ও ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতটি ১০৭ ব্রিগেডের অধীন ফৌজদের জন্য খুবই ব্যস্ততাপূর্ণ কেটেছে। যেখানে যশোর নগরদুর্গের আশ্রয়ে সরে যাবার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, সেখানে এখন তাদেরকে নবপাড়ার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে গন্তব্যটি তারা আগে কখনও দেখেনি বা এ নিয়ে আলোচনাও করেনি। তারা খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সরে আসছিল, আর তেরাস্তার মোড়ের কোম্পানী কমান্ডার পরে আমাকে বলেছিলেন যে যানজট ছাড়িয়ে যানবাহনগুলোকে খুলনার দিকে পাঠানো যথেষ্ট ঝক্কির কাজ ছিল।

মধ্যরাতের দিকে একটি অ্যাম্বুলেন্সকে নবপাড়ার বদলে গরীবপুরের দিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। একজন অফিসার বাহনটি থামিয়ে চিৎকার করে চালককে বললেন, "এই ব্যাটা গাধা! জানিস না খুলনা কোন দিক দিয়ে যায়? তুই তো উল্টো পথে যাচ্ছিস।" সে সবিনয়ে



বলল, "জ্বী স্যার, আমি খুলনার রাস্তা চিনি, কিন্তু আমি গরীবপুরে একজন আহত সৈনিককে কথা দিয়েছি যে তাকে দ্বিতীয়বার এসে তুলে নিয়ে যাব। সে আমার অপেক্ষায় থাকবে।"

১০৭ ব্রিগেড এক লাফেই ২০ মাইলস্টোনের কাছে নবপাড়ায় পৌঁছাতে পারেনি। (তখনও পাকিস্তানে মুদ্রার নোট ছাড়া আর কিছুতে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়নি।) তারা প্রথমে ৩০ মাইলস্টোন, এরপর ২৫ মাইলস্টোনে থেমেছিল, কিন্তু নতুন পরিবেশে বিহ্বল হয়ে পড়া ফৌজরা অস্থায়ী প্রতিরক্ষা নিয়ে বসে থাকেনি। ১০ই ডিসেম্বর এই পথে তারা তাদের প্রথম যুদ্ধ লড়ল ২০ মাইলস্টোনে (নবপাড়া) আর ১১ই ডিসেম্বর ৯ মাইলস্টোনের (দৌলতপুর) দিকে সরে গেল। তারা ১৬ই ডিসেম্বর খুলনায় সরেই যাচ্ছিল, কিন্তু তখন ঢাকায় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ার হায়াতের কাছে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ পৌঁছে দেয়া হয়েছিল, যিনি তার নিজস্ব যুদ্ধ লড়ার জন্য সমস্ত কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

খুলনার অ্যাড হক ব্রিগেডকে কখনই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। আসলে যশোর নগরদুর্গের পতনের পর তারা খুলনা ধরে রাখতে আত্মবিশ্বাসী ছিল না। তাই তারা ৬/৭-ই ডিসেম্বরের রাতগুলোতে যা পাওয়া যায় এমন সব ধরণের পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করে ঢাকার পথে রওনা দিয়েছিল। খুলনা নৌঘাঁটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার গুল জেরিনও সুযোগের অপেক্ষায় বসে না থেকে গান-বোট নিয়ে সমুদ্রপথে পালিয়ে যান। যশোর নগরদুর্গ যদিও হঠাৎ করে খালি করে দেয়া হয়েছিল, খুলনা আগে-ভাগেই খালি করে দেয়া হল।

ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার, কমান্ডার গুল জেরিন বা খুলনা ফৌজের প্রস্থানের ব্যাপারে সেদিন কিছুই জানতে পারেনি। তারা তখনও খুলনা গ্যারিসনের দীর্ঘ জীবনের অবাস্তব কল্পনা করে যাচ্ছিল, যেখানে তারা জানত যে তাদের কাছে পিছু হটে আসা ১০৭ ব্রিগেডের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ছিল না। তারা হেলিকপ্টার-ভর্তি দামী গোলাবারুদ পাঠাল, যেগুলো সেনাবাহিনীর এভিয়েশনের সাহসী পাইলটরা রাতের বেলা বিরাট ঝুঁকি নিয়ে খুলনায় নিয়ে গেল, কিন্তু সবই শুধু পন্ডশ্রম হল।

এবার চলুন ব্রিগেডিয়ার মনজুরের ৫৭ ব্রিগেডের দিকে তাকাই, যারা ৪ ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশনের মুখোমুখি হয়েছিল। এই ব্রিগেডে ছিল ২৯ বালুচ, ১৮ পাঞ্জাব, ১২ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী (রিকনেসেন্স এন্ড সাপোর্ট) আর ৫০ পাঞ্জাবের দুটি কোম্পানী,



পাশাপাশি ছিল আর্টিলারীর একটি রেজিমেন্ট ও এম-২৪ ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন (কোর রিজার্ভ)। ব্রিগেডিয়ার মনজুর, যিনি একটু মেজাজী কমান্ডার ছিলেন, তার হেডকোয়ার্টারে (ঝিনাইদহ) আরাম করছিলেন, এ সময় তিনি জানতে পারেন যে শত্রু জীবননগর এলাকায় তাদের আক্রমণের পাদভূমি বাড়াতে প্রবল চাপ দিচ্ছে, এতে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর দর্শনা হুমকীর মুখে পড়েছে। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে দর্শনার যদি পতন হয় তো গভর্নর এ এম মালিকের নিজের শহর চুয়াডাঙ্গা প্রতিরক্ষার ঢাল থেকে বঞ্চিত হবে। শত্রুরা তখন বিনা বাধায় ঝিনাইদহ বা কুষ্টিয়ার দিকে ছুটে যেতে পারবে। এজন্য তিনি ঐ এলাকায় নিজে গেলেন যাতে সীমান্তে শত্রুদের যতটা সম্ভব দেরী করানো যায়। কিন্তু তার উপস্থিতি সত্ত্বেও, যুদ্ধের উদ্বোধনী দিনেই দর্শনার পতন হয়। ব্রিগেডিয়ার মনজুর সীমান্ত চৌকিগুলো থেকে তার ফৌজ সংগ্রহ করে শত্রুদের বরণ করার জন্য চুয়াডাঙ্গায় জড়ো করলেন।

কিন্তু শত্রুর অগ্রগতির প্রকৃত পথ নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সড়কে দেখা গেল না। সম্ভবত তারা ঝিনাইদহ-যশোর সড়ককে পাশ কাটানোর জন্য কালীগনীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল আর অন্য কলামটির সাথে যোগ দিয়েছিল যারা আফরা পথে আমাদের নিরাপত্তা ভেঙে ঢুকে গিয়েছিল। এজন্য ৯ ডিভিশনের কর্নেল স্টাফ, কর্নেল আফ্রিদির অধীনে ৩৮ এফএফ ও ৫০ পাঞ্জাব মাইনাস (অর্থাৎ ব্যাটেলিয়ন থেকে ছোট) নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হল, আর একে শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষা করার জন্য কালীগনীতে নিযুক্ত করা হল। আশ্চর্যজনকভাবে, শত্রুরা কালীগনীর দিকেও গেল না। বরং তারা মুক্তি বাহিনী, যারা এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি সম্পর্কে জানত, তাদের দেখানো রাস্তায় গ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল আর চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ সড়ককে পাশ কাটিয়ে সাধুহাটিতে গেল, যা চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত। ৪ঠা/৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাতের মধ্যে একটি পদাতিক কোম্পানী ও ট্যাংকের একটি বাহিনী এই স্থানে পৌঁছাল, কিন্তু পরদিন সকাল প্রায় ১০ টা পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার মনজুর তা আবিষ্কার করতে পারেননি, তিনি জানতে পারলেন যখন চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহ আসার পথে কিছু প্রশাসনিক বাহন এসে রোড ব্লকের সাথে ধাক্কা খেল।

ব্রিগেডিয়ার মনজুর আর চুয়াডাঙ্গায় তার সম্পূর্ণ বাহিনীর সামনে এখন দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, তিনি দ্রুত রোড ব্লকগুলো সরিয়ে তার ঝিনাইদহ নগরদুর্গ দখল করে থাকতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ডিভিশনের একটি শক্তিশালী স্থান চুয়াডাঙ্গায় অবস্থান



করে শত্রুর জন্য দুশ্চিন্তার উৎস হিসেবে থাকতে পারতেন ও শত্রুকে পূর্বদিকে সরে যাবার জন্য চাপ দিতে পারতেন। তিনি কোনটাই করলেন না। এর বদলে তিনি সাধুহাটিতে একটি নিরুৎসাহী প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি প্রথমে রোড ব্লকের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে একজন অফিসারকে পাঠালেন, এরপর সেটি সরাতে একটি দুর্বল বিচ্ছিন্ন সেনাদল পাঠালেন। অবশেষে, ৬ই ডিসেম্বর তিনি মেজর জাহিদের অধীনে একটি প্লাটুনকে নির্দেশ দিলেন শত্রুকে দমন করার জন্য, কিন্তু দ্রুতই তা ফিরিয়ে নিলেন, যখন জানলেন যে শত্রুরা এর মধ্যেই সেখানে একটি ব্যাটেলিয়ন ও ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন গড়ে তুলেছে। তিনি চিন্তা করে দেখলেন একটি পদাতিক প্লাটুনের জন্য এটি খুব বেশি গুরুদায়িত্ব হয়ে যায়।

সাধুহাটি রোড ব্লকের নিয়ন্ত্রণে যে ভারতীয় মেজর ছিলেন তিনি পরবর্তীতে মেজর জাহিদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, প্রথম চব্বিশ ঘন্টার জন্য, তার দুই পা ভয়ে কাঁপছিল আর তিনি তার উর্ধ্বতনদের অভিশাপ দিচ্ছিলেন যারা তাকে একটিমাত্র কোম্পানী দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই পাটি দাঁত - চুয়াডাঙ্গা আর ঝিনাইদহ - এর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সোভাগ্যক্রমে, পাকিস্তানীরা তার সামনে আসার আগেই ভারতীয় বাহিনী এসে তার শক্তিবৃদ্ধি করেছিল।

৬ই ডিসেম্বর ছিল ৯ ডিভিশনের দুই ব্রিগেডের জন্যই এক চরম দিন। এক সাব-সেক্টরে, ব্রিগেডিয়ার মনজুর তার ঝিনাইদহ যাবার রাস্তা পরিষ্কার করার শেষ আশাটুকু হারিয়ে ফেললেন, ওদিকে ব্রিগেডিয়ার হায়াত যশোর খালি করে দিলেন। জিওসি, যিনি মাগুরায় বেশির ভাগ সময় নামাজের পাটিতে বসে কাটাতেন, সন্ধ্যাবেলা মনজুরের ব্রিগেড মেজরকে ফোন দিয়ে বললেন, "জাফর, কী হচ্ছে?" সে জবাব দিল, "তেমন বিশেষ কিছু না।" "ঠিক আছে, আমার মনে হয় তোমাদের মাগুরায় ফিরে আসা উচিৎ। যশোরের এর মধ্যেই পতন হয়েছে। আফ্রিদিকেও ফিরে আসতে বল। এখানে এখন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার রক্ষা করার কিছু নেই।" কর্নেল আফ্রিদির বাহিনী ঐ রাতেই কালীগনী থেকে ঝিনাইদহ সরে এল আর পরদিন সকালে, কোনরকম যুদ্ধ ছাড়াই ঝিনাইদহ খালি করে দেয়া হল। সকাল ১১ টায় আমাদের শেষ বাহনটি এই 'নগরদুর্গ' ছেড়ে গেল। সন্ধ্যার পর শত্রুরা এটি দখল করে নিল।



ইতোমধ্যে, ব্রিগেডিয়ার মনজুর তার ব্রিগেড নিয়ে কুষ্টিয়ায় গঙ্গা (পদ্মা)-র উপর হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে গেলেন। তিনি ৮ই ডিসেম্বর দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যাওয়ার মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন আর তাড়াহুড়া করে তার ফৌজদের শহরের চারদিকে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত করলেন। ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে তার বাহিনী নিয়ে রেললাইন ধরে ঝিনাইদহ বা মাগুরার দিকে সরে যেতে বলা হল, কিন্তু তিনি দুটোতেই তার অপারগতা প্রকাশ করলেন। তিনি কুষ্টিয়াতে থাকাই পছন্দ করলেন। সেখানে তিনি ৮/৯-ই ডিসেম্বরের রাতটা কাটালেন। পরদিন সকালে, ঝিনাইদহের দিক থেকে তিনি শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হলেন। মনজুর শত্রুর মোকাবিলা করতে মেজর জাহিদের অধীনে ১৮ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী পাঠালেন, সাথে দিলেন মেজর শের-উর-রেহমানের অধীনে ট্যাংকের একটি আধা স্কোয়াড্রন। দুপুর ১ টায় যুদ্ধ শুরু হয়ে প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ চলল। পুরো যুদ্ধের সময়ে এটিই ছিল এই ব্রিগেডের লড়া প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে গেল। মেজর জাহিদ ও মেজর শের-উর-রেহমান দুজনেই সিতারা-ই-জুরাত জিতেছিলেন - যেটি ছিল মিলিটারী ক্রসের সমমানের ঈপ্সিত বীরত্বসুচক পুরস্কার। শত্রুরা সরে গেল, পেছনে পড়ে রইল তাদের হতাহতরা। শত্রুদের লাশগুলো, যার মধ্যে এক ভারতীয় জেনারেলের ছেলের লাশও ছিল, হতভাগা সড়কের উঁচু বেড়িবাধের দুই ঢালে আর ক্ষেতের মাঝে পড়ে রইল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের এম-২৪ ট্যাংকের নিচে চাপা পড়েছিল। পরবর্তীতে শত্রুরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল, 'মৃতদেহ বিকৃত করার' অভিযোগে মেজর শের ও মেজর জাহিদকে বন্দি করে নিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করে।

ব্রিগেডিয়ার মনজুর কুষ্টিয়াকে যতটা নিরাপদ ভেবেছিলেন দেখা গেল আসলে ততটা নয়। শত্রুর পালা এলে, তাদের আর্টিলারী ও বিমান বাহিনী তার প্রতিরক্ষাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিল যে তার কাছে জবাব দেয়ার মত আর কিছুই রইল না। নেহাইয়ের মত তিনি অসহায়ভাবে হাতুড়ির প্রতিটি ঘা খেতে থাকলেন। এটি বুঝতে তার এক দিনের বেশি সময় লাগল না যে কুষ্টিয়া প্রতিরক্ষা করার মত কোন জায়গা না। কিন্তু তিনি আর কোথায় যাবেন? কাছেই ছিল হার্ডিঞ্জ সেতু। এটি তাকে গঙ্গা পার করে ১৬ ডিভিশনের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ এলাকায় নিয়ে যেতে পারত। হয়ত সেখানে গিয়ে তিনি ঐ ডিভিশনে শক্তি যোগ করতে পারতেন।



ব্রিগেডিয়ার মনজুরের ব্রিগেড ১০/১১-ই ডিসেম্বরের রাতে কুষ্টিয়া ছাড়ল। বাহন, অস্ত্রশস্ত্র আর সদস্যদের বেশির ভাগই নিরাপদে পার হয়ে ১১ই ডিসেম্বর ১৬ ডিভিশনের এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর সকালে, ভারতীয় বিমান বাহিনী, যারা এতদিন সেতুটা বাদ রেখেছিল, হয়তো একে আস্ত দখল করার উদ্দেশ্যেই, এই ১,৭৯৫ মিটার সেতুর একটি স্প্যানে সরাসরি আঘাত হানল। এবার নদী পার হওয়াটা একটা সমস্যা হয়ে গেল।

অবস্থা আরও খারাপের দিকে নিতে, কুষ্টিয়ার জনগণের দেশপ্রেমিক অংশ তাদের ঘর-বাড়ি খালি করে, সরে যাওয়া পাকিস্তানী ফৌজকে অনুসরণ করল। তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে ভয়ংকরভাবে শেষ হয়ে যাবার আশংকা করছিল। তার চেয়ে পাকিস্তানী ফৌজের সাথে এক নিয়তি মেনে নেয়াই তারা পছন্দ করল। এই নারী, পুরুষ ও শিশুরা, যাদের অনেকেই তাদের মূল্যবান সম্পদ সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা মেজর রাঠোরের (প্রকৌশল) অগ্নিপরীক্ষার ভার আরও বাড়িয়ে দিল, যাদেরকে তার ফেরী পারাপার করা লাগছিল। এদের প্রতি তিনি দায়িত্ববোধ নিয়ে অনেক ঋণী ছিলেন, যেমনটা ছিলেন ব্রিগেডের ফৌজের প্রতি। তাই তিনি সারাদিন ধরে তাদের নিরাপদে পার করে দেয়ার জন্য পরিশ্রম করলেন। তার স্পষ্ট মনে পড়ে এক বৃদ্ধা মহিলার কথা, যিনি বাম হাতের নিচে তার সারা জীবনের সঞ্চয় বগলদাবা করে, ডান হাত দিয়ে ফেরীতে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। এক পাকিস্তানী সৈন্য তাকে সাহায্য করেছিল। তাকে দ্রুত নদীর ওপাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটিই ছিল ৯ ডিভিশনের জন্য ৫৭ ব্রিগেডের শেষ হবার চিহ্ন।

এভাবে আমাদের ৯ ডিভিশন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল: ১০৭ ব্রিগেডকে ধাওয়া করে খুলনায় নিয়ে যাওয়া হল আর ৫৭ ব্রিগেডকে ঠেলে গঙ্গার ওপাড়ে পাঠিয়ে দেয়া হল। জেনারেল আনসারীর কাছে যা বাকী ছিল তা হল ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আর ৫০ পাঞ্জাবের কিছু অংশ নিয়ে একটি দুর্বল বাহিনী। তাদেরকে প্রথমে মাগুরার কাছাকাছি, এরপর মধুমতী নদীর পূর্বতীরে নিযুক্ত করা হল। শত্রুরা তাদের অনুসরণ করেনি। তারা প্রথমে চেয়েছিল যাতে তীর থেকে আসা সকল হুমকী দূর করা যায়। আমাদের ৫৭ ব্রিগেডের গঙ্গা পার হয়ে যাবার দুই দিন পর, ভারতীয় ফৌজ আমাদের মধুমতী প্রতিরক্ষার উপর হামলা করল। আমাদের ফৌজ মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামনের দিকে তাদেরকে ব্যস্ত রেখে শত্রুরা পার হবার জন্য সুবিধাজনক জায়গা খুঁজছিল। রাতের বেলা, মুক্তি বাহিনী তাদের পথ দেখিয়ে প্রায় সাত কিলোমিটার উজানের দিকে পার হবার উপযুক্ত জায়গা দেখিয়ে



দিল যেখানে ভারতীয়রা নদীর উপর দিয়ে ঝুলন্ত সেতু ছুঁড়ে দিয়ে তীর থেকে আমাদের ফৌজের উপর হামলা করল। আঘাতে জর্জরিত ৩৮ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আর অনভিজ্ঞ ৫০ পাঞ্জাব বিচলিত হয়ে পড়ল। ১৫ই ডিসেম্বর, তাদেরকে মধুমতী থেকে প্রত্যাহার করে ফরিদপুরের পশ্চিমে পুনরায় নিযুক্ত করা হল, যেটি ছিল জেনারেল আনসারীর হেডকোয়ার্টারের নতুন অবস্থান। ১৬ই ডিসেম্বর তখনও তাদের শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, যখন ঢাকা থেকে 'যুদ্ধবিরতি'-র আদেশ এসে তাদের কাছে পৌঁছায়।



১৮শ অধ্যায়: উত্তরবঙ্গের পতন(১৬ ডিভিশন)

উত্তরবঙ্গের অরক্ষিত বিস্তীর্ণ এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল বিশালদেহী সাহসী এক জেনারেলের উপর। জেনারেল নজর হোসেন শাহ এপ্রিল থেকে সেখানে ছিলেন যখন বিদ্রোহ দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৬ ডিভিশন এসে পৌঁছায়। বিদ্রোহীদের ধাওয়া করতে করতে আর অভ্যুত্থানকারীদের সাথে লড়াই করতে করতে তিনি যুদ্ধের আগেই তার এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি চিনে ফেলেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ, যা দক্ষিণে পদ্মা আর পূর্বে যমুনা দিয়ে ঘেরা, এটি ছিল প্রতিরক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি ডিভিশনকে ডেকে পাঠানোর জন্য সবচেয়ে বড় এলাকা। এখানে ছিল পশ্চিম সীমান্তের উত্তর অর্ধাংশ আর উত্তর সীমান্তের পশ্চিম অর্ধাংশ। অঞ্চলটি সাধারণভাবে শুষ্ক ছিল - প্রদেশের বাকী অংশের চেয়ে শুষ্ক। এজন্য একমাত্র ট্যাংক রেজিমেন্ট, ২৯ ক্যাভালরিকে, এখানে নিযুক্ত করা হয়। এখানকার একমাত্র জলীয় বাধা ছিল তিস্তা নদী, যা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে চলছিল আর পাটগ্রাম, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটকে আলাদা একটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করেছিল। রেল ও সড়ক যোগাযোগ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর গিয়েছিল: রেলপথ সীমান্তের কাছাকাছি আর সড়ক প্রায় মাঝখান দিয়ে। যেহেতু দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত পুরোটা জুড়ে ট্রেন চালানো সম্ভব ছিল না, ডিভিশনের সব ধরণের সরবরাহ সীমান্ত থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরের ১০৩-কিলোমিটার বগুড়া-রংপুর সড়ক দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

এই সেক্টরে শত্রুর উদ্দেশ্য কী হতে পারে? তারা কি জলস্রোতের মত শিলিগুড়ি থেকে বগুড়ায় ধেয়ে আসবে, আর পথের সকল বাধা ধুয়ে মুছে দিবে? না কি তারা হিলি-চিলমারী পথকে পাশ কাটাতে একটা জোর ধাক্কা দিবে? উভয় ক্ষেত্রেই, তারা 'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে এলাকার এক বিশাল খন্ড স্বাধীন করে ফেলবে'। এজন্য এ অনুযায়ী ডিভিশন তার শক্তি বিন্যাস করল। তারা ২০৫ ব্রিগেডের (তাজাম্মুল) একটি অংশ হিসেবে এর ক্র্যাক ব্যাটেলিয়নগুলোর একটি, ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে হিলিতে নিযুক্ত করল যার হেডকোয়ার্টার ছিল বগুড়ায়। উত্তরের প্রবেশপথগুলোর দায়িত্ব ২৩ ব্রিগেডের (আনসারী) উপর ন্যস্ত করা হল যার হেডকোয়ার্টার ছিল রংপুরে। তৃতীয় ব্রিগেডটি (৩৪ ব্রিগেড) ব্রিগেডিয়ার নাঈমের অধীনে নাটোরে রাখা হল, আর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে তৈরি করা অ্যাড হক ব্রিগেডকে



দক্ষিণে রাজশাহীতে নিযুক্ত করা হল যাতে পদ্মা দিয়ে আসা নদীপথের যে কোন আক্রমণ ঠেকাতে পারে।

২৯ ক্যাভালরির বিরল জিনিস ছিল ট্যাংক, যেগুলোকে তিনটি ব্রিগেডের সবগুলোতে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ২৩ ব্রিগেড তার ভাগের একটি স্কোয়াড্রনকে বোদা-ঠাকুরগাঁও পথে নিযুক্ত করল, আর ২০৫ ব্রিগেড তাদেরকে ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাথে নওগাঁ এলাকায় রাখল যাতে পার্শ্ববর্তী বালুরঘাট এলাকায় আক্রমণাত্মক দায়িত্ব পালন করতে পারে। ৩৪ ব্রিগেড তার ভাগের একটি স্কোয়াড্রনকে হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে বসালো। এই স্কোয়াড্রনটি ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল স্টাফ রিজার্ভেরও একটি অংশ, এটি শুধুমাত্র ইস্টার্ন কমান্ডের অনুমতিতেই ব্যবহার করা যাবে। কুষ্টিয়ার কাছে ব্রিগেডিয়ার মনজুরের (৫৭ ব্রিগেড) যুদ্ধে যে ট্যাংকগুলো ধার দেয়া হয়েছিল এগুলো সেই একই ট্যাংক। রেজিমেন্টের চতুর্থ স্কোয়াড্রনকে আরও ছোট ছোট 'ট্রুপস'-এ ভাগ করে অন্যান্য দলে ভাগ করে দেয়া হল।

এম-২৪ ট্যাংকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মহিমাময় অতীত নিয়ে দম্ভ ছিল। এমনটা দাবী করা হত যে তারা কোরিয়ার যুদ্ধে (১৯৫১) লড়াই করেছে। এদের কামানের খাঁজগুলো সাধারণত ভাঙা-চোরা ছিল, যার ফলে এদের রেঞ্জ সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা ১০০০ মিটারের বাইরের লক্ষ্যকে আওতায় আনতে পারত না বললেই চলে। এদের বিরুদ্ধে লড়তে, ভারতের কাছে ছিল অত্যাধুনিক ট্যাংক। রাশিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া তাদের 'টি' সিরিজ (টি-৫৫, টি-৫৬) ভারত বা পাকিস্তানের যে কোন ট্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন ছিল। ভারতের নিজস্ব ট্যাংক (বিজয়ন্ত) এই আমদানীকৃত ট্যাংকের আক্রমণশক্তির সম্পূরক হিসেবে কাজ করছিল। স্পষ্টতই এটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ।

এই সেক্টরের প্রকৃত যুদ্ধে প্রবেশ করার আগে, চলুন আমরা সংক্ষেপে জরিপ করে দেখি ৩রা ডিসেম্বর এখানকার পরিস্থিতি কেমন ছিল। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর থেকেই ভারত হিলির দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল। তারা সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্টিলারীর পূর্ণ সম্ভার নিয়ে ২০ ডিভিশনকে নিযুক্ত করেছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ গোলাবর্ষণ ও মর্টার ছোঁড়া ছিল রোজকার ঘটনা, সেই সাথে মাঝে মাঝে এলাকা দখলের চেষ্টাও ছিল। কিন্তু বীর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এ সময় শুধু তাদের সব চাপ সহ্যই করেনি, বরং শত্রুর রেললাইন



পার করার বেশ কিছু চেষ্টাও হামলা করে ঠেকিয়েছে, এই রেললাইন দুই বিরোধী বাহিনীর মাঝখানে নো ম্যান'স ল্যান্ড হিসেবে কাজ করছিল।

২১শে নভেম্বর ভারত যখন 'প্রকৃত যুদ্ধ' শুরু করল তখন থেকেই তাদের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেল। তাদের ৭ গার্ড হিলি ও তার পার্শ্ববর্তী কাসিম, বাবর, নবপাড়া ও আপ্তর চৌকিগুলোতে আক্রমণ করল। শত্রুর ফৌজ, আর্টিলারী ও ট্যাংক নিয়ে প্রধান হিলি প্রতিরক্ষার প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তরে কাসিম চৌকি ছারখার করে দিতে পারল। সেখানে আমাদের প্লাটুনে দশজন নিহত ও বারোজন আহত হল, তরুণ কমান্ডিং অফিসারসহ। সেখান থেকে শত্রুরা রেললাইনের পূর্বদিকে বাবর চৌকিতে আক্রমণের চেষ্টা চালাল, কিন্তু এই কাজে চরমভাবে নাকাল হল। তাদের তিনটি ট্যাংকের মাত্র একটি রেলওয়ে বেড়িবাঁধের পূর্বদিক বেয়ে উঠতে পারল। এটিও আমাদের রিকয়েললেস রাইফেলের আওতায় ধরা পড়ে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। শত্রুরা এই স্পষ্ট আগ্রাসনের প্রমাণটিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তা করতে গিয়ে শুধু আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি ভুগল। ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংকটি বেশ কিছুদিন সেখানে পড়ে রয়েছিল। এটিই ছিল ভারতীয় আগ্রাসনের সেই প্রমাণ যেটি আমরা ২৭শে নভেম্বর বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধিদের দেখাতে চেয়েছিলাম, যখন তারা চিকেন টিক্কা-র থালা সামনে নিয়ে বসা জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল।

শত্রুরা বাবর চৌকিতে তাদের চাপ ধরে রাখলেও তা দখল করতে পারছিল না। দ্রুতই ফ্রন্টিয়ার ফোর্স উপলব্ধি করতে পারল যে এই চৌকির প্লাটুন এই চাপ আর সহ্য করতে পারবে না। তাই তাদেরকে সরিয়ে আনা হল। পরবর্তীতে শত্রুরা কোন বাধা ছাড়াই এটি দখল করে নিল। এটি তাদেরকে রেললাইনের পূর্বদিকে তাদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে পোক্ত করতে সাহায্য করল।

আমরাও আমাদের প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করলাম। কোর রিজার্ভ (হার্ডিঞ্জ সেতু) থেকে ট্যাংকের একটি ট্রুপ ধার করা হল আর একে ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের 'ডি' কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার দাঙ্গাপাড়ায় নিযুক্ত করা হল। রিকনেসেন্স এন্ড সাপোর্ট ব্যাটেলিয়নের (৩৪ পাঞ্জাব) একটি প্লাটুনকে এর রিকয়েললেস রাইফেলসহ একটু উত্তরের দিকে বসানো হল। বাবর চৌকি থেকে প্রত্যাহার করে আনা ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্লাটুনটি পুনর্গঠিত করে অন্যান্য ট্রুপের কাছাকাছি পুনরায় নিযুক্ত করা হল। আমরা এখন নিজেদেরকে বাবর



চৌকিতে পাল্টা আক্রমণ হানার মত যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করছিলাম, কিন্তু শত্রুরা এর মধ্যেই দৃঢ়ভাবে এটি দখল করে ফেলেছিল, আমরা তাদেরকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হলাম। বিকল্প হিসেবে আমরা শত্রুদের দমন করতে তিনটি কোম্পানী নিযুক্ত করলাম। আমাদের দুটি কোম্পানী যখন বাবর চৌকির দক্ষিণ ও পুর্ব দিক ঘেরাও করে রাখছিল, তখন মেজর আকরাম তার 'সি' কোম্পানী নিয়ে রেলওয়ে বেড়িবাঁধের পশ্চিমে থাকা শ্রেয় মনে করলেন। মেজর আকরামের এই পজিশন শত্রুর পক্ষে শুধুমাত্র তীব্র যন্ত্রণাদায়কই ছিল না, বরং এটি বাঁধ বরাবর তাদের চলাচলের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বেশ কয়েকবার 'সি' কোম্পানীর পজিশনকে ছারখার করার চেষ্টা চালালেও সফল হতে পারেনি। এই ছিল ৩রা ডিসেম্বরের পরিস্থিতি।

এদিকে উত্তর সীমান্তে, শত্রুর জন্য মূল দুশ্চিন্তা ছিল পঁচিশ-কিলোমিটার-চওড়া শিলিগুড়ি খাত (চীনের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত থেকে মাত্র সত্তর কিলোমিটার দূরে), এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ/বিহার ও আসাম/ত্রিপুরা এলাকার মাঝে একমাত্র সংযোগ। ভারতীয় মিলিটারী কমান্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, যারা পূর্বে অবস্থান করছিল, এই খাত দিয়েই তাদের সরবরাহ দেয়া হত। এজন্য তারা এই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের পথটি সম্ভাব্য যে কোন আক্রমণ থেকে শুধু রক্ষাই করেনি, বরং আমাদের তেঁতুলিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকা দখল করে এই খাতকে বাড়িয়ে পঞ্চান্ন কিলোমিটার করে ফেলেছিল। ২৮/২৯শে নভেম্বরের রাতে তারা পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও পথে আমাদের প্রতিরক্ষাকেও পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী দুই দিনে তারা বোদা এলাকা দখল করে ঠাকুরগাঁও-এর উত্তর সীমান্তে পৌঁছে গেল। ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে তারা এতদূর পর্যন্তই দখল করেছিল।

যুদ্ধের আগে তারা পাটগ্রাম ও ভুরুঙ্গামারীর কিছু এলাকাও দখল করে ফেলল যাতে এসব এলাকার উত্তরে তাদের যোগাযোগের পথ সুরক্ষা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই এলাকাগুলোতে তাদের সাফল্য এত দৃঢ় ছিল যে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম তারা ভুরুঙ্গামারীর বিহার-আসাম রেললাইন দিয়ে আবার আক্রমণ করবে, যেটি পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে অব্যবহৃত পড়ে ছিল। আমরা তাদের এই রেললাইনের ব্যবহার ঠেকাতে ঐ এলাকাগুলোতেই তাদের সাফল্যকে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে, আমাদেরকে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারল, যেগুলো ছিল এই এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রেল স্টেশন। লালমনিরহাটে



হালকা বিমানের জন্য একটি এয়ারস্ট্রিপও ছিল। চিলমারি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জড়ো হওয়া রাজাকার ও ইপিসিএএফ-দের ৩রা ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে সরিয়ে নেয়া হয়।

যখন পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হল, আইএএফ কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে বিনা বাধায় আঘাত হেনে গেল। আগেও এই দুই শহরের বেশ কয়েকবার ভারতীয় জেটের সাময়িক আক্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিন্তু তারা আগে কখনই এতটা রোষ ঢেলে দেয়নি যেমনটা দিয়েছিল ৪ঠা ডিসেম্বরে। এজন্য জিওসি কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে আমাদের ফৌজদের নির্দেশ দিলেন যাতে তিস্তা নদী পার হয়ে এপাড়ে চলে আসে আর সেতুটি উড়িয়ে দেয়। এই প্রত্যাহার ৪ঠা/৫ই ডিসেম্বরের রাত থেকে শুরু হয়ে পরদিন পর্যন্ত চলতে থাকল।

জনগণের দেশপ্রেমিক অংশও তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে, সরে আসা ফৌজের সাথে যোগ দেয়। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রেনে ওঠে যেটি আমাদের লোকদের রংপুরে নিয়ে আসে। যে মেজর এই এলাকায় পাকিস্তানীদের চালানো শেষ ট্রেনটির দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এই যাত্রার স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারেননি। এই যাত্রা নিয়ে তার বর্ণনা ছিল মোটামুটিভাবে এরকম: "ট্রেন ভর্তি বেসামরিক লোকজন ছিল, যাদের বেশির ভাগ কোঁকাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। ফৌজরা জানালার পাশে বন্দুকের নল বাইরে বের করে বসে তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল। শেষ বগিটিতে ছিল পুরোটাই সমান মেঝে, সেখানে দুই পাশে বালুর বস্তা স্তূপ করে মর্টার পজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিদ্রোহীরা যারা ট্রেনে গুলি করছিল তাদেরকে ভয় দেখিয়ে সরানোর জন্য আমরা কিছু মর্টার শেল নিক্ষেপ করছিলাম আর সেই সাথে লাইট মেশিন গানও চালাচ্ছিলাম। আমরা যখনই কোন অসহায় রাজাকার বা বেসামরিক লোকজন তুলে নেয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছিলাম তখনই মেশিন গানের সাথে সাথে মর্টারের গোলার শিকার হচ্ছিলাম। আমরা যখন তিস্তা সেতু পার হতে যাব, একটু দূরে একদল রাজাকার দেখা গেল। আমরা থেমে তাদেরকে ট্রেনে ওঠার জন্য ডাকলাম। কিন্তু তারা সামান্যও নড়ল না। যেই আমরা পার হয়ে দেশের দিকে চলে গিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দিলাম, তারা উল্লাসে হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, 'জয় বাংলা'। তারা ছিল মুক্তি বাহিনী, যারা রাজাকার সেজে আমাদের দলে ঢুকে শত্রুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে।"



আমাদের সকল ফৌজ ৫/৬-ই ডিসেম্বরের রাতে রংপুরে ফিরে এসেছিল। ডোমার পথে নিযুক্ত আমাদের বিচ্ছিন্ন দলগুলোও একই রাতে সৈয়দপুরে সরে এসেছিল। একদিন আগে, ঠাকুরগাঁও-এর পতন হয়েছিল, আর সেখানে আমাদের গ্যারিসন দিনাজপুরের উত্তরে মন্ডলপাড়ায় তাদের বিকল্প পজিশন নিয়েছিল। ৬ই ডিসেম্বর, মন্ডলপাড়া-সৈয়দপুর পথে একটি নতুন প্রতিরক্ষা সীমা তৈরি হল। এই পথের ঠিক পিছনেই ছিল দিনাজপুর-রংপুর সীমা। এই সীমাটিকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য ২৩ ব্রিগেড ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্ববোধ করতে পারে, তবে চিন্তার বিষয় ছিলো যে শত্রুর কাছে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা বের করে নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা আসলেই উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে সবচেয়ে বড় রাস্তাটি অনুসরণ করার কষ্টটুকু করত কি না।

৪ঠা ডিসেম্বর আমাদের প্লাটুনের পজিশন ছারখার করে দেয়ার পর, শত্রুরা হিলি থেকে এগারো কিলোমিটার উত্তরে, চিরাই-এর কাছ দিয়ে প্রতিরোধ ভেঙে সেই সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল। চিরাই মূলত ফৌজের একটি কোম্পানীর দখলে ছিল, কিন্তু নভেম্বরের শেষে কাসিম চৌকির ঘটনার পর এখানকার পজিশনকে হালকা করে অন্যান্য জায়গায় ঘাটতিগুলো পূরণ করা হয়েছিল। এই এলাকা থেকে কোন হুমকীর আশংকা করা হয়নি কারণ এটি ছিল বিল (জলাবদ্ধ হ্রদ) আর নালা (সরু জলস্রোত) দিয়ে পূর্ণ আর ট্যাংক পরিচালনার জন্য সবচেয়ে অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছিল। তার উপর, এমন কোন প্রধান রাস্তাও ছিল না যা শত্রুরা আক্রমণের প্রবেশ পথ হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। তারপরও, এই 'সবচেয়ে অনুপযুক্ত' রাস্তাটিই শত্রুরা গ্রহণ করল। মুক্তি বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ও দেখানো রাস্তায় গিয়ে শত্রুর ট্যাংক ও পদাতিক কলাম চিরাই চৌকি ছারখার করে দিয়ে পূর্বের দিকে যাওয়া শুরু করল।

যখন এই বার্তাটি উপরের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছানো হল, স্টাফ অফিসার রেগে গিয়ে প্লাটুন কমান্ডারকে বললেন, "আজগুবি কল্পনা করা ছাড়ো। এতগুলো বিল, ডোবা আর মাইনের উপর দিয়ে ট্যাংক আসে কিভাবে? তুমি নিশ্চয়ই মহিষ দেখেছ।" তরুণ ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, "আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন স্যার। তবে আমি শপথ করে বলছি যে মহিষগুলোর মাথায় ১০০ এমএম বন্দুক লাগানো আছে আর তারা একে একে আমাদের বাংকারগুলো উপড়ে ফেলছে।"



শত্রুরা যদিও চিরাইয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে দিয়েছিল, তারা রংপুর-বগুড়া সড়কে গায়ের জোরে ঢুকতে পারেনি যতক্ষণ না দক্ষিণ পাশে মেজর আকরামের কোম্পানীকে নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছে। এজন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর দুটি কলাম এসে মেজর আকরামের পজিশনের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু মেজর আকরাম দুই দিকেই পাল্টা আঘাত হানেন ও দুই দিন অবস্থান ধরে রাখেন। ৬ই ডিসেম্বর এল। স্পষ্টতই শত্রুরা এই জেদি বাধাকে ঝেটিয়ে পাশে সরিয়ে দেয়ার তাড়ায় ছিল। মেজর আকরামের উপর সম্পূর্ণ শক্তিপ্রয়োগ সত্ত্বেও, তিনি ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও আটচল্লিশ ঘন্টা তার অবস্থান ধরে রাখলেন। এতদিনে 'সি' কোম্পানী এর মধ্যেই তার প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তার তেজস্বীতা প্রমাণ করে দিয়েছিল। মেজর আকরাম এক পরিখা থেকে আরেক পরিখায় গিয়ে তার সেনাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন যারা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়ে ছিল। এই যাওয়া-আসার এক পর্যায়ে ট্যাংকের একটি শেল তাকে আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। এটি তার বীর সৈনিকদের জন্য একটি বড় ধরণের আঘাত ছিল। শত্রুরা উত্তর দিকের সাথে সাথে দক্ষিণ দিক থেকেও আবার আক্রমণ করল, প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটল। 'সি' কোম্পানীর মাত্র চল্লিশজন সদস্য বাঁচতে পেরেছিল, আর তারা সরে এসে ব্যাটেলিয়নের বাকীদের সাথে যোগ দিল। (শহীদ) মেজর আকরামকে মরণোত্তর নিশান-ই-হায়দার প্রদান করা হয়, এটি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পুরস্কার।

মেজর আকরামের প্রতিরক্ষার উপর যখন শত্রুর মূল আক্রমণ চালানো হচ্ছিল, তখন দুর্গাপুর রেল স্টেশন দিয়ে হালকা অস্ত্র ও পদাতিক বাহিনীর একটি কলাম পূর্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা ৭ই ডিসেম্বর বগুড়া-রংপুর সড়কে পীরগঞ্জে আঘাত হানে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ অগোচরে।

সেই বিকেলেই, মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ সড়কপথে রংপুর থেকে বগুড়া ফিরছিলেন। তার সাথে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল ও কয়েকজন স্টাফ অফিসার। পীরগঞ্জের বাঁকে রাস্তা মোড় ঘোরার সাথে সাথে তারা শত্রুর গোলাবর্ষণের মুখে পড়লেন। তাদের গাড়ি খালি করে দিয়ে তারা তাড়াতাড়ি গাছের ফাঁকে গিয়ে লুকালেন। জিওসি পরে আনন্দের সাথে আমাকে বলেন যে "আমার ৫০০ মিটার দূরে শত্রুর ট্যাংক দেখতে পেয়েছিলাম"। তাকে ও তার দলকে খোদাভীরু এক বাঙালী সাহায্য করেছিল, সে তাদেরকে এক নিরাপদ পথ দেখিয়ে দিয়েছিল যে পথ তাদেরকে রংপুরের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।



মেজর জেনারেল নজরের জীপে একটি দুই-তারকা প্লেট ছিল। এর উল্টো দিকে তিন-তারকা খচিত ছিল যাতে জেনারেল নিয়াজীর সফরের জন্য এই একই প্লেট ব্যবহার করা যায়। এক ভারতীয় সৈন্য যখন প্লেটটি খুলে তার অফিসারের কাছে নিয়ে যায়, তখন তারা এই নিয়ে উল্লাস করতে থাকে যে তারা একজন তিন-তারকা জেনারেল - স্বয়ং জেনারেল নিয়াজীকে অ্যামবুশ করেছে। তারা এটা জানতই না যে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তিনি ঢাকার বাইরে যাওয়ার সাহস করেননি।

৭/৮-ই ডিসেম্বরের রাতে যখন পীরগঞ্জ ঘটনার খবর ঢাকায় এসে পৌঁছায়, আমি তখন জেনারেল নিয়াজীর হেডকোয়ার্টারের অপারেশনস রুমে ছিলাম। তখন পর্যন্ত জিওসি-কে পাওয়া যাচ্ছিল না, ধরে নেয়া হয়েছিল তিনি ধরা পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ, ইপিসিএএফ-এর মহাপরিচালক ও ৩৯ অ্যাড হক ডিভিশনের জিওসি, মেজর-জেনারেল জামশেদকে জেনারেল নজরের দায়িত্ব নেয়ার জন্য পাঠানো হল। দুই ঘন্টা পর ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে তিনি ফিরে এলেন। তার হেলিকপ্টার রাতের বেলা ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার খুঁজে বের করতে পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে, ততক্ষণে জেনারেল নজর সেখানে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

১৬ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার, তাদের জিওসি-র জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও, তাদের মূল যোগাযোগের রাস্তায় শত্রুর উপস্থিতি আবিষ্কার করে ফেলল। এর মানে এই দাঁড়ায় যে ডিভিশন বিভক্ত হয়ে যাবে - আর ডিভিশন বিভক্ত হওয়া মানে হল ডিভিশন ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এজন্য জিওসি নির্দেশ দিলেন যে তৎক্ষণাৎ টাস্ক ফোর্স 'এ' এবং টাস্ক ফোর্স 'বি' গঠন করে উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে পাঠানো হোক যাতে পীরগঞ্জে শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারে। ব্রিগেডিয়ার নাঈম যিনি যুদ্ধের শুরু থেকে রংপুরে আটকে ছিলেন তার উপর উত্তরাঞ্চলীয় টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ল আর ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুলকে দক্ষিণ থেকে আসা কলামের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হল। প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে গেল, কিন্তু 'কাঁচির দুই ফলা' খচ করে একত্র হতে ব্যর্থ হল। শত্রুরা এই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে একটি ব্রিগেড ও ট্যাংকের একটি রেজিমেন্ট তৈরি করে ফেলল।

৭ই ডিসেম্বরের ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল যখন বগুড়ায় তার হেডকোয়ার্টারে এলেন ,তিনি ডিভিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবহেলা করার জন্য ৩২ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতানকে তিরস্কার করলেন। কর্নেল ছিলেন



একজন দায়িত্ববান অফিসার, তিনি একে এত গুরুত্বের সাথে নিলেন যে সাথে সাথে তার ব্যাটেলিয়ন নিয়ে শত্রুকে শেষ করে দিতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি শত্রুদের কাছ থেকে একটু দূরে তার ফৌজদের ট্রাক থেকে নামিয়ে রাতের বেলা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু তার জানা ছিল না যে, শত্রুরা এদিকে আরও দক্ষিণে পলাশবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে ফেলেছিল। পূর্বে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে গিয়ে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান আক্ষরিক অর্থে শত্রুর প্রতিরক্ষা সীমার উপর হোঁচট খেলেন। অগ্রসর হওয়া কোম্পানীটি কচুকাটা হল আর স্বয়ং লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান নিহত হলেন। চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে ভীত ৩২ বালুচ পেছনে সরে এল। ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল শত্রুর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠেকাতে ৮ বালুচ, ৩২ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী আর কিছু ফিল্ড গান দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করে একটি বাহিনী পাঠালেন।

বগুড়া-রংপুর সড়কের পীরগঞ্জ-পলাশবাড়ি অংশে শত্রুর উপস্থিতি ২০৫ ব্রিগেডের (ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল) সীমানা প্রতিরক্ষাকে বিচলিত করে তুলেছিল। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বদিকে ছড়িয়ে দেয়া আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে এনে বগুড়ায় মুঠি পাকানো হচ্ছিল। একই প্রক্রিয়ায়, হিলি প্রতিরক্ষা থেকে ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। পূর্বদিকের ফুলছড়িঘাট, বোনাপাড়া আর গোবিন্দগঞ্জের ছোট ছোট চৌকিগুলোও খালি করে দেয়া হয়েছিল।

এবার ১৬ ডিভিশনকে চূড়ান্তভাবে বিভক্ত করা হল। এর ২৩ ব্রিগেডকে ছেঁটে রংপুর-দিনাজপুর পথে দেয়া হল আর ২০৫ ব্রিগেডকে বগুড়ায় ঠেলে নেয়া হল। এই দুই ব্রিগেডের মধ্যে যোগাযোগের সকল আশা চূর্ণ হয়ে গেল। প্রতিটি ব্রিগেডকেই এখন তাদের নিজেদের জীবনের জন্য লড়াই করতে হবে।

যেহেতু শত্রুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগের কেন্দ্র বগুড়া দখল করা, ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুলের ব্রিগেডকেই তাই মূল চাপ সৃষ্টি করতে হত। তিনি বগুড়া থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার উত্তরে, মহাস্থানে শত্রুদের দেরি করানোর চেষ্টা করলেন। ভারতীয়রা, আমাদের প্রতিরোধ এড়াতে মূল সড়কের দুই পাশ দিয়ে মুক্তি বাহিনীর দেখানো রাস্তায় লম্বা ঘুরপথে গিয়ে পাশ থেকে আমদের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে আঘাত হানল। তারা চারপাশে মানুষ আর যানবাহন দিয়ে ব্যূহ তৈরি করে দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের



প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ শুরু করল। উত্তর দিকে মুখ করে থাকা আমাদের ফৌজ, ঘুরে দাঁড়াতেও পারছিল না, কারণ তাদেরকে সামনের দিকেও ব্যস্ত রাখা হয়েছিল।

৩২ পাঞ্জাবের কোম্পানী কমান্ডার, মেজর সাজিদ, মূল সড়কের পূর্ব দিকে ছিলেন। শত্রুরা দক্ষিণ থেকে এগিয়ে এসে তাকে আটক করল, তার সৈন্যরা উত্তর দিক থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। সাজিদের দলের হাবিলদার হুকুমদাদ শত্রুর উত্তর থেকে দক্ষিণে সংযোগ স্থাপনের তিনটি প্রচেষ্টা সফলভাবে ভেস্তে দিল। হুকুমদাদের পরিখার সামনে দিয়ে যাওয়া শত্রুর প্রতিটি দলকে একজন বা দুজন মৃত ফেলে রেখে ফিরে যেতে হচ্ছিল। ভারতীয় মেজর তার বন্দী মেজর সাজিদকে নির্দেশ দিলেন, "এই উন্মাদ লোকটাকে থামাও, নইলে আমরা তার পজিশনে আঘাত করব।" সাজিদকে নির্লিপ্ত থাকতে দেখে, ভারতীয় এক বিচ্ছিন্ন দল হুকুমদাদের পজিশনের উপর আক্রমণ করল। পরিখায় একা বসে, সে ঠিক আক্রমণকারী ফৌজের উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকল। তাদের তিনজন তার হাতে নিহত হল। বাকীরা ঝুঁকে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল।

এতে ভারতীয় মেজর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, সাজিদের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন যাতে 'ঐ উন্মাদ লোকটাকে' থামায়। সাজিদ নির্দেশ পালন করলেন। তিনি চিৎকার করে হুকুমদাদকে বললেন, "থামো হুকুমদাদ, থামো!" সে জবাব দিল, "সাহেব, আপনি মনে হয় আপনার গুলি শেষ করে ফেলেছেন কিন্তু আমার কাছে এখনও দুটি ম্যাগাজিন আছে। চিন্তা করবেন না, এটুকুই যথেষ্ট।" (এই কথাটি স্পষ্ট পাঞ্জাবী ভাষায় বলা হয়েছিল: সাব, আপনা অ্যামনিশন মুকায় ব্যাতে ও, পার মেরে কাল দো ম্যাগাজিন হ্যায়। মেরি ফিকার না কারো।) ভারতীয়দের অবশেষে চড়া মূল্য দিয়ে তাকে তার পরিখায় হত্যা করতে হল।

১২ই ডিসেম্বর আমরা মহাস্থানে আমাদের প্রতিরক্ষা ছেড়ে এসে বগুড়া নগরদুর্গের বাইরের সীমানায় এলাম। ২০৫ ব্রিগেডকে এবার শহরের চারদিক ঘিরে বসানো হল। শত্রুর বিমান ও আর্টিলারী পর্যায়ক্রমে এই এলাকায় আঘাত হানতে থাকল। বোমা, রকেট আর শেল ছাড়াও ইঁটের দালানের টুকরোগুলোও মারাত্মকভাবে শরীরে বিঁধতে থাকল। আহতদের তুলে এনে কাছের একটি দালানে গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছিল। ১৩/১৪-ই ডিসেম্বরের রাতে ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নতুন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সরফরাজ একটি পাকা দালানের বারান্দায় পিছলে পড়ে গেলেন। তিনি টর্চ জ্বেলে দেখলেন



একটি দরজার নিচ দিয়ে তাজা রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। দরজা খুলে আবিষ্কার করলেন এক গাদা আহত সৈনিক অন্ধকারে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছে।

ইতোমধ্যেই ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারটি আরও দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে নিয়ে নাটোরে সরানো হয়েছিল। বগুড়াকে ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুলের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল আর তিনি তিন দিন তিন রাত ধরে শত্রুর প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর সকালবেলা বগুড়ায় চাপের মুখে থাকা শত্রুরা ঘোষণা দিল যে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয়েছেন। তারা আমাদের ফৌজকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য আহ্বান করল। আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের কয়েকজন সাদা পতাকা হাতে শত্রুর চৌকির দিকে হাঁটা শুরু করল। ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল যখন তা জানতে পারলেন, তিনি এই কুলাঙ্গারদের অভিশাপ দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করলেন। একটু পরেই, ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার থেকে তিনি নির্দেশ পেলেন: "যুদ্ধ বন্ধ কর।" তার ফৌজরা যেখানে ছিল সেখানেই তাদেরকে ফেলে রেখে তিনি বগুড়া থেকে বেরিয়ে গেলেন। শহর থেকে বের হতে না হতেই মুক্তি বাহিনী তাকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। একটি ভাঙা হাত নিয়ে তিনি তার কমান্ডের কাছে ফিরলেন, একজন যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতের আতিথেয়তার ভাগ নিতে।



১৯শ অধ্যায়: ভাঙন (১৪ ডিভিশন)

পূর্ব সীমান্ত ছিল ঘোড়ার জিনের আকারের। দুই প্রান্তের দুই কুঁজ - উত্তরে সিলেট আর দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রাম - অপারেশনের দিক থেকে চিন্তা করলে তেমন স্পর্শকাতর এলাকা ছিল না। এই দুই প্রান্তের কোন একটি, বা উভয়টিই যদি হারাতে হয় তাতেও ঢাকার জন্য হুমকীস্বরূপ হবে না। এজন্য ইস্টার্ন কমান্ড, মাঝখানের খাঁজটুকুর প্রতিরক্ষা নিয়েই মূলত উদ্বিগ্ন ছিল। এই অনুযায়ী তারা ফেনী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি করে ব্রিগেড বসাল যাতে এই তিনটি সম্ভাব্য প্রবেশ পথকে রক্ষা করতে পারে, শত্রুরা এগুলোকে ঢাকার উপর আক্রমণের পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সীমান্তের বাকি অংশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাহিনীগুলোর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

এই সীমান্তের উত্তর অর্ধাংশের দায়িত্বে ছিল ১৪ ডিভিশন। তাদের এলাকা ছিল কুমিল্লার উত্তরে সালদা নদী থেকে সিলেট জেলা পর্যন্ত। তাদের তিনটি ব্রিগেড ছিল যাদের মিলিত শক্তি কোনমতে ভারতের একটি ব্রিগেডের সমান হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী ব্রিগেডটির (২৭) ছিল আড়াইটি ব্যাটেলিয়ন, আর অন্য দুটির (২০২ এবং ৩১৩) যথাক্রমে একটি ও দুইটি করে পদাতিক ব্যাটেলিয়ন।

ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহর অধীনে ২৭ ব্রিগেডকে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ভৈরববাজার পথে নিযুক্ত করা হয়েছিল, আর ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর অধীনে ২০২ অ্যাড হক ব্রিগেডকে বসানো হয়েছিল সিলেটে। ৩১৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানার হেডকোয়ার্টার ছিল আখাউড়া ও সিলেটের মাঝামাঝি মৌলভীবাজারে। তিনি যুদ্ধকে আমাদের পক্ষে আনতে উত্তর বা দক্ষিণদিকে তার শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন। কিংবা জেনারেল নিয়াজী পরে আমাকে যেমনটা বলেছিলেন, তার তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য হিসেবে তাকে আগরতলা নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যেত।

১৪ ডিভিশনের প্রতিরক্ষা সীমানার পিছন দিয়ে বয়ে চলছিল বিশাল মেঘনা নদী যা ঢাকার জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষার কাজ করছিল। শত্রুকে ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছাতে প্রথমে ১৪ ব্যাটেলিয়ন, বিশেষ করে এর ২৭ ব্রিগেডের মনুষ্যসৃষ্ট বাধা নিষ্ক্রিয় করতে হত, আর তারপর বিশাল জলীয় বাধা অতিক্রম করতে হত। তাদের সবচেয়ে সম্ভাব্য প্রবেশপথ ছিল



আখাউড়া-ভৈরববাজার পথ যেখানে ছিল জিওসি মেজর-জেনারেল আব্দুল মজিদ কাজীর ট্যাক্টিকাল হেডকোয়ার্টার আর সেই সাথে ২৭ ব্রিগেডেরও হেডকোয়ার্টার। জেনারেল কাজী ও ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ দুজনেই তাদের সাহস, কর্মশক্তি আর আত্মোৎসর্গের জন্য পরিচিত ছিলেন। শেষের জনকে সালদা নদী (কুমিল্লার উত্তরে) থেকে ইটাখোলা (মৌলভীবাজারের দক্ষিণে) পর্যন্ত আটচল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রন্ট প্রতিরক্ষা করতে হচ্ছিল। তিনি ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে আখাউড়ায় এবং ৩৩ বালুচ ও ২১ আজাদ কাশ্মীর (মাইনাস)-কে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরে নিযুক্ত করলেন। তার কাছে আরও ছিল একটি রিকনেসেন্স এন্ড সাপোর্ট ব্যাটেলিয়ন (৪৮ পাঞ্জাব) থেকে পাওয়া দশটি ফিল্ড গান, চারটি ট্যাংক ও একটি প্লাটুন।

শত্রুরা যুদ্ধের আগে থেকেই আখাউড়া আর পার্শ্ববর্তী কসবার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছিল। এগুলোর দুটোই চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-সিলেট রেললাইনের স্টেশন হিসেবে অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল। গত অক্টোবর থেকেই এগুলো জাতীয় সংবাদপত্রে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দৃশ্যসহ হেডলাইনে আসছিল। এই স্টেশনগুলো কয়েকবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হাতবদল হয়েছিল। যখন যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তারা রেললাইনের স্লিপারগুলো সরিয়ে ফেলেছিল। রেলওয়ের দালান হিসেবে ইঁটের ছোট্ট ঘরটি ছিল জনশুণ্য ও বুলেটে ঝাঁজরা হওয়া।

ভারত যখন ২১/২২শে নভেম্বর তাদের মূল যুদ্ধ শুরু করল, আমরা এই পথে একটি বড় ধরণের আক্রমণের অনুমান করেছিলাম। চার দিন পাঁচ রাত উৎকণ্ঠাময় শান্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কেটে গেল। অবশেষে, ২৭শে নভেম্বর ভারত দেখা দিল আর পূর্ণ শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখ পজিশনের উপর আক্রমণ চালাল। আমরা যখন এই সম্মুখ আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলাম সেই ফাঁকে মুক্তি বাহিনী তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাথে নিয়ে পাশ থেকে আমাদের আক্রমণ করল আর আমাদের আখাউড়া পজিশনকে ঘিরে ফেলল। এই ঘেরাও করা চৌকিগুলো আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না, কারণ আমাদের সকল সংযোগের প্রচেষ্টা সামনে দিয়ে করতে হচ্ছিল, যেহেতু সীমান্তবর্তী রণকৌশল হিসেবে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি আমাদের ছিল না।

এই বিচ্ছিন্ন পজিশনগুলো ছাঁটাই করার জন্য ভারত ৩০শে নভেম্বর আখাউড়ায় নতুন করে আক্রমণ চালাল। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতিরক্ষার একটি প্লাটুন ধ্বংস হল আর



শত্রুরা যারা গত কয়েকদিন ধরে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের পরীক্ষা নিচ্ছিল, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বসানো একমাত্র ফিল্ড গানটি দখল করে নিল - এটি মূলত আখাউড়া প্রতিরক্ষার পিছনে আমাদের ফৌজের মনোবল বাড়ানোর জন্য বসানো হয়েছিল।

যেহেতু সামনের প্লাটুনগুলোর সাথে টেলিযোগাযোগও ভেঙে পড়েছিল, একজন লেফটেন্যান্টকে সরাসরি তথ্য জানার জন্য সামনের কোম্পানীর ডানদিকের সংযোজিত অংশে পাঠানো হল। তিনি গিয়ে দেখলেন আমাদের ফৌজ পিছু হটে যাচ্ছে আর শত্রুর কলাম আমাদের ডানদিকের অংশে ঢুকে পড়ছে। তিনি সরে আসা ফৌজকে তাদের পরিখায় ফিরিয়ে নিলেন আর শত্রুর ঢুকে পড়ার খবর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে পাঠালেন।

আখাউড়ার দক্ষিণে আমাদের গঙ্গাসাগর পজিশনে মালিক বাড়িতে একটি প্লাটুন ও লানাসরে একটি সেকশন ছিল। ১লা ডিসেম্বর শত্রুরা আর্টিলারী ও ট্যাংকের গোলা দিয়ে এদেরকে ধুয়ে ফেলে। ফৌজরা এই আঘাত সইতে না পেরে ধরা পড়ে। এবার, তাদেরকে খাঁচায় ফিরিয়ে আনায় দায় পড়ে মেজর জেনারেল কাজীর ভাগে।

জিওসি আর ব্রিগেড কমান্ডার যখন আখাউড়া আর গঙ্গাসাগরে ভেঙে পড়া প্রতিরক্ষার সংস্কার করতে ব্যস্ত, তখন মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় ভারতের ৪ গার্ডের কিছু অংশ আমাদের ব্যাটেলিয়ন প্রতিরক্ষার পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। যেহেতু এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোন বাড়তি সৈন্য আমাদের ছিল না, ১৪ ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট-কর্নেল বাসিত ব্যাটম্যান, মিলিটারী পুলিশ আর দপ্তরীদের নিয়ে একটি ছোট বাহিনী গঠন করলেন। তিনি চারটি ট্যাংকের দুটি নিলেন আর এই 'বাহিনী' নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের আক্রমণ করলেন। অনুপ্রবেশকারীদের মানসিকতা ছিল চোরের মত, তারা ধরা পড়ার সাথে সাথে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল। বাসিত আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের অনুসরণ করে কয়েকবার গুলি করলেন, এতে পলায়নপর শত্রুদের কয়েকজন মারা পড়ল। যারা রণক্ষেত্রে মৃত পড়ে ছিল, তাদের মধ্যে ছিল ভারতীয় আর্টিলারীর একজন তরুণ পর্যবেক্ষক। তার জিনিসের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আবিষ্কৃত হল, এর মধ্যে ছিল একটি 'টাস্ক টেবিল' যেখানে লক্ষ্য হিসেবে (আমাদের প্রতিরক্ষা সীমার পিছনে) তিতাস নদীর উপর আখাউড়া সেতু দখল করাকে দেখানো হয়েছিল।



৩রা ডিসেম্বর যখন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ শুরু হল, জিওসি-র সাথে পরামর্শ করে ব্রিগেড কমান্ডার সিদ্ধান্ত নিলেন যে পুরোদস্তুর আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য তার পজিশনগুলো পুনঃসজ্জিত করবেন। তিনি ঠিক করলেন যে পরদিন রাতে তিনি তার সৈন্য প্রত্যাহার করে আখাউড়া সেতুর এপাড়ে চলে আসবেন, তার ছড়িয়ে দেয়া বাহু ভাঁজ করে দক্ষিণে নিয়ে আসবেন আর এই কৌশলগত সেতুটি উড়িয়ে দিবেন।

পরিকল্পনা সফলভাবেই সম্পাদিত হল, শুধু সেতুটি ছাড়া, যেটি ফৌজের তাড়াহুড়া করে পালানোর কারণে অক্ষত রয়ে গিয়েছিল আর শত্রুর হাতে চলে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, তারা আমাদের সরে আসা ফৌজের পিছন পিছন সেতু পার হয়ে চলে এল, আর তিতাস নদীর এপাড়ে প্রতিরক্ষা সীমায় এসে আমাদেরকে প্রস্তুত হবার সময়টুকুও দিল না। আরও ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দীর্ঘায়িত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করা হত। শহরটিকে এর মধ্যেই পনের দিনের খাদ্য ও গোলাবারুদের মজুদসহ ডিভিশনাল 'শক্তিশালী কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

আমরা আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিরক্ষা কেন্দ্র দখল করে অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন শত্রুর হাতুড়ি নেহাইয়ের উপর পড়ে। আগের মত, এবারও তারা সেটা করতে ব্যর্থ হল আর পাশ থেকে এসে ঢুকে পড়ে আমাদের জন্য হুমকী সৃষ্টি করল। আমরাও আগের মতই প্রতিক্রিয়া দেখালাম আর আমাদের পজিশন খালি করে দিয়ে আরও ১৩ কিলোমিটার পিছনে মেঘনার পূর্ব পাড়ে আশুগঞ্জে আমাদের পজিশন সরিয়ে নিলাম। এই প্রত্যাহার শুরু হয়েছিল ৭/৮-ই ডিসেম্বরের রাতে আর শেষ হয়েছিল পরদিন সকালে। শত্রুরা এবার আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা গড়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিল।

এদিকে, ১৪ ডিভিশনের ট্যাকটিকাল হেডকোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সরিয়ে মেঘনার পশ্চিম তীরে ভৈরব বাজারে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই সরানোর খবর গোপন রাখা যায়নি, এর প্রভাবে আমাদের ফৌজ বিচলিত হয়ে উঠল, তারা ভাবছিল যে মেঘনার পশ্চিম তীরই নিরাপদ, পূর্ব তীর নয়। সামনের দিকের এলাকায় ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের উপস্থিতি যদি ফৌজের জন্য শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করে, তো একই ভাবে এর সরিয়ে নেয়াও তাদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।

ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আশুগঞ্জে তার ব্রিগেডকে নিযুক্ত করলেন - এটিই ছিল শত্রুর আক্রমণের সবচেয়ে সম্ভাব্য পথ। তিনি



উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের দায়িত্ব দিলেন ইপিসিএএফ-কে, সাথে দিলেন নিয়মিত ফৌজের কিছু ছিটেফোঁটা।

৯ই ডিসেম্বর সকালবেলা জানা গেল যে শত্রু উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে আশুগঞ্জে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এই খবর পেয়ে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল: শত্রুরা ঐ এলাকায় কিভাবে গেল? আমাদের ফিল্ড গানগুলো তাদের প্রথম অগ্নিবৃষ্টি নিক্ষেপের আগেই, এটি ফাঁস হল যে ঐ 'প্রবেশকারী শত্রুরা' আর কেউ না, আমাদের নিজেদেরই ইপিসিএএফ সদস্য, যারা তাদের অস্ত্রগুলো মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে নদীর তীর দিয়ে আমাদের এলাকার দিকে হেঁটে ফিরছিল। তারা ঐ এলাকায় শত্রুর ফৌজ ও ট্যাংকের খবর দিল আর পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি রাইফেল নিয়ে তাদের পরিখায় বসে থাকার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।

ইপিসিএএফ সদস্যদের অনুসরণ করে আরেকটি পদাতিক কলামও এল। তাদেরকে প্রতিরক্ষা সীমা থেকে সরে আসা বন্ধুসুলভ ফৌজ বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু তারা যখন আশুগঞ্জে প্রবেশ করল, তাদেরকে সবুজ পোশাকে ভারতীয় সৈন্য বলে চিহ্নিত করা হল। তারা আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। শত্রুর অগ্রগতি থামাতে হাতে গোণা কয়েকজন লোককে দ্রুত সংগ্রহ করা হল। এদিকে, পূর্ব সেক্টর থেকে কিছু নিয়মিত ফৌজ নিয়ে এসে এই নতুন হুমকীর মোকাবিলা করার জন্য বার্তা পাঠানো হল। পূর্ব সেক্টর থেকে নিয়মিত ফৌজ এসে পৌঁছানোর আগেই অ্যাড হক বাহিনী শত্রুর ফৌজকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। শত্রুরা তাড়াহুড়া করে পালিয়ে গেল, পিছনে বেশ কয়েকজনকে মৃত ফেলে গেল আর চালু অবস্থায় সাতটি ট্যাংক খালি করে রেখে গেল। এই ছোট বিজয়টি আমাদের ফৌজের মনোবল ধরে রাখতে সাহায্য করল, যারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ধাপে ধাপে পিছিয়েই আসছিল।

২৭ ব্রিগেড যেখানে তখনও শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলার জন্য আশুগঞ্জে প্রস্তুত হয়ে ছিল, সেখানে জেনারেল কাজী মেঘনার উপর বিশাল ভৈরব সেতু উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। তার নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা হল, লোহার গার্ডারগুলো পানিতে ছিটকে পড়ল। পূর্ব তীরের ফৌজ এই নিরুৎসাহব্যঞ্জক কাজটি লক্ষ না করে পারল না। জিওসি-কে এই ধ্বংসের নির্দেশ দেয়ার জন্য ঠিক কোন কারণটি প্ররোচনা দিয়েছিল তা জানা যায়নি। সাধারণভাবে, দুটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়। প্রথমত, বলা হয় যে ফৌজদের পিছনে ফিরে দেখা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল সেতুটি উড়িয়ে দেয়া। এখন তারা পূর্ব



দিকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। দ্বিতীয়ত, জিওসি ভয় পেয়েছিলেন যে শত্রুর কলাম উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এসে এটি অক্ষত অবস্থায় দখল করে ফেলতে পারে। মূলত এই সেতুটি শত্রুর হাতে যাওয়া ঠেকাতেই ধ্বংসের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর পর যখন আমি জিওসিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন যে তিনি উত্তর দিকের এলাকায় হেলিকপ্টারে করে শত্রু বাহিনীর অবতরণের খবর পেয়েছিলেন। তার ব্যাখ্যা ছিল, ঐ বাহিনীর সেতু দখল করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকতে পারে না। যদিও এই হেলিকপ্টারে আসা বাহিনীর উপস্থিতি আর কোন সূত্র দিয়ে প্রমাণ করা যায়নি।

২৭ ব্রিগেড যা নৌবাহন পাওয়া যায় তাই দিয়ে ১০/১১-ই ডিসেম্বরের রাতে নদী পার হয়ে ভৈরব বাজারে চলে এল। পরদিন ভৈরব বাজার নগরদুর্গের নতুন প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হল। নগরদুর্গটিতে পনের দিন চলার মত মজুদ প্রস্তুত ছিল। জিওসি-র দুর্বল নেতৃত্বে ব্রিগেডটি সেখানে বসে রইল, যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত শত্রুরা তাদের ছুঁয়েও দেখল না। ২৭ ব্রিগেড যখন 'ঘোড়ার জিনের উপর নিরাপদে' বসে অপেক্ষা করছিল, শত্রুর হেলিকপ্টারগুলো তখন তাদের ফৌজদের মেঘনা পার করে ভৈরব বাজার থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দক্ষিণে রায়পুরা-নরসিংদী এলাকায় নামিয়ে দিচ্ছিল। এই হেলিকপ্টারে আসা বাহিনী যা ঢাকার জন্য হুমকীস্বরূপ ছিল, ১৪ ডিভিশন বা ২৭ ব্রিগেড এদেরকে বিরক্ত করেনি, যেহেতু এটি কার্যত তাদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল।

এই ছিল আখাউড়া-ভৈরব বাজার পথে ১৪ ডিভিশনের সর্বোচ্চ ট্রাম্প কার্ডের চাল দেয়ার পর অর্জন।

এবার চলুন ডিভিশনের অন্য দুই সেনাদলের দিকে ফিরি। ৩১৩ ব্রিগেড ছিল ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহর পজিশনের ঠিক উত্তরে, তারা কমলগঞ্জ থেকে লাতু পর্যন্ত সীমান্ত চৌকিগুলোতে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২২ বালুচকে নিযুক্ত করেছিল। ২৭ ব্রিগেড এলাকার আখাউড়া ও কসবার মত, এই ব্রিগেড এলাকার সবচেয়ে কৌশলগত সীমান্ত চৌকি ছিল দুলাই। এটি ছিল ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দখলে, অক্টোবর থেকেই তারা বেশ কয়েকবার ভারতীয় ফৌজ ও তাদের দোসরদের (মুক্তি বাহিনী) আক্রমণের শিকার হয়। এই প্রেক্ষিতে, আমাদের ফৌজের শক্তি বাড়িয়ে একটি (মিশ্র) কোম্পানী গঠন করা হয়। শত্রুর কৌশল ছিল অন্য সব জায়গায় প্রয়োগকৃত কৌশলের মতই: প্রতিরক্ষাকারীদের সামনের দিক থেকে আক্রমণ করে ব্যস্ত রাখা আর সেই ফাঁকে পাশ দিয়ে ঢুকে পড়া। অক্টোবরের



চার সপ্তাহ ধরে তারা এটি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। যা হোক, ২৯শে অক্টোবর তারা দুলাই চৌকিকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। আমাদের শক্তিবৃদ্ধি বা চৌকির সাথে যোগাযোগের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। তারপরও অবরোধের মধ্যেই এটি পূর্ণ গৌরবের সাথে টিকে থাকে। ৩১শে অক্টোবর ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জাভেদ তার এই অসহায় পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন ও যে কোন মূল্যে অবরোধ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হাতে গোণা আঠারজন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে ঘেরাও করা ফৌজকে দক্ষিণ পাশ দিয়ে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তারা মেজর জাভেদ ও তার সহযোদ্ধাদের উপর শেল ও বৃষ্টির বন্যা বইয়ে দিল। কিন্তু তারা দমে গেল না, বা পিছুও হটল না। ভারতীয় আর্টিলারীর পর্যবেক্ষক, যে খালি চোখে এই বীর মানুষগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখছিল, তার কামানগুলোতে নতুন করে গোলা ভরে নিল আর তার পরবর্তী অগ্নিবৃষ্টি সরাসরি এই দৃঢ়চেতা মানুষের দলের উপর গিয়ে পড়ল। তাদের নেতাসহ বেশিরভাগ নিহত হল, আর দুলাই চৌকির পরিণতি আবারও ভাগ্যের শিকায় ঝুলতে থাকল।

৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের বহুসংখ্যক সেনা হারানোর ঘটনা এটিই প্রথম ছিল না। ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত তাদের ১৬০ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে ছিল দুইজন অফিসার, তিনজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার আর ৯০ জন নিয়মিত ফৌজ। বাকীরা ছিল রাজাকার ও ইপিসিএএফ সদস্য। আনুষ্ঠানিকভাবে, তখনও পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়নি!

ব্রিগেডিয়ার রানা জিওসি ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারকে পরামর্শ দেন যে, অবরুদ্ধ সীমান্ত চৌকিগুলোর সাথে সামনে দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা না করে, আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে শত্রুর লেজে গিয়ে আঘাত করাই ভালো হবে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই উদ্দেশ্যে ২২ বালুচ, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ৩৯ বালুচকে (আরও দক্ষিণ থেকে) নিয়ে একটি বাহিনী তৈরি করলেন। তিনি দুটি ফিল্ড গান ও চারটি মর্টারও (সিলেট ও কুমিল্লা থেকে) জোগাড় করেছিলেন যাতে আক্রমণের সহায়তা করে দুলাইকে মুক্ত করতে পারে। নভেম্বরের শুরুতে যখন নিয়াজী এই এলাকা সফরে যান, তখন তিনি আমার উপস্থিতিতে জেনারেল নিয়াজীর কাছে তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি প্রার্থনা নাকচ করা হয়। তারপরও ব্রিগেডিয়ার রানা এত পরিশ্রমের সাথে যে বাহিনী তৈরি করেছিলেন তা তাকে ব্যবহার করতে বলা হয়। ত্রিমুখী আক্রমণ



মোটামুটি সামনের দিক থেকেই চালানো হয়, এবং ব্যর্থ হয়। এটি শুধুমাত্র দুলাই চৌকির পিছনে হতাহতের তালিকাই বাড়িয়েছিল।

রানার ব্রিগেডের আরেক ব্যাটেলিয়ন, ২২ বালুচেরও 'আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের' আগে একই রকম কঠিন সময় যাচ্ছিল। নভেম্বরের শেষ হতে হতে শত্রুরা লাতু, কলোরা ও শমশেরনগরের কাছে সকল সীমান্তের বাঁক দখল করে নিয়েছিল। ১লা ডিসেম্বর তারা আরেকটু ভিতরে ঢুকে পড়ল আর শমশেরনগর ও সীমান্ত চৌকির মাঝামাঝি একটি প্রতিবন্ধক পজিশন স্থাপন করল। ব্রিগেড কমান্ডার এটি আবিষ্কার করলেন যখন পার্শ্ববর্তী রাজনগর পজিশন থেকে আক্রমণের শিকার হলেন। পরদিন শত্রুরা স্বয়ং শমশেরনগরেই আক্রমণ করল যাতে সীমান্ত চৌকিগুলো অচল হয়ে যায়। পিএএফ-এর সাহায্য চাওয়া হল আর এই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল দুটি এফ-৮৬। তারা সীমান্তের এপাড় দিয়ে উড়ে এসে শত্রুর কোন পজিশন খুঁজে পেল না। ফৌজ, ট্যাংক ও বাহনগুলো সীমান্তের পূর্ব দিকে জড়ো করা হয়েছিল, কিন্তু বিমানগুলো সেখানে গিয়ে তাদের ধ্বংস করতে পারছিল না, যেহেতু এতে আন্তর্জাতিক সীমালঙ্ঘন করা হবে। একটিও গুলি না করে তাদেরকে বেজে ফিরে আসতে হল। এটা ছিল পুরোদস্তুর যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত।

পিএএফ-এর নিষ্ফল সর্টি অন্তত একটি ব্যাপার পরিষ্কার করতে পেরেছিল যে শত্রুরা তখনও শমশেরনগর দখল করেনি। তাই আমাদের ফৌজকে ফিরে গিয়ে তাদের খালি করে আসা পজিশনগুলো আবারও দখল করার নির্দেশ দেয়া হল। এদিকে শমশেরনগরের পূর্বদিকে বিচ্ছিন্ন চৌকিটি শত্রুদের দখলে চলে গিয়েছিল। বলা হয় যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জমির শেষ পর্যন্ত তার পরিখায় মাটি কামড়ে বসে ছিলেন। তার শেষ যে কথাটি শোনা গিয়েছিল তা হল তিনি চিৎকার করে তার ফৌজকে বলছিলেন, "দেখ! ওরা ফিরে যাচ্ছে। তোমরা তোমাদের পজিশনে বসে থাকো। শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে।"

বলা হয় যে এই সীমান্ত চৌকিগুলোর প্রতিরক্ষায় সবচেয়ে দুর্বল অংশ ছিল রাজাকার আর ইপিসিএএফ সদস্যরা, যারা সবার আগে তাদের চৌকি খালি করে গিয়েছিল। লোকে বলে, কাপুরুষতা ব্যাপারটি সংক্রামক। এই সংক্রমণ দ্রুত নিয়মিত ফৌজের মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। নীতিবাক্য: কখনই ফ্রন্টলাইন প্রতিরক্ষায় নিয়মিত ফৌজের সাথে আধাসামরিক বাহিনীকে মিশিয়ে দিও না!



৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হবার পর, ব্রিগেডিয়ার রানা সীমান্ত চৌকিগুলো থেকে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে মৌলভী বাজারে সরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন - যেটি ছিল ডিভিশনের 'শক্তিশালী কেন্দ্র' ও রানার ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার। একেবারে ডানদিকের ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কোম্পানীটিকে পার্শ্ববর্তী ২৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হল।

২২ বালুচকে ফিরে আসার জন্য ডাকা গেল না, কারণ তাদের সাথে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিগেডিয়ার রানা লাতু, কামাটনগর, জুরি, কলোরা ও মির্জাপুরের মত দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফৌজদের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। ঐ ব্যাটেলিয়ন কি ছারখার হয়ে গিয়েছে? সীমান্ত চৌকির ফৌজরা কি টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে? কেউ যদি বেঁচে থাকে, তাদের জন্য কী করা যেতে পারে?

অবশেষে, ২২ বালুচের একটি কোম্পানী হেডকোয়ার্টারের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করা গেল। তাদেরকে বলা হল যেন সবাই কোন সুবিধাজনক জায়গায় একত্র হয় যাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এড়াতে পারে। তাদের কেউ কেউ লাতু ও ফেঞ্চুগঞ্জে একত্র হল, আর বাকীরা (দলছাড়া প্রায় পঞ্চাশজন) সিলেটে চলে গেল। তারা তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র পিছনে ফেলে ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে হেঁটে ফিরেছিল।

অনেক চেষ্টার পরে, ২২ বালুচের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারকে দৈবক্রমে রেডিওতে পাওয়া গেল। তারা কলোরা থেকে প্রায় ষোল কিলোমিটার দূরের চা বাগানে তাদের নতুন অবস্থানের খবর দিল। ব্যাটেলিয়নটিকে পুনঃগঠন করার নির্দেশ দেয়া হল। জানা গেল যে ২২ বালুচ শত্রুর ভীষণ আক্রমণের ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যার ফলে সীমান্ত চৌকিগুলোতে নিযুক্ত কোম্পানীগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না পৌঁছিয়েই ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই গোলমালে তারা কোম্পানীগুলোর সাথে সাথে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সাথেও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। ৬ই ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

এ ছিল সেই দিন, যেদিন জিওসি ৩১৩ ব্রিগেডকে আখাউড়া-ভৈরব বাজার পথে ২৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সময় এমন একটি পথকে শক্তিশালী করার দরকার ছিল যা ঢাকার পরিণতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার রানা এই দায়িত্ব সম্পাদন করতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তাকে অন্তত একটি



ব্যাটেলিয়ন পাঠাতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি পারেননি। তিনি শুধু ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নিকটতম কোম্পানীকে ২৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যা আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

এদিকে, শত্রুরা শমশেরনগর-মৌলভী বাজার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। যেহেতু ২২ বালুচ তখনও বিচ্ছিন্ন ছিল, মৌলভী বাজার প্রতিরক্ষা করতে হবে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (যাদের এখন মাত্র আড়াইটি কোম্পানী আছে) আর আধাসামরিক বাহিনীদের। ৫ই ডিসেম্বর চারপাশের প্রতিরক্ষা সীমা গঠন করা হল।

মৌলভী বাজার ও সিলেটের মধ্যে ছিল ছোট নদী কুশিয়ারা। এখানে দুটি ঘাট ছিল: শেরপুর ও সাদীপুর। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার তাদের যানবাহন ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নদীর সিলেটের দিকের পাড়ে সাদীপুর ঘাটে সরে গেল, আর ইপিসিএএফ ও রাজাকারদের নিয়ে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স মৌলভী বাজারে রয়ে গেল। শত্রুর বিমান ও আর্টিলারী এবার মৌলভী বাজারে আক্রমণ চালাল। তারা এই এলাকায় ভীষণভাবে বোমা, শেল ও রকেট হামলা করল। ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স বীরের মত এই শাস্তি সহ্য করল। তারা দুই দিন মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল আর মাত্র পাঁচজন সৈন্য হারাল। কিন্তু আরও অনেকে আহত ছিল, এর মধ্যে কেউ কেউ উড়ে আসা ইঁটের আঘাতে আহত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাদেরকে গোলাবারুদের মজুদ ধ্বংস করে সাদীপুর ঘাটে সরে আসার নির্দেশ দেয়া হল।

৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স সাদীপুর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সেখান থেকে সরিয়ে সিলেটে নেয়া হল। এই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ব্রিগেডের দুজন কমান্ডার ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার রানার পাশাপাশি, ব্রিগেডিয়ার হাসানকে ডিসেম্বরের শুরুতে ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছিল কারণ জেনারেল নিয়াজী আশংকা করছিলেন যে রানা একা এই চাপ সহ্য করতে পারবেন না। তিনি এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেননি যে দুর্বল নেতৃত্বের চেয়ে দ্বৈত নেতৃত্ব আরও খারাপ।

৭ই ডিসেম্বর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের ক্যাপ্টেন জাফর তার ব্রিগেড কমান্ডারদের আগে আগে রওনা দিলেন। সন্ধ্যার দিকে এই তরুণ অফিসার যখন সিলেটে প্রবেশ করলেন, তিনি দেখলেন শহরের পূর্ব সীমানার কাছে শত্রুর হেলিকপ্টার ফৌজ নামাচ্ছে। তিনি থেমে রুদ্ধশ্বাসে গুণলেন, দশটি হেলিকপ্টার তাদের ফৌজ নামিয়ে উড্ডয়ন করল। এদিকে, ব্রিগেডিয়ার রানার জিপ এসে পৌঁছাল। হেলিকপ্টারে করে ফৌজ নামানোর ব্যাপারে তাকে



বলা হল। তিনি আশংকা করলেন শহরটি হয়তো শত্রুর দখলে চলে গিয়েছে। তিনি এই ভেবে অবাক হলেন যে শত্রুরা নিরাপত্তা বলয় তৈরি না করেই কিভাবে ফৌজ নামাতে পারল।

এদিকে, শত্রুরা সাদীপুর ঘাটে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে তাদের নতুন প্রতিরক্ষায় কোন রকম বিরক্ত করল না, কারণ তাদের উপর যে কোন ধরণের চাপ দিলেই ব্যাটেলিয়নটি সিলেটের দিকে সরে যাবে, যা শত্রুর জন্য সুবিধাজনক হবে না, তারা সিলেটকে তখনই দখল করতে চায় যখন সেখানে প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে কম শক্তি থাকবে। সিলেট ছিল সালুটিকর এয়ারস্ট্রিপ আর চা বাগানে সমৃদ্ধ, এই সেক্টরে শত্রুর জন্য এটি ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

ব্রিগেডিয়ার রানার নির্দেশ মোতাবেক, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আর তাদের সংযুক্ত বাহিনী ৮/৯-ই ডিসেম্বরের রাতে সাদীপুর থেকে সিলেটে সরে এল। যে অফিসার এই কলামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে বাইরে থেকে "সিলেটকে ভূতের নগরীর মত দেখা যাচ্ছিল। ঘন অন্ধকারে ঢাকা ছিল এটি। এর স্তব্ধতা এক ভয়ংকর উত্তেজনায় পূর্ণ ছিল। শব্দ বলতে ছিল একমাত্র রাস্তার কুকুরের হঠাৎ করে ওঠা ঘেউ ঘেউ বা কিছুক্ষণ পর পর রাইফেলের গুলির কর্কশ আওয়াজ।"

কিন্তু, এই 'ভূতের নগরী'-তেই ছিল ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর ২০২ অ্যাড হক ব্রিগেড। তাদের কী হয়েছিল? সিলেটে হেডকোয়ার্টারসহ ২০২ ব্রিগেডের ছিল একটি মাত্র পদাতিক ব্যাটেলিয়ন - ৩১ পাঞ্জাব। এর শক্তিকে বাড়ানো হয়েছিল এর সাথে আধাসামরিক সদস্য যোগ করে, যাদের মধ্যে ছিল ফ্রন্টিয়ার কোর, রেঞ্জার্স ও রাজাকারেরা। এই 'ব্রিগেড'-কে ফিল্ড গানের একটি ব্যাটারীও দেয়া হয়েছিল (যা আগে ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের ছিল)। এই ব্রিগেডের পূর্ব ও উত্তরে দীর্ঘ জমি ছিল। লাতু (৩১৩ ব্রিগেডের উত্তর প্রান্ত) থেকে উত্তর সীমান্তে তাহিরপুর, যেখানে সিলেট ময়মনসিংহের সাথে মিশেছে, এই পর্যন্ত এর এলাকা বিস্তৃত ছিল। ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর বিপরীতে ছিল ৪ নং কোরের একটি ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশন।

সিলেটে প্রবেশের প্রধান দুটি দিক ছিল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব। পূর্ব দিকের প্রবেশপথে পর পর ছিল আটগ্রাম, জকিগঞ্জ ও চুরখাই প্রতিরক্ষা পজিশন আর উত্তর-পূর্ব পথে ছিল জৈন্ত্যপুর, হেমু ও খাদিম নগর। শহর ও ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশের অন্য পথগুলো ছিল উত্তর-পশ্চিমে ছাতক দিয়ে আর উত্তরে গোয়াইন দিয়ে, কিন্তু এই পথগুলোর কোনটিতেই শত্রুর



আনাগোনা ছিল না, বা এগুলোর কোনটিই বড় ধরণের আক্রমণের পথ হিসেবে তৈরি করা যেত না। এজন্য, ব্রিগেডটি আটগ্রামের দিকে মূল মনোযোগ দিয়েছিল।

সবচেয়ে হুমকীজনক পথে পুরো ৩১ পাঞ্জাবকে নিযুক্ত করা যায়নি, কারণ শত্রুরা মুক্তি বাহিনীর দেখানো আরও কম স্পর্শকাতর পথ অনুসরণ করে এসে সিলেটে আক্রমণ করতে পারে। তাই ব্যাটেলিয়নকে ভেঙে আটটি দলে ভাগ করা হল আর পূর্বে আটগ্রাম থেকে পশ্চিমে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্ত চৌকিতে পাঠানো হল। নিয়মিত ফৌজকে 'মেরুদন্ড' হিসেবে রেখে পজিশনগুলোতে আধাসামরিক বাহিনী একত্র করে 'শক্তি বৃদ্ধি' করা হল।

অন্যান্য স্থানের মত, এই সীমান্তেও শত্রুরা ১৫ই অক্টোবর থেকেই সক্রিয় ছিল, যখন ৮৫ ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ফিল্ড গানের একটি ব্যাটারী ও মুক্তি বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ন (৩ ইস্ট বেঙ্গল)-এর সহায়তায় ছাতকে আক্রমণ করে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শহরটি ও সেখানকার সিমেন্ট কারখানাটি দখল করা। এই পথের প্রহরায় থাকা আধাসামরিক বাহিনী তাদের সম্মুখ পজিশন ছেড়ে গেলেও শহরেই থাকল। তাদের পজিশনকে সুদৃঢ় করার জন্য চুরখাই থেকে নিয়মিত ফৌজের একটি কোম্পানী ও দুটি ফিল্ড গান পাঠানো হল। পরবর্তীতে, পাল্টা আক্রমণ করে অনুপ্রবেশকারীদের ছুঁড়ে বের করে দেয়ার জন্য ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানী ধার করে আনা হয়েছিল। ২৩শে অক্টোবরে চালানো এই অপারেশন সফল হল।

আমাদের সাফল্য শুধু যেটুকু করতে পারল তা হল, এটি শত্রুকে বোঝাতে পারল যে তাদেরকে আমাদের এলাকা আক্রমণ করে দখল করার জন্য আরও বড় একটি বাহিনী নামাতে হবে। এজন্য তারা ২১শে নভেম্বর আটগ্রাম ও জকিগঞ্জ এলাকায় একটি ব্রিগেড আক্রমণ (৫৯ ভারতীয় ব্রিগেড) চালাল। তারা ৩১ পাঞ্জাবের নিয়মিত অংশসহ আমাদের সকল ফৌজকে ছুঁড়ে বের করার ব্যবস্থা করল। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের হটাতে না পেরে আমাদের পজিশনের পুনঃসজ্জা করলাম। আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা নেয়া হল সিলেট থেকে বত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে চুরখাইয়ে। ২০২ ব্রিগেড তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য ১২ আজাদ কাশ্মীরের দুটি কোম্পানী পেল, যারা নভেম্বরের শেষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে পৌঁছেছিল। এই নতুন ফৌজ যেহেতু স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে অপরিচিত ছিল,



তাদের উপর স্বাধীনভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা যাচ্ছিল না। চুরখাই ও জৈন্ত্যপুরে তাদের একটি করে কোম্পানী নিযুক্ত করা হল।

দুটি কোম্পানীর এই 'উপহার' এই এলাকায় শত্রুর লক্ষ্য বা কৌশলের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারল না। তারা মুক্তি বাহিনীর সাহায্য নিয়ে আমাদের এলাকা খুবলে খুবলে দখল করে নেয়া চালিয়ে যেতে থাকল। ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে, তারা আটগ্রাম থেকে তাহিরপুর পর্যন্ত পুরো সীমান্তই কেটে দখল করে নিয়ে গেল। শত্রুর দখলের গভীরতা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল: ছাতকে ছিল পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার, সুনামগঞ্জে তের থেকে পনের কিলোমিটার আর জকিগঞ্জে ত্রিশ কিলোমিটার। এই সেক্টরে শত্রুর দখলে যাওয়া মোট এলাকার পরিমাণ ছিল কয়েকশ' বর্গ কিলোমিটার।

পশ্চিম পাকিস্তানে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, সিলেটে আমাদের প্রতিরক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়ে পূর্বে চুরখাই, উত্তরে হেমু ও উত্তর-পশ্চিমে ছাতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। পুরোদস্তুর যুদ্ধের প্রথম তিন দিন যাবৎ ব্রিগেড এই প্রতিরক্ষা সীমাটুকু ধরে রাখল। আসলে, শত্রুরা সিলেটের বিরুদ্ধে তাদের বাহিনীকে নামায়নি যতক্ষণ না মূল আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিস্থিতি সুস্থির হয়। ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র ২৭ ব্রিগেডই মেঘনার দিকে সরে যায়নি, বরং ৩১৩ ব্রিগেডকেও (মৌলভী বাজার) সরানো হয়েছিল। এবার শত্রুরা বিনা ঝঞ্ঝাটে এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহরটির পরিণতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সিলেট-নিবাসী একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জনাব আজমল চৌধুরী, ৭ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর হেডকোয়ার্টারে এসে বললেন যে তিনি শহর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পূর্বে মিরনচকে শত্রুর হেলিকপ্টার থেকে ফৌজ নামতে দেখেছেন। (যুদ্ধের পর তিনি মুক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন যারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।) এটি ছিল মোটামুটি সেই সময়, যখন ব্রিগেডিয়ার রানার হেডকোয়ার্টারের ক্যাপ্টেন জাফর সাদীপুর ঘাটের দিক থেকে সিলেটে প্রবেশ করছিলেন। তার সাথে ছিল সাতজন লোক।

জাফরের সাথে স্থানীয় মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সরফরাজের দেখা হয়েছিল যিনি তাকে হেলিকপ্টার অবতরণের এলাকার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা গুণেছিলেন, নয়টি হেলিকপ্টার তাদের সৈন্য নামিয়ে উড্ডয়ন করেছিল। তারা ঘড়ির দিকে তাকালেন: তখন বিকাল ৪:৩০ বাজে। তারা শত্রুর আনুমানিক শক্তি পর্যালোচনা করে চিন্তা করলেন যে সাতজন লোক নিয়ে দুটি কোম্পানীকে উৎখাত করা অসম্ভব হবে।



এদিকে, ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ জৈন্ত্যপুর পজিশন থেকে ৩১ পাঞ্জাবের ছাব্বিশজন লোক নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন বাশারাতের অধীনে পাঠালেন যাতে শত্রুকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। তিনি যখন ঐ এলাকায় প্রবেশ করলেন, দেখলেন হেলিকপ্টারের এক নতুন ঝাঁক এসে ফৌজ ও অস্ত্র নামাচ্ছে। তিনি ভাবলেন একটি 'ব্যাটেলিয়ন' (মাইনাস)-কে উৎখাত করা তার প্লাটুনের পক্ষে অতিরিক্ত চাপ হয়ে যাবে। তিনি নালা বরাবর কয়েক দফা গুলি বিনিময় করেই সন্তুষ্ট থাকলেন।

প্রায় একই সময়ে, ২২ বালুচের প্রায় পঞ্চাশজন দলছুট সদস্য লাতু-কলোরার দিক থেকে এসে সিলেটে পৌঁছাল। তাদেরকেও বাশারাতের বাহিনীতে শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হল। ততক্ষণে ৮ই ডিসেম্বর হয়ে গিয়েছে। আমাদের ফৌজ, যারা এই হেলিকপ্টারে আসা বাহিনীর উপর কখনই দৃঢ় আক্রমণ চালায়নি, অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখল শত্রু তাদের হাত উত্তরের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে সিলেট থেকে চুরখাইকে কেটে আলাদা করে নেয়ার জন্য। একই সময়ে স্থানীয় সার্কিট হাউজ ও কায়েন সেতুর উপর দিয়ে দুটি হেলিকপ্টার উড়ে গেল, সম্ভবত এই এলাকার প্রাথমিক নিরীক্ষণের জন্য। হঠাৎ, একটি হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলা হল যা সার্কিট হাউজের চত্বরে বিস্ফোরিত হল। এতে চারজন আহত হল - একজন গোয়েন্দা কর্মচারী ও তিনজন পুলিশ। সৈন্যরা আহতদের সাহায্য করার জন্য দৌড়ে যেতেই অন্য হেলিকপ্টার থেকে তাদের উপর গুলির বৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়া হল, এতে আরও হতাহতের ঘটনা ঘটল।

৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে ২২ বালুচের দুটি কোম্পানীও শহরে এসে পৌঁছাল। এছাড়া, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স থেকে পঞ্চাশজন ও ৩১ পাঞ্জাব থেকে পঁয়তাল্লিশজন লোক ছিল। তারা সবাই মিলে একটি ব্যাটেলিয়ন (মাইনাস)-এর সমান ছিল। চারটি ফিল্ড গান (৩১ পাঞ্জাব ও ২২ বালুচের প্রতিটি থেকে দুটি করে) জোগাড় করা হল। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে তিন ব্রিগেডিয়ার বসলেন - হাসান, রানা ও সলিমুল্লাহ - এক স্কেলিটন ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।

মিশ্র ব্যাটেলিয়ন ও চারটি ফিল্ড গান দেয়া হল ২২ বালুচের কমান্ডিং অফিসারকে যাতে তিনি হেলিকপ্টারে আসা বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ "ক্লান্ত-শ্রান্ত ফৌজ তখন আক্রমণের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় নেই"। পরদিন (৯ই



ডিসেম্বর), ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারকে একই দায়িত্ব অর্পণ করা হল কিন্তু তিনিও একই রকম কারণ দেখিয়ে মিশন প্রত্যাখ্যান করলেন।

১০ই ডিসেম্বর, আক্রমণের নতুন এক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হল। টাস্ক ফোর্সটির দুটি শাখা ছিল - ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ৩১ পাঞ্জাব। প্রথম শাখাটি সামনের দিক দিয়ে আক্রমণের ভান করবে আর পরেরটি উত্তর দিক থেকে নিঃশব্দে আক্রমণ চালাবে। নির্ধারিত সময়ে, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স 'আক্রমণের ভান করতে' চেঁচিয়ে উঠল, "আক্রমণ!" কিন্তু আরেক শাখা তাদের কাজ করতে ব্যর্থ হল।

আমরা যেখানে উৎখাত করার জন্য শত্রুকে খুবই শক্তিশালী মনে করছিলাম, সেখানে শত্রুর মনও তাদের নিজেদের পজিশনের টিকে থাকা নিয়ে সংশয়ে টলছিল। যুদ্ধের পর, ৫ গুর্খা রাইফেলস (হেলিকপ্টারে আসা বাহিনী)-এর একজন ভারতীয় অফিসারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ৭/৮-ই ডিসেম্বরের রাতে যখন প্রথম গোলাগুলি ছোঁড়া হয় তখন তার কমান্ডিং অফিসার 'সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া এড়াতে সরে যাওয়ার' কথা বলছিলেন। কিন্তু তার সিদ্ধান্তহীনতাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তান যখন কোনরকম চাপ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হল, তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে সেখানেই রয়ে যান।

এদিকে, শত্রুর স্থল বাহিনী জকিগঞ্জ পথে অগ্রসর হয়ে হেলিকপ্টারে আসা বাহিনীর সাথে যোগ দিল। এই যোগাযোগ কার্যকর হয়েছিল ১২ই ডিসেম্বর - হেলিকপ্টার অবতরণের পাঁচ দিন পর, যা আমরা নিষ্ক্রিয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম! ১৩ই ডিসেম্বর, আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা আরও গুটিয়ে নিলাম আর সিলেট শহরের একাংশ ও সালুটিকর এয়ারফিল্ড আমাদের নিয়ন্ত্রণে ধরে রেখে সন্তুষ্ট হয়ে বসে রইলাম। বাকী এলাকাগুলো ভারতীয় ও মুক্তি বাহিনীর দখলে থাকল। তিন ব্রিগেডিয়ার, আর তাদের লোকজন, ১৬ই ডিসেম্বর গন্ডগোলের শেষ পর্যন্ত সিলেটে টিকে ছিল।



২০শ অধ্যায়: চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি চাঁদপুর (৩৯ অ্যাড হক ডিভিশন)

নভেম্বরের মাঝামাঝি জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকায় বার্তা পাঠানো হল যে শত্রুর আক্রমণের মূল ধাক্কাটি পূর্ব দিক দিয়ে আসবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এজন্য, জেনারেল নিয়াজী মানচিত্র ও ভারতীয় ফৌজের অবস্থানের দিকে নতুন করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ডেপুটি মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর-জেনারেল মোহাম্মদ রহিম খানের সহায়তায়, তিনি কুমিল্লার দক্ষিণ পাশকে শত্রুর প্রবেশের সম্ভাব্য পথ বলে চিহ্নিত করলেন। তখন পর্যন্ত, এই এলাকা ১৪ ডিভিশনের অধীনে ছিল, যা অতিরিক্ত বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল। তিনি এই 'দুর্বল অংশ'-এর দায়িত্ব রহিমকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ও ঢাকা থেকে ৫৩ ব্রিগেড তাকে দিলেন, আর ১১৭ ব্রিগেডকেও (কুমিল্লা) তার অধীনে নিযুক্ত করলেন।

জেনারেল রহিম, যাকে ইয়াহিয়ার শাসনামলের যোগ্যতম জেনারেল বলে গণ্য করা হয়, মেঘনার পূর্ব দিকে চাঁদপুরে তার হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা করতে ২১শে নভেম্বর রবিবার হাতে গোণা কয়েকজন স্টাফ অফিসার আর এক গাদা অপারেশনাল মানচিত্র নিয়ে ঢাকা ছাড়লেন। তার হেডকোয়ার্টার ছিল মুদাফরগঞ্জ-চাঁদপুর মূল সড়কে, আর দুই পাশে কুমিল্লা ও ফেনীতে ছিল দুটি ব্রিগেড। পরিকল্পনা অনুযায়ী, শত্রু যদি এই সড়কে আসার দুঃসাহস করে, তাহলে দুই ব্রিগেড তাদেরকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে হত্যা করবে।

৩৯ ডিভিশনের দক্ষিণ সীমানায় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম যা বড় মাপের সামরিক কার্যক্রমের জন্য অনুপযুক্ত ছিল। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লাহর নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেডের (৯৭) অধীনে ছিল। পার্বত্য এলাকা দেখাশোনার জন্য কাপ্তাইয়ে তার একটি কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন (২ কমান্ডো) ছিল আর চট্টগ্রামে ছিল ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। অন্যান্য ফৌজের একটি মিশ্র বাহিনীও তার ছিল, যেখানে ছিল ২১ আজাদ কাশ্মীরের দুটি কোম্পানী, ইপিসিএএফ, রাজাকার ও পুলিশ। এই এলাকায় গুরুতর হুমকীর আশংকা ছিল না, শুধু সমুদ্রপথে অবতরণ ছাড়া, যা বাস্তবে প্রতিরোধ করা অসম্ভব, কারণ সমুদ্রতট ছিল সুদীর্ঘ।



মূল যুদ্ধ লড়তে হত কুমিল্লা ও বেলোনিয়া সীমান্ত এলাকার মধ্যে। পাকিস্তানের বিখ্যাত হকি দলের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আতিফের অধীনে কুমিল্লা ব্রিগেড (১১৭) পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তারা তাদের ক্যান্টনমেন্টকে নগরদুর্গে রূপান্তরিত করে এতে এক মাস চলার মত রসদ মজুদ করেছিল। এর পূর্ব পাশে তারা ট্যাংকরোধী গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। এদের তিনটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন - ৩০ পাঞ্জাব, ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ পাঞ্জাবকে - কুমিল্লার উত্তর থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল। ডিভিশনের ফ্রন্টে সহায়তা করতে এদের ছিল আর্টিলারীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট, একটি মর্টার ব্যাটারী ও দুটি ট্যাংক।

ফেনী ও বেলোনিয়া সীমান্ত এলাকা প্রহরার জন্য ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর (জেনারেল নিয়াজীর সাথে কোন আত্মীয়তা নেই) নেতৃত্বে ৫৩ ব্রিগেডের ছিল ১৫ বালুচ ও ৩৯ বালুচ। এই সীমান্ত এলাকার অর্ধেকটুকু যুদ্ধের আগেই শত্রুর দখলে ছিল। এর ফলে তাকে ফেনী-চট্টগ্রাম সড়ক দিয়ে প্রবেশ করতে হত যা ছিল সমুদ্রবন্দরের সাথে প্রদেশের বাকী অংশের একমাত্র যোগাযোগের পথ। শত্রুরা চট্টগ্রামে আঘাত হানার জন্য দক্ষিণ দিক দিয়ে না এসে বরং উত্তর দিক দিয়ে এই পথ অনুসরণ করতে পারত। কিন্তু জেনারেল নিয়াজীর কাছে এর সমাধানও তৈরি ছিল। তিনি ব্রিগেডিয়ার তাসকীনের অধীনে আরেকটি অ্যাড হক ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার (৯১) তৈরি করলেন আর তাকে এই প্রবেশ পথের দায়িত্ব দিলেন। তাসকীন তার অধীনে বেশির ভাগ ইপিসিএএফ সদস্যদের পেয়েছিলেন, তাকে ২১ আজাদ কাশ্মীরের দুটি কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার দেয়া হল যারা নভেম্বরের শেষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে পৌঁছায়।

৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হবার পর, এর ধাক্কা প্রথম অনুভব করেছিল কুমিল্লার দক্ষিণে থাকা ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। তাদের দুটি কোম্পানীকে পার্বতীপুর নদীর পূর্ব দিকে সীমান্তে নিযুক্ত করা হয় আর বাকী দুটিকে রাখা হয় পাশের লালমাই পাহাড়ী এলাকায়। ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার ছিল সামনের দিকের কোম্পানীর সাথে। ৩রা/৪ঠা ডিসেম্বরের রাতে সামনের দিকের কোম্পানী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৬১ মাউন্টেইন ব্রিগেডের আক্রমণের শিকার হয়। এই আক্রমণে সহায়তা করে মিডিয়াম গানের একটি রেজিমেন্ট ও ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন। প্রতিরোধকারীরা তাদের পদাতিক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে ও শত্রুর তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করে। কিন্তু শত্রুর চাপ শিথিল করার জন্য এটুকু যথেষ্ট ছিল না। ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার পার্বতীপুর নদীর এপাড়ে সরে আসার অনুমতি চাইলেন কিন্তু তাকে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হল।



তিনি যখন সামনের দিকে ব্যস্ত ছিলেন, ভারতীয়রা মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্বে পাশ থেকে এসে তার পজিশন ঘেরাও করে ফেলল ও নদীর পূর্ব তীর দখল করল। দ্রুতই ব্যাটেলিয়নটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ হারাল।

স্বাভাবিকভাবেই ব্রিগেডিয়ার আতিফ বিচলিত হয়ে পড়লেন যিনি দুটি ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। প্রথমত, ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পরিণতি কী হল? দ্বিতীয়ত, ব্যাটেলিয়নটি ধ্বংস হয়ে থাকলে শত্রুরা কোন দিকে অগ্রসর হয়েছে? তারা কি চাঁদপুরের দিকে যাচ্ছে, না কি কুমিল্লাকে ঘিরে ফেলার জন্য উত্তরের দিকে ঘুরে যাচ্ছে?

প্রাথমিকভাবে নিরীক্ষণের জন্য আতিফ ৩০ পাঞ্জাবের একটি লড়াকু টহল দল পাঠালেন। টহল দল কুমিল্লার দক্ষিণ দিকে ঘুরে বেড়াল আর ফিরে এসে ঐ এলাকায় শত্রুর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির খবর দিল। কিন্তু তাহলে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কোথায় গেল? তারা কি দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়েছে? সেরকমটাই করেছে বলে ধরে নিয়ে, ঠিক দক্ষিণে থাকা ২৩ পাঞ্জাবকে বার্তা পাঠানো হল যেন তারা ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সদস্যদের বরণ করে - কিন্তু সেখানে কেউই গেল না। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক হাবিলদার কুমিল্লায় এসে এই রহস্যের সমাধান দিল। সে এই খবর আনল যে, কমান্ডিং অফিসার তার দুই কোম্পানী নিয়ে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে! তার এই খবর নিশ্চিত করা হয় বিকালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত এক গর্বিত ঘোষণা দিয়ে যে, ছয়জন অফিসার ও দুইশ' লোকসহ একজন লেফটেন্যান্ট-কর্নেলকে বন্দি করা হয়েছে।

যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই এটি একটি বড় ধরণের বাধা হয়ে দাঁড়াল। ২৩ পাঞ্জাবকে তার উত্তর দিকের বাহু বাড়িয়ে দিয়ে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের রেখে যাওয়া ফাঁকা অংশটুকু পূরণ করার জন্য বলা হল, কিন্তু তারা এই নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হল, কারণ তারাও তখন ৩০২ ভারতীয় ব্রিগেড ও একটি ফিল্ড গান রেজিমেন্টের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। ৩রা/৪ঠা ডিসেম্বরের রাতে ২৩ পাঞ্জাব যখন আক্রমণের চাপের মুখে ছিল, তখন তারা ডাকাতিয়া নদীর এপাড়ে সরে আসার অনুমতি চাইল, কিন্তু তাদেরকে সম্মুখ প্রতিরক্ষায় অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হল। যা হোক, পরদিন অনুমতি প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল, যখন সরে আসা ছিল অসম্ভব! কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আশফাক আলী সৈয়দ, সূর্যাস্তের পর পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু দিনের বেলা যখন তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, মেজর জাফর ইকবাল, সৈন্য-সামন্তসহ লাকসাম থেকে তার কাছে



পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন, তখন ডাকাতিয়া নদীর পূর্ব পাড়ে দখল নেয়া শত্রুরা তার উপর গুলিবর্ষণ করল। অর্থাৎ ২৩ পাঞ্জাবের সরে আসার পথও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মেজর জাফর, ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীকে শত্রুর উপস্থিতির খবর দিলেন, কিন্তু তিনি এই তথ্য বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানালেন, বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই মুক্তিদের দেখেছ।"

লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সৈয়দ যখন তার পেছনে শত্রুর উপস্থিতির কথা জানলেন, তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করায় খুবই অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি বিকাল ৪:৩০-এ তার ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারের তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিলেন আর আহতদের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে লাকসামের দিকে রওনা দিলেন। তিনি লাকসামে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কোম্পানীগুলোকেও বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। কিনারের কোম্পানীগুলো সময়মত সরে আসতে পারলেও, চৌদ্দগ্রামে মেজর আকরামের অধীন সামনের দিকের কোম্পানী পারল না, কারণ তারা তখনও শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এই কোম্পানী যখন রাতের বেলা পিছু হটে আসা শুরু করল, তারা পার্বতীপুর মূল রাস্তা দিয়ে আসতে থাকল, যেটি ছিল ডাকাতিয়া নদীতে আমাদের গান পজিশন, কিন্তু তারা ধারণাও করতে পারেনি যে এই এলাকা এখন শত্রুর নিয়ন্ত্রণে আছে। ফলস্বরূপ, মেজর আকরাম সোজা গিয়ে শত্রুর আস্তানায় ঢুকে পড়লেন আর তার লোকজন কচুকাটা হল। তিনি নিজেও পেটে বিস্ফোরণের আঘাত পেলেন, আর ক্ষেতের মধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে রইলেন। পরদিন সকালে, ভারতীয়রা যখন তাদের পকেট তল্লাশি করতে এল, তারা মেজর আকরাম ও তার অল্প কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সৈন্যের দেহে বেঁচে থাকার কিছু লক্ষণ দেখতে পেল। তাদেরকে তারা নিকটতম ড্রেসিং স্টেশনে নিয়ে গেল। মেজর (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল) আকরাম এখনও ঐ পিছু হটার তিক্ত স্মৃতি আর স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন।

২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের আত্মসমর্পণ ও ২৩ পাঞ্জাবের সেনা প্রত্যাহার, শত্রুর পক্ষে চাঁদপুর সড়ক দিয়ে একটি বড়-সড় বাহিনী ঢুকানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা ফাঁকা করে দিয়েছিল। এজন্য ৫ই ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীকে সেনা প্রত্যাহার করে লাকসামে একত্র করে তার ব্রিগেড (১৫ বালুচ ও ৩৯ বালুচ) গঠন করার নির্দেশ দেয়া হল, যেখানে ২৩ পাঞ্জাবের ইতোমধ্যেই পতন হয়েছিল। মুদাফরগঞ্জ-চাঁদপুর সড়ক থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দক্ষিণে লাকসামকে নগরদুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। ২১ আজাদ কাশ্মীরের দুটি কোম্পানীর (অন্য দুটি কোম্পানী ছিল ১৪ ডিভিশনে) কমান্ডিং অফিসার



লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাইদীকেও লাকসামে অন্যদের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। ১৫ বালুচ, ৩৯ বালুচ ও ২১ আজাদ কাশ্মীর ৫ই ডিসেম্বর দিনের বেলা রওনা দিল না, কারণ তারা শত্রুর বিমান হামলার আশংকা করেছিল। তারা পরের রাতে তাদের সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন করল। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগানোর বদলে, 'যে যেখানে পারে সেখানে' রাত কাটানোর নির্দেশ দেয়া হল। পরদিন ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর তাদেরকে ব্রিফ করার কথা ছিল। এমন কি ৩৯ বালুচের কমান্ডিং অফিসার ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে ফোনও করলেন এটি বলার জন্য যে তিনি বেলোনিয়া প্রান্ত থেকে ঝটপট পিছু হটে এসে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন! তাকে বলা হল যে পরদিন সকালে তাদের উপর নতুন দায়িত্ব অর্পণের জন্য জিওসি লাকসামে থাকবেন।

পরদিন, ৬ই ডিসেম্বর, জেনারেল রহিম লাকসামের দিকে রওনা দিলেন। মুদাফরগঞ্জের কিছু আগে, তার পাইলট জিপটি মর্টার ও ক্ষুদ্র অস্ত্রের গোলাবর্ষণের মুখে পড়ল। তিনি তার যাত্রা মুলতুবী করে চাঁদপুরে ফিরে এলেন, কারণ গোলাগুলির মানে হল শত্রু এর মধ্যেই সড়কটি অবরোধ করে ফেলেছে। এর ফলে চাঁদপুরের সামনে এখন সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়াল। উদ্যম ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের এটিই সময়। একটি ব্রিগেড রইল লাকসামে, আরেকটি কুমিল্লায় অপেক্ষা করতে থাকল। সবকিছুর উপরে, জেনারেল রহিম, যার ছিল উজ্জ্বল পেশাগত অতীত, তিনি তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য চাঁদপুরে রইলেন। তিনি তার দুটি ব্রিগেড নিযুক্ত করে শত্রুর লেজে কাঁচির পোঁচ দিতে পারতেন যাতে তারা পিছনে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তী ছত্রিশ ঘন্টায় এরকম কিছুই ঘটল না। ব্রিগেডিয়ার আসলাম লাকসামে বসে 'নগরদুর্গ প্রতিরক্ষা গঠন করতে থাকলেন', আর ওদিকে শত্রুরা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হতেই থাকল। কুমিল্লা দেড়টি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে স্থানীয় যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারা নগরদুর্গের প্রতিরক্ষা খালি করে যেতে ইচ্ছুক ছিল না। এই নিষ্ক্রিয়তার সময়টুকু কাজে লাগিয়ে শত্রুরা মুদাফরগঞ্জ-চাঁদপুর সড়ক দিয়ে আরও ফৌজ ঢুকিয়ে ফেলল।

৭ই ডিসেম্বর লাকসাম থেকে আমাদের প্রথম কলাম বের হয়ে এল। ২১ আজাদ কাশ্মীরের একটি কোম্পানী আর ১৫ বালুচ ও ২৩ পাঞ্জাবের প্রতিটি থেকে একটি করে মোট দুইটি কোম্পানী নিয়ে দুই দলে ভাগ করা হল, প্রতিটির নেতৃত্বে ছিলেন একজন করে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল। তাদেরকে যে মিশন দেয়া হয়েছিল তা হল মুদাফরগঞ্জ থেকে শত্রুদের সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা, আর বাকীরা (৩৯ বালুচ) নগরদুর্গ সামলাবে। ১৫



বালুচ কলামের সরাসরি মুদাফরগঞ্জের দিকে যাওয়ার কথা ছিল, আর ২৩ পাঞ্জাব ও ২১ আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে লক্ষ্যে প্রবেশ করার কথা ছিল। প্রথম কলাম মুদাফরগঞ্জের বাইরেই গুলি বিনিময়ের মধ্যে ধরা পড়ল, আর দ্বিতীয়টির দেখাই পাওয়া গেল না কারণ পথে তারা মুক্তি বাহিনীর হামলার মুখে পড়েছিল। অবশেষে মুদাফরগঞ্জের উপর 'আক্রমণ'-টি ব্যর্থ হল।

যেহেতু মুদাফরগঞ্জে শত্রুর শক্তি বেশি বলে বিশ্বাস করা হচ্ছিল, এজন্য ১৫ বালুচকে লাকসামে ফিরে আসার জন্য বলা হল, আর অন্য কলামটিকে (২৩ পাঞ্জাব ও ২১ আজাদ কাশ্মীর) চাঁদপুর সড়কের আরও পশ্চিমে হাজীগঞ্জের দিকে রওনা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। এই বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আশফাক সৈয়দ ও লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাইদী সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে এক পাশ থেকে হাজীগঞ্জে আক্রমণ করবেন যাতে পথে শত্রুর মুখোমুখি হওয়াটা এড়ানো যায়। তারা ধারণাও করতে পারেননি যে, শত্রুরা পাকা রাস্তা ব্যবহার করে, তারা যেমনটা আশা করেছিল, তারও অনেক আগেই হাজীগঞ্জে গিয়ে বসে থাকবে।

৭ই ডিসেম্বর হাজীগঞ্জ কলাম লাকসাম ছেড়ে (মুদাফরগঞ্জের উদ্দেশ্যে) গেল, সাথে তাদের প্রয়োজনীয় রসদ নিল না কারণ তারা এই অপারেশন বেশিদিন চলবে বলে আশা করেনি। এখন, তাদের ফৌজের জন্য খাবারের প্রয়োজন দেখা দিল। তারা আতিথেয়তাহীন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে সারা দিন-রাত হাঁটতে থাকল আর যেখান থেকে পারে খাবার কিনে গ্রামের পুকুরের পানি খেল। তাদের কাছে রান্নার তৈজসপত্রও ছিল না। লাকসাম থেকে রান্না করা খাবারও পাঠানো যাচ্ছিল না, কারণ তারা কোন পূর্বনির্ধারিত পথ অনুসরণ করেনি, তারা মুক্তিবাহিনীর সন্দেহজনক আস্তানাগুলোকে পাশ কাটিয়ে ক্ষেত আর নালার মধ্যে দিয়ে এলোমেলোভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল।

তারা ভারী ওয়্যারলেস সেটগুলো, উদ্বৃত্ত লাইট মেশিনগানের গুলি আর ছেঁড়া বুটজুতোগুলো ফেলতে ফেলতে এভাবে প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা ধরে হাঁটল। অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তাদের কাছে রাতের বেলা গ্রামের বাড়ি-ঘরের প্রতিটি কাঁপতে থাকা আলোই শত্রুর কর্মকান্ডের সংকেত বলে মনে হত। এই যাত্রা ছিল ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত ফৌজের জন্য এক সহিষ্ণুতার পরীক্ষা।



লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আশফাক সৈয়দ ও লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাইদী ৯ই ডিসেম্বর ক্ষেতে বসে তাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে এই ঐক্যমতে আসলেন যে ধরা পড়ার ঝুঁকি কমাতে তাদের দলকে দুই ভাগ করবেন (সৈয়দের অধীনে ২৩ পাঞ্জাব ও জাইদীর অধীনে ২১ আজাদ কাশ্মীর)। পরদিন (১০ই ডিসেম্বর) দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এটি ছিল ৩৯ ডিভিশনের দ্বিতীয় বড় ধরণের আত্মসমর্পণ।

মেজর জেনারেল রহিম উপলব্ধি করতে পারলেন যে চাঁদপুর সড়ক দিয়ে অগ্রসর হওয়া শত্রু শীঘ্রই তার হেডকোয়ার্টারে আঘাত হানবে। তিনি নির্দেশের জন্য আবেদন করলেন। ৮ই ডিসেম্বর রাতে যখন তার অনুরোধ ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাল, জেনারেল নিয়াজীকে তার এই শীর্ষস্থানীয় জেনারেলের দুর্দশার খবর দেয়া হল। লাল প্রিন্টের স্যাটিন কাপড়ের ড্রেসিং-গাউন পরে তিনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি যখন অপারেশনস রুমে ঢুকলেন, আমিসহ সব জুনিয়র অফিসাররা যুদ্ধ নিয়ে যার যার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করছিলাম। জেনারেল নিয়াজী সোজা অপারেশনাল মানচিত্রের সামনে গিয়ে ৩৯ ডিভিশন এলাকায় যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি চাঁদপুরের উপর তার ডান হাতের তর্জনী রেখে মানচিত্রের উপর সজোরে চাপ দিয়ে তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিলেন: "রহিমকে ঢাকায় ফিরে আসতে বল। নদীর দিকে পিঠ দিয়ে সে কিভাবে চাঁদপুরে বসে আছে? তার হেডকোয়ার্টার রক্ষার জন্য তার কাছে একটিমাত্র কোম্পানী আছে।"

জেনারেল রহিমের সামনে সরে আসার জন্য শুধুমাত্র নদীপথ খোলা ছিল, তিনি তার বহরকে সঙ্গ দিতে নৌবাহিনীর একটি গানবোটের জন্য আবেদন করলেন। ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে যা কিছু তার নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল তার মধ্যে ছিল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুটি প্লাটুন, ২৩ পাঞ্জাবের একটি প্লাটুন, একটি কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের পঞ্চান্ন জন লোক আর কিছু বাড়তি কামান, সংকেতযন্ত্র ও রসদ। রহিম দিনের বেলা স্থানীয় উৎস থেকে প্রয়োজনীয় নৌযান জোগাড় করলেন যাতে ৯ই ডিসেম্বর রাতে ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা দিতে পারেন।

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকার সীমান্তে) থেকে নৌবাহিনীর গানবোট মধ্যরাতের দিকে চাঁদপুরে পৌঁছাল, কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর ভোর ৪:৩০-এর আগে রহিমের হেডকোয়ার্টার চাঁদপুর জেটি ছেড়ে যেতে পারল না। একটি দক্ষ নৌযানের চাঁদপুর থেকে ঢাকা যেতে স্বাভাবিক সময়



লাগার কথা চার ঘন্টা, কিন্তু এই জবরজঙ বহরের এই দূরত্ব পার করতে পাঁচ ঘন্টা লাগবে বলে অনুমান করা হল। এর মানে হল দিনের আলো ফুটতে ফুটতে বহরটি ঢাকার পথে মাত্র অর্ধেক রাস্তা পার হবে। এজন্য জেনারেল রহিম, চাঁদপুর ছাড়ার সময়, ইস্টার্ন কমান্ডকে সংকেত পাঠালেন যাতে তার যাত্রার শেষ অংশের জন্য বিমান প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত তিনি জানতেন না যে ৬ই ডিসেম্বর থেকেই আমাদের বিমান বাহিনী আর উড়তে পারছে না। বিকল্প হিসেবে তিনি আরেকটি গানবোট চাইলেন (অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বসানো), কিন্তু ঢাকার বিশেষজ্ঞরা তা এই বলে নাকচ করলেন যে বিমান হামলার বিরুদ্ধে একটির বদলে দুটি গানবোট এমন কিছু বেশি কার্যকরী হবে না - তাহলে দ্বিতীয় গানবোটকে কেন আর ঝুঁকির মুখে ফেলা হবে!

সকালের নাস্তার সময় - ভারতীয় জেটের নিয়মিত টহলের সময় ছিল সেটা - দুটি মিগ-২১ এসে বহরে আক্রমণ করল। জেটগুলোর বারবার দৃঢ় আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র গানবোটের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানগুলো অকার্যকর প্রমাণিত হল। নৌযানটি দ্রুতই আঘাতপ্রাপ্ত হল আর এর ছাদ উড়ে গেল। যার যার লঞ্চ থেকে বাকীরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, গানবোটটির ক্যাপ্টেন তখন তার নৌযান আঁকড়ে পড়ে রইলেন আর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে একে নদীর তীরে ভিড়ালেন। যার যার নৌকা আর লঞ্চ থেকে সবাই একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে শত্রুর জেটগুলো এই বেচারা শিকারদের শাস্তি দেয়া চালিয়ে গেল। চারজন অফিসার নিহত হলেন, এর মধ্যে ছিলেন মেজর বিলাল (২ কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন) যিনি ২৫শে মার্চ মুজিবের বাড়িতে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম, তিনি পায়ে চোট পেয়েছিলেন। তাকে ঢাকায় সরিয়ে নেয়া হল।

ওদিকে লাকসামের পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল। মাত্র পাঁচটি কোম্পানী নিয়ে নগরদুর্গ ধরে রাখা ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তার উপর, শত্রু যখন জেনারেল রহিমের পিছু নিয়ে ঢাকায়ই চলে যাবে তখন লাকসাম আঁকড়ে বসে থাকার আর অর্থ কী? সুতরাং ব্রিগেডটিকে ৯ই ডিসেম্বর পিছু হটে কুমিল্লায় ১১৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

লাকসামের অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশনে ১২৮ জন আহত সৈন্য ছিল যেটি স্থানীয় বেসামরিক হাসপাতালে গড়ে তোলা হয়েছিল। ৮ই ডিসেম্বর তাদেরকে চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে



ট্রেনে তোলা হল। চাঁদপুরের পরিণতি তখনও ভাগ্যের শিকায় ঝুলছিল বলে, আহতরা তৃতীয় শ্রেণীর বগিগুলোর মেঝেতে অন্ধকার রাত কাটাল। তাদের অনেকে গুরুতর অসুস্থ ছিল আর তৎক্ষণাৎ ঔষধ কিংবা শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু চিকিৎসকরা তাদের সবাইকে দেখতে পারছিল না, ক্যাপ্টেন হাশমি কেতলী ভর্তি ব্যথানাশক মিশ্রণ নিয়ে ট্রেনে উঠে কাতরাতে থাকা সৈন্যদের আধখোলা মুখে আনুমানিক একটি পরিমাণে ঐ তরল ঢেলে দিচ্ছিলেন। পরদিন, তাদেরকে নামিয়ে অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হল। এখন প্রশ্ন হল: তাদেরকে কি কুমিল্লায় আনা যাবে?

৫৩ ব্রিগেড চিকিৎসক ও আহতদের সরানোর ব্যাপারে তাদেরকে অন্ধকারে রেখেছিল। তারা তাদের বাকী শক্তিকে দুটি কলামে ভাগ করল। প্রথম কলামটি, মূলত ইপিসিএএফ, মুজাহিদ ও রাজাকাররা, ১০ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে লাকসাম ছেড়ে গেল। ২৩ পাঞ্জাবের মেজর রেশম এই দলের দায়িত্বে ছিলেন। দ্বিতীয় কলামটি আধা ঘন্টা পর রওনা দেয়, এর নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নাঈম। তার কাছে মূলত তার ৩৯ বালুচের নিজস্ব ফৌজ ছিল।

লাকসাম থেকে কুমিল্লার দূরত্ব মাত্র আটাশ কিলোমিটার আর সাধারণত এই দূরত্ব পায়ে হেঁটে গেলে কয়েক ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু এখন পথে ভারতীয় বা মুক্তি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে তাদেরকে তিনগুণ বেশি পথ ভ্রমণ করতে হবে। লাকসাম ছাড়ার আগে, ৫৩ ব্রিগেড তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস বা নষ্ট করে দিয়েছিল, তাদের গোলাবারুদের বাক্সগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছিল আর খাদ্য মজুদগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অস্ত্র আর ছোট থলিতে করে গুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পরদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী ও তার সহযাত্রীরা নিরাপদে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করল। মেজর রেশমের কোম্পানীও সেরকমটাই করল। কিন্তু লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নাঈম ও তার ফৌজ একটু সমস্যায় পড়ল।

লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নাঈম শত্রুদের এড়াতে অনির্ধারিত পথে এগুচ্ছিলেন যার বেশির ভাগই ছিল আকাবাঁকা। তিনি স্থানীয় বাড়িগুলোও (ছনের কুড়েঘর) পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে মুক্তি বাহিনীর হাতে তাদেরকে ধরা পড়তে না হয়। যখন পরের রাত ঘনিয়ে এল, তিনি তখন কুমিল্লার প্রায় এগার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙলিয়ার কাছে ছিলেন। সেখানে তিনি রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন সকালে, তিনি



কুমিল্লায় প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে যশপুরে শত্রুর পজিশনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দ্রুতই এটি ছোটখাট একটি যুদ্ধে রূপ নিল আর বিকাল পর্যন্ত থেমে থেমে গুলি বিনিময় চলল। এই ঘটনায়, আমরা কোম্পানী কমান্ডার মেজর তৈমুরসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে হারালাম। নাঈম তার ফৌজদের সরিয়ে রাতের জন্য আবার জঙলিয়ায় নিয়ে গেলেন আর পরদিন সকালে অন্য কোন দিক দিয়ে কুমিল্লায় প্রবেশের আশা করলেন।

১২ই ডিসেম্বর এল। নাঈম পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে তার অফিসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে তারা যেহেতু কুমিল্লা নগরদুর্গে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের উচিৎ হবে ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা দেয়া, আবার অন্যরা জোর দিল যে তাদের নির্দেশ মোতাবেক ১১৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আরেকবার চেষ্টা চালানো উচিৎ। তাই খুব সকালে, তারা জঙলিয়া ছেড়ে কুমিল্লা-ঢাকা সড়কের উদ্দেশ্যে উত্তরের দিকে হাঁটা শুরু করল। কয়েক কিলোমিটার যেতে না যেতেই সামনে থাকা সৈন্যরা রামমোহন ও চান্দিনার মাঝামাঝি ভারতীয় ফৌজের দেখা পেল। তারা থমকে দাঁড়িয়ে তাদের সাদা রুমাল বের করল, এরপর আবার শত্রুর দিকে যাওয়া শুরু করল। একটু পরেই, কলামটির বাকী অংশও চলে এল, আর ১২ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে তারা সবাই আত্মসমর্পণ করল। জেনারেল রহিমের ডিভিশনে এটি ছিল তৃতীয় বড় ধরণের আত্মসমর্পণ।

কুমিল্লা নগরদুর্গ তখনও টিকে ছিল। এখন এদের কাছে ছিল দুজন ব্রিগেডিয়ার, দুটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন আর দুটি ট্যাংক। তারা কুমিল্লা শহরের হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতর বসে রইল। বাংলাদেশের পতাকাতলে শহরটি কোন রকম বিমান প্রতিরক্ষার দেখা পেল না। এটি বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় জ্বলজ্বল করছিল, আর ওদিকে ক্যান্টনমেন্ট কার্যত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।

১৬ই ডিসেম্বর যখন ঢাকার পতন হল, কুমিল্লা গ্যারিসন তখনও টিকে ছিল।



২১শ অধ্যায়: চূড়ান্ত পশ্চাদপসরণ(৩৬ অ্যাড হক ডিভিশন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিলিটারী ক্রসজয়ী মেজর জেনারেল জামশেদ তার শান্ত ও ঠান্ডা মেজাজের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস (ইপিসিএএফ)-এর মহাপরিচালক। যেহেতু ইপিসিএএফ, রেঞ্জার্স, রাজাকার ও পুলিশ, এরা জেনারেল নিয়াজী ও তার নিম্নপদস্থ কমান্ডারদের অধীনে ছিল, তাই জেনারেল জামশেদের কাছে নেতৃত্ব দেয়ার মত তেমন কোন বাহিনী আর বাকী ছিল না। এজন্য, এজন্য তাকে দেয়া হলো অন্য এক দায়িত্ব। তাকে ৩৬ অ্যাড হক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং বানানো হল, যার উপর দায়িত্ব ছিল ঢাকা ও এর উত্তরের এলাকা দেখাশোনা করা, এর মধ্যে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডিভিশনের মোট এলাকা ছিল ১৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যা যমুনার (মূল ব্রহ্মপুত্র) পূর্ব তীর থেকে সিলেট জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই এলাকায় প্রবেশের দুটি মাত্র পথ ছিল যেগুলো ঢাকায় ঢুকে পড়ার জন্য শত্রুরা কাজে লাগাতে পারত। এগুলো হল পূর্বদিকে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহের প্রবেশপথ আর পশ্চিমে কামালপুর-জামালপুর পথ। এই ডিভিশনে মাত্র দুটি নিয়মিত পদাতিক ব্যাটেলিয়ন ছিল - ৩৩ পাঞ্জাব ও ৩১ বালুচ - এগুলো ছিল ৯৩ ব্রিগেডের অধীনে যার নেতৃত্বে ছিলেন অবসর গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে আসা এক বৃদ্ধ সৈনিক, ব্রিগেডিয়ার কাদির। ব্রিগেডিয়ার কাদির পূর্বদিকের প্রবেশ পথে ৩৩ পাঞ্জাবকে আর পশ্চিমেরটিতে ৩১ বালুচকে নিযুক্ত করলেন। তার নিজের হেডকোয়ার্টার তিনি ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা করলেন।

ব্যাটেলিয়নগুলোকে দায়িত্ব দেয়া হল যাতে যতক্ষণ পারে শত্রুকে দেরি করিয়ে দেয়; এরপর, এই 'বাড়তি সময়টুকু কাজে লাগিয়ে', তাদের ময়মনসিংহ ও জামালপুর নগরদুর্গে পিছু হটে আসার কথা। ছোট ব্রহ্মপুত্রের এপাড়ে অবস্থিত এই শহর দুটি 'অভেদ্য সীমারেখা' তৈরি করবে।

যুদ্ধের সময় এই সেক্টরে তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল; কামালপুর সীমান্ত চৌকির দৃঢ় প্রতিরক্ষা, ৯৩ ব্রিগেডের আত্মঘাতী সেনা প্রত্যাহার আর টাঙ্গাইলের কাছে ভারতীয় প্যারাট্রুপের অবতরণ, পরে এগুলো নিয়ে আমরা আবার ফিরছি।



'আমাদের ৯৩ ব্রিগেডের বিপরীতে, শত্রুদের ছিল ১০১ কমিউনিকেশন জোন, যার নাম শুনে শক্তি আঁচ করা কঠিন। এটি ছিলো শক্তিশালী এক সেনাবিন্যাস, যার নেতৃত্বে ছিলেন একজন মেজর-জেনারেল। যুদ্ধের আগেই, শত্রুরা ৯৫ ব্রিগেড দিয়ে এর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। এদের ছিল ফিল্ড আর মিডিয়াম আর্টিলারীর নিয়মিত শক্তি, যেখানে আমাদের কাছে দুই প্রবেশ পথ আগলানোর জন্য ছিল শুধুমাত্র ১২০ এমএম মর্টারের একটি ব্যাটারী।

উপরে যে দুই প্রবেশ পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে কামালপুর-জামালপুর পথেই শত্রুর মূল ধাক্কাটির আশংকা করা হচ্ছিল, যার ফলে তাদের সামনে টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকায় যাবার পথ খুলে যাবে। পূর্বদিকের প্রবেশ পথ, হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ ছিল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত, আর সেজন্য আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও ছিলো কম। কামালপুর, যা মানচিত্রে একটা ফোঁটার চেয়ে বেশি কিছু দেখা যায় না, এটিই ছিল পশ্চিমের পথে শত্রুদের জন্য মূল বাধা। তারা এই সীমান্ত চৌকি নিষ্ক্রিয় না করে বক্সীগঞ্জ, শেরপুর বা জামালপুরে গড়িয়ে ঢুকে যেতে পারবে না। এজন্য, শুরুতে যতটা দরকার মনে হয়েছিল, শত্রুরা তার চেয়ে আরও অনেক বেশি মনোযোগ দিল এর উপর।

১২ই জুন, ১৯৭১-এ সীমান্ত এলাকায় অভ্যুত্থান অভিযানের অংশ হিসাবে শত্রুরা প্রথমে এই এলাকায় কিছু শেল নিক্ষেপ করে যেন সাবধানবাণী জানিয়েছিলো। ৩১শে জুলাই তারা আবারও খোঁচা দেয়ার জন্য কিছু বিদ্রোহীকে পাঠায় 'আক্রমণ' করতে। এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়, আর বিদ্রোহী বাহিনী, যাদের মধ্যে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট/ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহী সদস্যরা, তারা পিছনে ফেলে যায় একটি হেভী মেশিন গান, বারোটি লাইট মেশিন গান, চারটি স্টেনগান, ত্রিশটি রাইফেল, একটি রকেট লঞ্চার আর অনেকগুলো লাশ। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের দুই মাসের বেশি সময়ের জন্য চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

২২শে অক্টোবর, নিয়মিত ভারতীয় ফৌজ, মুক্তি বাহিনীকে সাথে করে, সীমান্ত চৌকিতে আক্রমণ করে। একজন অফিসারসহ তাদের নয়জন আহত হয়, আর তারা সীমান্ত পার হয়ে পিছু হটে যায়। আরও শক্তি নিয়ে ১৪ই নভেম্বর তারা আবার আসে। ১৩ গার্ডস এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় আর বিদ্রোহীরা তাদের অনুসরণ করে। সীমান্ত চৌকিকে সামনের দিকে ব্যস্ত রেখে তারা পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে আর বক্সীগঞ্জ-কামালপুর সড়কে একটি ব্লকিং



পজিশন নেয়। দুপর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শত্রুর আর্টিলারী এই এলাকার উপর থেমে থেমে শেল নিক্ষেপ করতে থাকে, ওদিকে পদাতিক বাহিনী কিছু ভুয়া আক্রমণ মঞ্চস্থ করতে থাকে। মনে হচ্ছিল যে এই আক্রমণটি কোন জোর করে দখলের পুরুষোচিত প্রচেষ্টা নয়, বরং সীমান্ত চৌকিটিকে দুর্বল করার জন্য চালানো এক মানসিক অভিযান।

কামালপুরে আমাদের সত্তরজন নিয়মিত ফৌজ আর রাজাকার ও রেঞ্জার্সের একটি প্লাটুন ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন পেশীবহুল তরুণ অফিসার, ক্যাপ্টেন আহসান মালিক। তার কাছে ৮১ এমএম ক্যালিবারের তিনটি মর্টার ছিল। সীমান্ত চৌকিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর, পাশের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে একজন অফিসারের অধীনে একটি সংযোগ বাহিনী পাঠানো হল। প্রায় চার কিলোমিটার দূরের বক্সীগঞ্জ থেকে বহু কষ্টে দুটি ১২০ এমএম মর্টারও আনা হল যাতে প্রয়োজন হলে গোলাগুলিতে সহায়তা করতে পারে। মর্টারগুলো বসানোর কিংবা সংযোগ বাহিনী তাদের বাহন থেকে নামার আগেই শত্রুরা রাস্তার দুইপাশ থেকে গুলি ছোঁড়া শুরু করে দিল। ফৌজরা তড়িঘড়ি লাফিয়ে নেমে গুলির জবাব দিতে লাগল, কিন্তু শত্রুরা এগিয়ে রইল। আমাদের দশজন লোক নিহত ও একজন অফিসারসহ সাতজন আহত হল। আমাদের চারটি বাহন ও মর্টার দুটিও আমরা হারালাম। শত্রুরা আমাদের লাইট মেশিন গানগুলোর একটি নিয়ে গেল। এবার, সৌভাগ্য অন্য দিকটায় হাসি দিল।

এই চড়ামূল্যের সংযোগ প্রচেষ্টার পর, আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয় আমরা কামালপুর চৌকির ফৌজদেরকে পিছু হটে এসে বক্সীগঞ্জে আমাদের মূল বাহিনীর সাথে যোগ দিতে বলতে পারতাম, অথবা যেভাবেই হোক তাদেরকে রসদ সরবরাহ করে যেতে পারতাম। 'সামনের দিকে মুখ করে প্রতিরক্ষা' বজায় রাখার সরকারী নীতির কারণে প্রথম পথটি বাতিল হয়ে যায়। এজন্য, দ্বিতীয়টিই বেছে নিতে হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে, কামালপুর চৌকি পিছু হটে গেলে সীমান্তের অন্য চৌকিগুলোর (নকশী ও বড়মারী) এমনিতেই গুটিয়ে আসা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। ৩১ বালুচের এই তিনটি চৌকি খালি করে দেয়া হলে, ৩৩ পাঞ্জাবের পশ্চিম পাশটুকু উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। অন্য কথায় বলতে গেলে, একটি চৌকি খালি করা মানেই হল পুরো ব্রিগেডের প্রতিরক্ষাকে গুটিয়ে আনা।



নভেম্বরের মাঝামাঝিতে কামালপুর চৌকি বিচ্ছিন্ন করার পর, শত্রুরা একে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চালায়নি, ফলে চৌকির ফৌজরা খাবার ও গোলাবারুদের মজুদ কমে আসা স্বত্বেও চালিয়ে নিচ্ছিল। ২৩শে নভেম্বর, ক্যাপ্টেন আহসান রাজাকারের একটি দলকে টহল দায়িত্বে পাঠালেন। তারা আর চৌকিতে ফিরে আসেনি। এবার নিয়মিত ফৌজের আরেকটি দলকে তাদের খোঁজে পাঠানো হল। তারাও আর ফিরে আসেনি। কারণটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শত্রুরা সর্বশক্তি নিয়ে সব দিক ঘিরে ছিল, নিজ প্রতিরক্ষার বাইরে যে কোন বিচ্ছিন্ন দলকে পাওয়া গেলেই গোগ্রাসে গিলে ফেলার জন্য। এই পরীক্ষা আরেকবার চালিয়ে তৃতীয় একটি দলকে হারানোটা পাগলামী হত। রেডিওর মাধ্যমে ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারকে অনুরোধ করা হল, যেন হারানো টহল দলগুলোকে খুঁজতে সাহায্য করে।

ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে একটি বাড়তি গাড়িসহ এক দল সৈন্য পাঠানো হল যাতে সীমান্ত চৌকির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, হারানো লোকদের খোঁজ করে আর হতাহত হয়ে থাকলে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পথে এই ছোট বাহিনীটিকে অ্যামবুশ করা হল। আহতদের আনার জন্য নেয়া আমাদের বাড়তি গাড়িটি হারাতে হল, তবে দলের বাকী সদস্যরা বক্সীগঞ্জে হেঁটে ফিরতে পারল। পরবর্তী তিনদিনে একই রকম আরও প্রচেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু কোনটিই সফল হয়নি। অবশেষে, ৩৩ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান, ২৭শে নভেম্বর এই সীমান্ত চৌকির ঘেরাও ভেঙে একে নতুন জীবনের মুক্তির স্বাদ দেয়ার জন্য একটি দৃঢ় প্রচেষ্টা চালান। বক্সীগঞ্জ-কামালপুর সড়ক দিয়ে ও এর দুই পাশ দিয়ে তিনি তিনটি কলামকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, মিশন ছিল তিনটি দল ঐ সীমান্ত চৌকিতে গিয়ে একসাথে মিলিত হবে। একই সময়ে, অনুপ্রবেশকারীদের পালানোর সম্ভাব্য রাস্তাগুলো আটকে দিতে কামালপুর থেকে ছোট ছোট দল পাঠানো হল যাতে এই অপারেশনে শত্রুদের সবাইকে সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া যায়।

এদিকে, শত্রুরাও তাদের ঘেরাও করা ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করতে ঐ এলাকায় কিছু বাড়তি আর্টিলারী বসিয়েছিল। একজন আর্টিলারী পর্যবেক্ষক সীমান্ত চৌকিটির গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলোতে তীক্ষ্ম নজর রাখছিল।

আমাদের ত্রিমুখী বাহিনী একটু এগিয়ে যেতেই শত্রুর পর্যবেক্ষক তাদের উপর আর্টিলারী শেলের ভারী বর্ষণ শুরু করে দিল। তৎক্ষণাৎ, এগিয়ে যাওয়া কলাম মাটিতে শুয়ে পড়ল -



কিন্তু এর ফলে তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বয়ংক্রিয় গুলির শিকারই বানাল। শত্রুর হান্টারগুলো সীমান্তের উপর দিয়ে উড়তে থাকল, এটা দেখানোর জন্য যে, যদি দরকার হয়, আর্টিলারীর গোলার সাথে বিমান হামলাও যুক্ত করা যাবে। শেষ পর্যন্ত, সংযোগ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

পরদিন রাতে (২৭/২৮শে নভেম্বর), শত্রুরা এই বিচ্ছিন্ন চৌকি নিষ্ক্রিয় করতে আক্রমণ চালাল। রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে চালানো এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতীয় ১৩ গার্ডসের 'সি' কোম্পানী। কিন্তু কংক্রিটের বাংকার, আর এগুলোর ভিতরে থাকা এর চেয়েও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষগুলোর বদৌলতে, শত্রুরা শুধু ততক্ষণই ঘেরাও করতে পারল যতক্ষণ না তারা আমাদের ক্ষুদ্র অস্ত্রগুলোর কার্যকর সীমার মধ্যে আসে। তারা আমদের গুলিবর্ষণ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটে গেল। পরদিন সকালে, ক্যাপ্টেন আহসানের ফৌজ তাদের রাতের যুদ্ধের ফসল গুণতে গেল। এর মধ্যে ছিল শত্রুদের একজন আর্টিলারী পর্যবেক্ষকসহ বিশটি লাশ। নিশ্চুপ সেই পর্যবেক্ষকের কাছে একজন সৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা উদ্ধার করে আনল।

দুই সপ্তাহব্যাপী এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে নিয়ে আসে। প্রথমত, আমাদের এই সীমান্ত চৌকির শক্তিবৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা শত্রুরা ভেস্তে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বিচ্ছিন্ন চৌকি ছারখার করে দেয়ার জন্য শত্রুর সকল প্রচেষ্টা আমরা ভেস্তে দিয়েছি। এই চৌকি এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরও ফৌজরা বেশ উৎফুল্ল ছিল। রসদ একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকলেও মনোবলের কমতি ছিলো না। খাবার ও গোলাবারুদ, যা নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত চলার কথা, খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রসদগুলো সঞ্চয় করে রাখতে আহসান কঠোর কৃচ্ছসাধন আরোপ করেছিলেন। একটি মাত্র চাপাতি খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু শত্রুর মুখে পড়ে গুলি বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফৌজদের কেউ কেউ এতই আবেগী হয়ে পড়েছিল যে রাতের বেলা কোন ঝোপ-ঝাড়ের খস খস শব্দ কিংবা ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ বা শেয়ালের কাশি শুনলেও ট্রিগার চেপে দিত।

সবচেয়ে দুর্বিষহ ভুক্তভোগী ছিল পাঁচজন আহত সৈনিক যারা কোনরকম চিকিৎসা বা পুষ্টিকর খাবার ছাড়াই চৌকিতে পড়ে ছিল। একমাত্র সেবিকা সহকারী শুধুমাত্র তাদের ক্ষতগুলোর ড্রেসিং বদলে দিতে আর মাঝে মাঝে ব্যথানাশকের একটি ডোজ দিতে পারত। খাবারের ব্যাপারেও পরিস্থিতি একইরকম ভয়াবহ ছিল। ঘুঘু কিংবা বুনো কবুতর, আগে



যেগুলো শিকার করে আহতদের জন্য স্যুপ বানানো হত, তারাও মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন গোলাগুলির কারণে অন্য কোন নিরাপদ এলাকায় পাড়ি জমিয়েছিল। তারপরও চৌকিটি টিকে ছিল, শত্রুর মুখোমুখি এক অজেয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতীক হিসেবে।

মেজর আইয়ুব, যিনি ছিলেন এক চৌকস কোম্পানী কমান্ডার, ২৯শে নভেম্বর একটি পুনরুদ্ধার মিশনের উদ্যোগ নিলেন। তিনি সাথে নিলেন কিছু নিয়মিত সৈন্য আর রাজাকার যারা তাদের মাথায় করে গোলাবারুদের বাক্স আর তাদের খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। তারা সড়ক এড়িয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরপথে গেলেন। মেজর আইয়ুব চৌকিতে পৌঁছালেন, কিন্তু তার অনুসরণকারীরা কামালপুরের একটু আগেই শত্রুর গুলির মুখে পড়ল। তারা তাদের বোঝা ফেলে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বক্সীগঞ্জে ফিরে এল। আইয়ুবের উপস্থিতি ফৌজদের মনোবল অনেকখানি বাড়িয়ে দিল, যদিও তাদের কাছে লাইট মেশিন গানের মাত্র ২০০ রাউন্ড গুলি, বারোটি তিন-ইঞ্চি আর দশটি দুই-ইঞ্চি মর্টার শেল আর প্রতি রাইফেলম্যানের জন্য ৭৫টি করে বুলেট ছিল। পরদিন মেজর আইয়ুব হাতে কলমে রিপোর্ট দিতে ব্যাটেলিয়নে ফিরে এলেন।

এমন কি আইয়ুবের ফেরার পরও ঐ চৌকিতে কোন রসদ বা বাড়তি ফৌজ পৌঁছায়নি, কিন্তু তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন যুদ্ধের আগুন পুরোদমে ফেটে পড়েছিল। শত্রুতার মাত্রা এখন শত্রুর ক্রোধ এতই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তারা এই হোঁচট খাওয়া প্রতিরোধ উপড়ে ফেলতে আর কোন সময় নষ্ট করল না। ৪ঠা ডিসেম্বর কামালপুরের উপর দিয়ে দুটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার উড়তে দেখা গেল। পরিখার ভিতর থেকে পরিশ্রান্ত মুখগুলো উপরে তাকিয়ে এই আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে শেষ মুহূর্তে ঢাকা থেকে সাহায্য এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, সেগুলো ছিল শত্রু বাজপাখি যারা তাদের শিকার ধরার জন্য এসেছে। স্থলে, শত্রুরা তাদের ঘেরাও ছোট করে আনতে পাশ থেকে আরও কাছে এগিয়ে এল।

একই দিনে, চৌকিটি পুনরুদ্ধার করার জন্য মেজর আইয়ুব এক মরণপণ প্রচেষ্টা চালালেন। এই বীরোচিত প্রচেষ্টায়, তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। এ ছিল এক বড় ধরণের ক্ষতি, আর এর ফলে চৌকিটির সকল আশার আলো নিভে গেল। বিকালবেলা, একজন বাঙালী সাদা পতাকা হাতে নিয়ে ভারতীয় কমান্ডারের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন আহসানকে বলল যাতে অহেতুক রক্তপাত না ঘটিয়ে আত্মসমর্পণ করে।



বার্তাবাহককে চাঁচাছোলা জবাব দিয়ে বিদায় করা হল। এই দৃঢ় জবাবের পিছনে যা ইন্ধন জুগিয়েছিল তা ছিল শুধুই জেদি সংকল্প; একে সমর্থন দেয়ার জন্য আহসানের কাছে কিছুই জমা ছিল না। পরের রাতে, শত্রুর হাতে কামালপুর চৌকির পতন হল।

নকশী ও বড়মারী চৌকি থেকে প্রায় একই সময়ে সেনা প্রত্যাহার করা হল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে শেরপুরকে ঘিরে তার নতুন প্রতিরক্ষা গড়ে তুললেন। তার নতুন প্রতিরক্ষা সীমা গিয়েছিল ঝিনাইগাতী, কুড়িয়া, শেরপুর ও জাগান চরের উপর দিয়ে। পার্শ্ববর্তী ৩৩ পাঞ্জাব, ৩১ বালুচের পিছু হটার কারণে প্রভাবিত না হয়ে পারল না। তাই তাদেরকেও সুর্চা ঘাটে ফিরিয়ে আনা হল, যা প্রায় শেরপুর বরাবর ছিল, এই দুটিকেই তখন 'শক্তিশালী কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

৫ই ডিসেম্বর, শেরপুর প্রতিরক্ষার বাম পাশ চাপের মুখে পড়ল। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লাগল জাগান চর পজিশনের উপর। সেখান থেকে অফিসার জানালেন যে গোলাবারুদের অভাবে তাদের পজিশন ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে একটি ট্রাক বের হয়ে গেল। এটি শেরপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে তেরাস্তার মোড়ে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই জাগান চরের পিছু হটে আসা সৈন্যদের সাথে দেখা হল। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ফজল আকবর, আরও সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটে এসে তেরাস্তার মোড় থেকে এগিয়ে গিয়ে তার নতুন প্রতিরক্ষা গড়ে তুললেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। যখন নতুন পরিখা খননের পালা এল, ফৌজরা জানাল যে তাদের কাছে খননের কোন সরঞ্জাম নেই। অনুরোধ করার পর, আশে পাশের বাড়িগুলো (ছনের কুড়েঘর) থেকে দেশপ্রেমিক বাঙালীরা তাদের সরঞ্জাম নিয়ে এসে পাকিস্তান উদ্ধারের জন্য পরিখা খননে সাহায্য করল।

৩১ বালুচের এই লম্বা লাফ দিয়ে পিছু হটে আসায় ব্রিগেডিয়ার কাদির খুশি হননি। এমন কি তিনি কোন লড়াই ছাড়াই বক্সীগঞ্জ খালি করে এসে, সীমান্ত থেকে এত দূরে, শেরপুর প্রতিরক্ষারও অনুমোদন দেননি। এখন, জাগান চর থেকে আমাদের ফৌজ সরে আসাতেও তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এজন্য তিনি লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতানকে নির্দেশ দিলেন যাতে কুড়িয়ার দিক থেকে আক্রমণ করে চরটি পুনঃদখল করে। কিন্তু সুলতান এই নির্দেশ পালনে অপারগ ছিলেন, তিনি ৬ই ডিসেম্বর জামালপুরে সরে এলেন। এর ফলে ব্রিগেডিয়ার কাদির ৩৩ পাঞ্জাবকে ময়মনসিংহে সরে আসার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন।



আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জামালপুর-ময়মনসিংহ ছিল এই সেক্টরে আমাদের শেষ প্রতিরক্ষা সীমানা।

৭ই ডিসেম্বর শত্রুর বিমান ও আর্টিলারী জামালপুর নগরদুর্গের উপর বোমা ও শেল নিক্ষেপ করলেও খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। একই দিনে, শত্রুর ফৌজ নদীর উত্তর দিকে এসে পৌঁছায়, যার ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের সম্মুখ অবস্থানকে জলীয় বাধা পার হয়ে পিছনে সরে আসতে হয়। দুপুরের দিকে, শত্রুর কমান্ডারকে তার 'ও' দলের (সিনিয়র অফিসার) সাথে জামালপুরের উল্টোদিকে দেখা গেল, তবে তিনি আমাদের অস্ত্রের সীমার বাইরে ছিলেন। পরে, একই এলাকায় ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার একটি মাইনের উপর পা ফেলেন। তার জায়গায় আসেন মেজর-জেনারেল নাগরা।

পরের তিন দিন আমরা জামালপুর ও ময়মনসিংহের দখল ধরে রাখলাম, এই প্রতিরক্ষা সীমানায় এই দুটিই ছিল বলিষ্ঠ কাঁধের মত। শত্রুরা এই নগরদুর্গগুলো নিষ্ক্রিয় না করে দক্ষিণে ঢাকার দিকে আগাতে পারছিল না। জামালপুর ও ময়মনসিংহ প্রতিটির জন্যই তাদের প্রায় একটি ব্রিগেডের সমান শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যার ফলে ঢাকার দিকে সবলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট বাড়তি ফৌজ অবশিষ্ট থাকবে না। যেহেতু এই নগরদুর্গগুলো দৃঢ়ভাবে টিকে ছিল, এজন্য উত্তর দিক থেকে ঢাকা নিরাপদ আছে বলে মনে করা হচ্ছিল।

এই সময়ই, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার আত্মসমর্পণ করতে বলে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতানের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। সুলতান তাকে একজন সৈনিকের মতই জবাব দিলেন, তার চিঠিতে মুড়ে দিলেন একটি বুলেট। তিনি তাকে বলেছিলেন যাতে, "কলম ফেলে, স্টেনগান তুলে, লড়াই করে জিতে নেন"। এই আত্মবিশ্বাসী জবাবের ফলে এটিই প্রতীয়মান হয় যে জামালপুর নগরদুর্গে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু কিছু একটা গন্ডগোল হল ঢাকায়, যার ফলে মেজর-জেনারেল জামশেদ বাধ্য হয়ে ৯৩ ব্রিগেডকে নির্দেশ দিলেন যাতে 'অভেদ্য সীমারেখা' ছেড়ে এসে ঢাকা প্রতিরক্ষার বাইরের সীমায় কালিয়াকৈরে পুনঃসজ্জিত হয়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জেনারেল জামশেদের বাধ্যবাধ্যকতার ব্যাপারে আলোচনা করব।

১০ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার কাদির সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ পেলেন। তিনি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এই নির্দেশ বাতিল করার জন্য জিওসি-র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা



করলেন, কিন্তু পারলেন না। প্রতিবারই যখন তিনি ঢাকায় ফোন করেন, কোন এক স্টাফ অফিসার তাকে বলেন, "জেনারেল জামশেদ এখন জেনারেল নিয়াজীর সাথে বৈঠকে আছেন।" অন্যদিকে প্রায় প্রতি ঘন্টায় ঢাকা থেকে ফোন করে খোঁজ নেয়া হচ্ছিল যে ব্রিগেডটি পিছু হটে আসা শুরু করেছে কি না।

১০ই ডিসেম্বর দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার কাদির তার ব্যাটেলিয়নগুলোকে সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ পৌঁছে দিলেন। তাদেরকে জামালপুরের দক্ষিণে, মধুপুর সড়ক জংশনে একত্র হতে বলা হল। ৩৩ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানীকে সেখানে একটি বেজ তৈরি করতে আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ময়মনসিংহ গ্যারিসন, যার মধ্যে ছিল বহু ইপিসিএএফ সদস্য, রাজাকার, রেঞ্জার্স, পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবার আর দেশপ্রেমিক বাঙালী, সেই রাতেই ৯ টার সময় নগরদুর্গ ছেড়ে গেল। সবাই চেষ্টা করছিল সবার আগে বের হয়ে সামনে যে বাহন পায় তাতেই উঠে পড়তে। এমন কি কিছু বেসামরিক লোক তাদের দখল করা বাহনগুলোতে তাদের বিছানাপত্র, টিনের বাক্স, খাটিয়া আর ছাগল দিয়েও ভরে ফেলছিল। ব্যক্তিগত বাহনের বাঙালী চালকরা নিরাপত্তার খাতিরে এত সব বোঝা পরিবহন এড়াতে নানান মিথ্যা অজুহাত দেখাচ্ছিল - কিন্তু আদৌ কি কোথাও নিরাপত্তা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও!

শত শত পালাতে থাকা পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ৩৩ পাঞ্জাব, পথে কোন রকম বাধার মোকাবিলা ছাড়াই মধুপুর জংশনে পৌঁছাল, কিন্তু ৩১ বালুচের কাহিনী ছিল ভিন্ন। জামালপুর গ্যারিসন যখন যাওয়ার প্রস্তুতি নিল, তারা আবিষ্কার করল যে শত্রুরা তাদের সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে লড়াই করে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে নিবেন। তিনি তার কমান্ডকে দুটি দলে ভাগ করলেন। দুটি কোম্পানী নিয়ে গঠিত প্রথম দলটির কাজ হল ঘেরাও ভাঙা, আর দ্বিতীয়টির কাজ পার্শ্ব-প্রহরী ফৌজ, আহত ও প্রশাসনিক বাহনগুলো নিয়ে তাদের অনুসরণ করা।

লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতানের নেতৃত্বে প্রথম দলটি রাত ১১টার দিকে জামালপুর ছেড়ে গেল। দ্রুতই তারা শত্রুদের বাধার মুখোমুখি হল। ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষয়ক্ষতি আমাদের দিকেই হল, কারণ আমরা খোলা মাঠে ধরা পড়েছিলাম। প্রায় ত্রিশজন সৈন্য নিহত ও পঁচিশজন আহত হল। শত্রুদের হতাহতের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যায়নি। কর্নেল সুলতানের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট দলে পিছু হটে এল। দ্বিতীয়



দলটিও ঘেরাও ভাঙতে ব্যর্থ হল যদিও কেউ কেউ ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পরদিন বাকীরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। চিকিৎসকরা অসুস্থ ও আহতদের নিয়ে নগরদুর্গে রয়ে গেল, তাদের বন্দিকারীদের অপেক্ষায়।

অর্থাৎ, পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি ব্যাটেলিয়ন মধুপুর জংশনে একদল হতে ব্যর্থ হল। আবার, ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্য সামন্ত একত্র করে টেকসই বাহিনী পুনঃগঠন করতে ব্যর্থ হল। বাস্তবে, ব্রিগেডিয়ার কাদির আর তার অধীনস্থরা যখন পূর্বনির্ধারিত জংশনে ৩১ বালুচকে পেল না, তখন তারা টাঙ্গাইলের পথে রওনা দিয়ে দিল, পিছু হটে আসা ফৌজদের গ্রহণ করার জন্য মেজর সারওয়ারের পদাতিক কোম্পানী আর মেজর ই জি শাহের মর্টারগুলো পিছনে ফেলে গেল।

১১ই ডিসেম্বর সকালবেলা ব্রিগেডিয়ার কাদির ও তার সাথের লোকজন টাঙ্গাইল পৌঁছাল।

ব্রিগেডিয়ার কাদির ও অন্যরা টাঙ্গাইলে বিশ্রাম নিলেন, আর ইপিসিএএফ-এর লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আকবর ঢাকার উদ্দেশ্যে তার যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। দুই-তিন কিলোমিটার যেতে না যেতেই তিনি একটি মাইন বিস্ফোরণের ধ্বংসক্রিয়ার পরবর্তী রূপ দেখতে পেলেন। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আকবর পরে আমার কাছে এই দৃশ্যের বর্ণনা করেছিলেন: "একটি গাড়ি রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে আছে, আর তার চালক রক্তমাখা ধূলার উপর পড়ে ধুকছে। একটু বাঁয়ে বসে ছিলেন দ্বিগুণ-সজ্জিত লেফটেন্যান্ট-কর্নেল সুলতান, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভীতসন্ত্রস্ত ও নিরাশ। দৈবক্রমে, তখনই ৩১ বালুচের একজন দলছুট সৈনিক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জামালপুর দুর্ঘটনার পর প্রথমবারের মত নিজের কমান্ডিং অফিসারকে দেখতে পেয়ে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর সটান হয়ে সুলতানকে স্যালুট করল, সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোথায় আমার ফৌজরা? কোথায় আমার ব্যাটেলিয়ন?" ঐ সৈনিকের কাছে জবাব দেয়ার মত কিছু ছিল না, তাই সে সটান হয়ে আরেকবার স্যালুট করে হাঁটা ধরল। আমি সুলতানকে টাঙ্গাইলে ফিরিয়ে আনলাম।"

আকবর ও সুলতান মাইন ঘটনার ব্যাপারে ব্রিগেড কমান্ডারকে বললেন। এই ঘটনার ফলে ধরে নেয়া হল যে টাঙ্গাইল-ঢাকা সড়কে মাইন পোঁতা আছে। আসলে তা ছিল না, কারণ এরপর বহু দলছুট সৈন্য, এমন কি ভারতীয়রাও এই সড়ক নিয়মিত ব্যবহার করেছিল। ব্রিগেডিয়ার কাদির নানান সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক করছিলেন। মাইনগুলো কি তুলে ফেলা উচিৎ? তার কি টাঙ্গাইলেই থেকে যাওয়া উচিৎ?



বিকাল হল। ব্রিগেডিয়ার কাদির ও আরও কয়েকজন, সার্কিট হাউজের সাদা দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চমৎকার কিছু বুদ্ধি মাথায় আসার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তার বদলে যা এল তা ছিল শত্রুর বিমান, তারা টাঙ্গাইল থেকে নয় কিলোমিটার উত্তরে কালিহাতী এলাকায় লোক ও অস্ত্র নামাতে শুরু করল। দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পেলেন টাঙ্গাইলের পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপের বিশাল এলাকায় পরিবহন বিমানগুলো তাদের মালপত্র নামাচ্ছে। একটি প্যারাশুটের নিচে একটি অস্ত্র নেমে আসতে দেখে একজন অফিসার বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, "হায় খোদা! এ তো দেখি একটি ৩.৭-ইঞ্চি বন্দুক!"

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্রিগেডিয়ার কাদির উত্তেজিত হয়ে বীরের মত তার স্টেনগান তুলে ধরলেন আর প্যারাশুট অবতরণের এলাকা উদ্দেশ্য করে একটি ম্যাগাজিন খালি করে ফেললেন। এটি ছিল তার ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গী। এর জের ধরে তিনি মেজর সারওয়ারকে নির্দেশ দিলেন যাতে তার কোম্পানী (মাইনাস) নিয়ে গিয়ে 'শত্রুকে নিষ্ক্রিয় করে'। সারওয়ার নির্দেশ পালন করলেন কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন, "স্যার, স্থানীয়রা বলছে এরা চীনা।"

যদিও 'খবর'টি শুভচিন্তা নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে পৌঁছে গেল, কিন্তু এটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। পাকিস্তানী কমান্ডারদের সাথে আগে সমন্বয় না করেই তারা কিভাবে অবতরণ করতে পারল? শুরুর এই আশার ঝাপটাটি কেটে যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার কাদির বাস্তবে ফিরে এলেন। তিনি জানতেন যে টাঙ্গাইলের কোন প্রতিরক্ষা নেই। তিনি এও জানতেন যে তার ব্রিগেড সমন্বয় ও একতা হারিয়েছে। "তার উপর, আমাকে যে মিশন দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে কালিয়াকৈরে পৌঁছানো, টাঙ্গাইল প্রতিরক্ষার পুনঃসজ্জা করা নয়," এই বলে তিনি পিছু হটে আসা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার সাথে ছিল নিয়মিত ফৌজের একটি কোম্পানী, রেঞ্জার্স, ছয়শ' ইপিসিএএফ ও পুলিশ সদস্য এবং আধ ডজন অফিসার। তারা বিকাল ৫:৪৫-এর দিকে সবাই চিরদিনের জন্য টাঙ্গাইল ছেড়ে গেলেন। সার্কিট হাউজের ছাদে পাকিস্তানের পতাকা একাই পত পত করে উড়তে থাকল, যতক্ষণ না বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানোর জন্য পরে তা টেনে নামানো হয়।

এদিকে, ৯৩ ব্রিগেডের সৈন্যরা যারা মধুপুর থেকে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে সরে আসছিল, কালিহাতীর কাছে এসে সম্ভবত ভারতীয় প্যারাট্রুপ আর তাদের স্থানীয় দোসরদের ক্ষুদ্র



অস্ত্রের গুলির মুখের পড়ল। এই অস্থায়ী বাধাকে ঝেটিয়ে দূর করার বদলে, আমাদের ফৌজরা মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তাদের কেউ কেউ উল্টোদিকে ফিরে গেল, আর বাকীরা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল।

ব্রিগেডিয়ার কাদির আর তার দল যখন আগের সেই মাইন বিস্ফোরণের অকুস্থলে এলেন, তারাও কিছু রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন আর রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কালিয়াকৈর পর্যন্ত একশ' পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু মানুষের এত বড় দল পথে মুক্তি বাহিনীর চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, তাই তারা তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার কাদির তার সাথে আটজন অফিসার ও আঠারজন লোক রাখলেন, আর লেফটেন্যান্ট-কর্নেল তার দলে আরও কিছু বেশি লোক নিলেন। যারা কারুর অধীনেই নিজেদেরকে ঢুকাতে পারল না, তারা নিজেরাই ঢাকার দিকে রওনা দিল।

ব্রিগেডিয়ার কাদির ও আরও ছাব্বিশজনের কালিয়াকৈরে পৌঁছাতে তিন দিন চার রাত লাগে। বিস্তৃত খোলা মাঠ ও সন্ত্রাসীদের ঝামেলা এড়াতে তারা কাদা-জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেত, রাতের বেলায় ঠক ঠক করে কাঁপত আর দিনের বেলা উপোস করে কাটাত। তাদের কাছে টাকা ছিল কিন্তু কেউই তাদের কাছে খাবার বিক্রী করত না। এই কঠিন সময়ে মাত্র একবার একজন খোদাভীরু লোকের সাথে তাদের দেখা হয়েছিল যে তাদেরকে তার মাটির কলসী থেকে পানি খেতে দিয়েছিল, অন্যথায় তাদেরকে চুরি করা সব্জী আর পুকুরের নোংরা পানি খেয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছিল। এই যাত্রার এক দুঃসহ পর্যায়ে তাদেরেকে পুষ্টির জন্য বুনো পাতা চিবাতে হত আর জিহ্বা ভেজানোর জন্য শিশির চাটতে হত। তৃতীয় দিনে, যখন তারা জঙ্গলের ভেজা মাটিতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ছিল, একজন অফিসার পাতাসহ একটি গাছের ডাল ছিঁড়ে এনে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের সামনে ধরে বললেন, "স্যার, আস্তে আস্তে চিবিয়ে দেখুন। এতে তৃষ্ণা মেটে। আমি এমনটা করে দেখেছি।"

১৪ই ডিসেম্বর সকালে তারা কালিয়াকৈরের উত্তরে আবারও টাঙ্গাইল সড়কে এসে পৌঁছাল। যে সময়টুকুতে তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সাথে লড়ছিল, সে সময় শত্রুরা টাঙ্গাইল-ঢাকা সড়কের বেশির ভাগ অংশ দখল করে ফেলেছিল। শত্রুরা এই সড়ক ধরে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল তা জানা যায়নি। এজন্য ব্রিগেডিয়ার কাদির ও অন্যরা



রাস্তা থেকে দূরে গাছের সারির আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকলেন, আর একজন মেজর গেলেন আমাদের নিজেদের ফৌজের সন্ধানে যাদের কালিয়াকৈর এলাকায় থাকার কথা ছিল। তিনি কাউকেই খুঁজে পেলেন না। বরং, তিনিই শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন, তারা তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল আর তাকে কাজে লাগিয়ে বাকীদের খুঁজে বের করল। দ্রুতই তারা গাছের সারির দিকে চলে এল আর ব্রিগেডিয়ার কাদির ও তার সহযোগীদের দায়িত্ব নিয়ে নিল। এটি ছিল শত্রুদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক শিকার।

বিচ্ছিন্ন ৯৩ ব্রিগেড কালিয়াকৈরে থামেনি। তারা আক্ষরিক অর্থে নেতাহীন ছিল, আর এটাও জানত না যে তাদের নতুন প্রতিরক্ষা সীমা কোথায়? তারা মনে করছিল যত শীঘ্র সম্ভব ঢাকায় পৌঁছাতে পারলেই নিরাপদ হবে। ১৩ আর ১৪ই ডিসেম্বরে তাদের অনেকেই চরম বেহাল অবস্থায় সেখানে পৌঁছাল। আমি তাদের পৌঁছাতে দেখেছিলাম: তাদের দাঁড়ি কামানো নেই, গোসল নেই, এমন কি বুটজুতাও নেই। তাদের মুখ ছিল উপোস করা, চোখ ঘুমহীন আর গোড়ালি ফোলা। প্রদেশের রাজধানীর প্রতিরক্ষায় অংশ নেয়ার যোগ্য হতে তাদের কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টার প্রয়োজন ছিল।



২২শ অধ্যায়: ঢাকা: শেষ দৃশ্য

ঢাকায় মানসিকভাবে দুর্গ গড়ে তোলা আর সীমান্তের শারীরিকভাবে প্রতিরক্ষা করা যেন একে অন্যের উপর নির্ভর করছিল। একটির যে কোন উত্থান-পতন অন্যটির পরিণতির উপর প্রভাব ফেলছিল। এজন্য কোন কিছু যদি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারত, তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে যুদ্ধের অগ্রগতি। জেনারেল নিয়াজী, যিনি যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন লাহোর ফ্রন্টে আমাদের সাফল্যের দুর্বলভাবে সমর্থিত খবরে নিজেকে আক্ষরিক অর্থে একজন মুষ্টিযোদ্ধার মত বাঁকিয়ে ফেলেছিলেন, ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে ক্রমেই তার মোহমুক্তি ঘটল। প্রায় একই সময়ে, ভারতীয়রা ৯ ডিভিশনে যশোর ও ঝিনাইদহ দখল করল, ১৬ ডিভিশনের মূল যোগাযোগ সীমানায় জিওসি-কে অ্যামবুশ করল আর কুমিল্লা ও ফেনীর মাঝামাঝি ৩৯ অ্যাড হক ডিভিশনের দুর্বল অংশে আঘাত হানল।

সেই দিনই সন্ধ্যায়, যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে ডা: এ এম মালিকের কাছে ব্রিফ করার জন্য জেনারেল নিয়াজীকে গভর্নর হাউজে তলব করা হল, কারণ গভর্নর পরস্পরবিরোধী খবর পাচ্ছিলেন। জেনারেল নিয়াজীর চিফ অব স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী যেখানে সব ফ্রন্টিয়ারে বীরোচিত প্রতিরোধের খবর দিচ্ছিলেন, সেখানে ডিভিশন ও জেলা হেডকোয়ার্টার থেকে ভীতসন্ত্রস্ত বেসামরিক কর্মচারীরা টেলিফোন করে সেনা প্রত্যাহারের পর বেসামরিক জান-মালের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির কথা গভর্নরকে জানাচ্ছিলেন। গভর্নর মনে করলেন যে সত্যি খবরটা বের করার সর্বোত্তম উপায় হবে জেনারেল নিয়াজীর সাথে আলোচনায় বসা।

৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গভর্নর মালিকের সাথে জেনারেল নিয়াজীর বৈঠক তার (নিয়াজীর) জন্য খুবই অস্বস্তিকর এক অভিজ্ঞতা ছিল। সরকার ও জনগণের সামনে নিয়াজী এমন একটি অবস্থা বজায় রেখেছিলেন যা সত্যি দ্বারা সমর্থিত ছিল না। পুরোদস্তুর যুদ্ধের মাত্র চতুর্থ দিনেই কি একজন বেসামরিক গভর্নরের কাছে তার অবস্থার অবনতির কথা স্বীকার করা উচিৎ হবে? না কি, তার উচিৎ হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার মুখোশ ঝুলিয়ে রাখা? যদি তিনি শেষের রাস্তাটি বেছে নেন, কতদিন তিনি গভর্নর, সরকার আর জনগণকে বোকা বানাতে পারবেন?



গভর্নর মালিক, জেনারেল নিয়াজী আর আরও দুজন সিনিয়র অফিসার গভর্নমেন্ট হাউজের একটি আরামদায়ক ঘরে বসলেন। খুব একটা কথাবার্তা হল না। কয়েক মিনিট পর পরই নিরবতা আলোচনাকে ছাপিয়ে উঠছিল। বেশির ভাগ কথাই বললেন গভর্নর, আর তাও সাধারণ ভাষায়। তার আলোচনার মূল কথা ছিল: সময় কখনও এক রকম যায় না। পরিস্থিতি ভালো থেকে খারাপের দিকে যায়, আবার উল্টোটাও ঘটে। একইভাবে, একজন জেনারেলের পেশাগত জীবনেও উত্থান-পতন ঘটে। এক সময় মহিমাগৌরব তাকে বড় করে তোলে, আবার অন্য সময় পরাজয় তার সম্মানকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। ডা: মালিক তার বক্তব্যের শেষ অংশটুকু উচ্চারণ করতেই, জেনারেল নিয়াজীর দশাসই শরীরটি টলে উঠল আর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি দুই হাতে মুখ লুকিয়ে বাচ্চাদের মত ফোঁপাতে শুরু করলেন। গভর্নর তার বৃদ্ধ বাহু জেনারেল নিয়াজীর দিকে বাড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "আমি জানি, জেনারেল সাহেব, একজন কমান্ডারের জীবনে অনেক কঠিন দিন আসে। কিন্তু, আশা হারাবেন না। আল্লাহ ভরসা।"

জেনারেল নিয়াজী যখন ফোঁপাচ্ছিলেন, একজন বাঙালী ওয়েটার ট্রেতে করে কফি ও নাস্তা নিয়ে ঐ ঘরে ঢুকল। তাকে এমন ধমক দিয়ে বের করে দেয়া হল যেন সে ঘরটি অপবিত্র করে ফেলেছে। সে বের হয়ে এসে তার বাঙালী সহকর্মীদেরকে জানাল, "সাহেবরা ভিতরে কান্নাকাটি করছেন।" এই মন্তব্য গভর্নরের পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক সচিবের কানে গেলে তিনি ধমক দিয়ে বাঙালীদের চুপ করতে বললেন।

এভাবেই গভর্নর মালিক পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য অপারেশনাল ব্রিফিং বের করলেন। কথার বিনিময়ে চোখের পানি ফেলার পর, তিনি জেনারেল নিয়াজীকে বললেন, "যেহেতু পরিস্থিতি খারাপ যাচ্ছে, আমার মনে হয় আমার উচিৎ হবে রাষ্ট্রপতিকে তার করে বলে দেয়া যাতে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করেন।" জেনারেল নিয়াজী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, এরপর মাথা নিচু করে বললেন, "আমি তা পালন করব।" গভর্নর এই অনুযায়ী ইয়াহিয়া খানকে বার্তা পাঠালেন। অবশ্য, এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

জেনারেল নিয়াজী তার হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন। পরের তিন রাতের জন্য তিনি কার্যত শীতনিদ্রায় শুয়ে ছিলেন। এই সময়, ৮/৯ই ডিসেম্বরের রাতে আমি তার ঘরে গেলাম। তখন পর্যন্ত, আমি গভর্নমেন্ট হাউজের বৈঠকের



কথা জানতাম না। তাকে দেখলাম হাতের উপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন, প্রবেশকারীর দৃষ্টি থেকে মুখ পুরোপুরি লুকানো। তিনি কাঁদছিলেন কি না বলতে পারব না। আমার শুধু মনে আছে এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে তিনি যে মন্তব্যটি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সালিক, তোমার তারকাগুলোকে ধন্যবাদ দাও যে আজ তুমি জেনারেল নও।" এতে তার মর্মবেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি চলে এলাম, কিন্তু তার কথাগুলো সারারাত আমার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, আমার করুণা হচ্ছিল তার উপর।

তিনটি দিন - ৭, ৮ ও ৯ই ডিসেম্বর - জেনারেল নিয়াজীর জন্য খুবই দুর্বহ গেল। এই সময়ে, সবগুলো ডিভিশন তাদের সংবদ্ধতা হারায়। এমন কি তাদের অনেককে তথাকথিত 'অভেদ্য সীমানা' ছাড়িয়েও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আরও খারাপ ব্যাপার হল, পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন অর্জন হচ্ছিল না, যা পূর্ব পাকিস্তানে ভুক্ত ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে পারে। জেনারেল নিয়াজীর সব ফূর্তি উধাও হয়ে গিয়েছিল আর তিনি ঠাট্টা-তামাশা করাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন যার জন্য তিনি এত বিখ্যাত ছিলেন। তিনি খুব কম লোকের সাথে দেখা করতেন আর খিটখিটে ও অন্যমনস্ক থাকতেন। তার চোখে অনিদ্রার লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যেত। দায়িত্ববোধের চাপ স্পষ্টতই তার উপর দুর্বহ ভার হয়ে চেপেছিল।

এদিকে, সাধারণভাবে সব বিদেশী প্রচার কেন্দ্র, বিশেষ করে অল ইন্ডিয়া রেডিও, আমাদের পিছু হটার কাহিনী বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রচার করতে থাকল। আমাদের নিজস্ব রেডিও পাকিস্তান তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার চেষ্টায় আমাদের সাফল্যের কাহিনী একই রকম বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রচার করতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রোতাদের, বিশেষ করে বাঙালীদের, রেডিও পাকিস্তানের চেয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও আর অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর উপরই বেশি বিশ্বাস ছিল।

একই সময়ে, বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ঘোষণা করল যে জেনারেল নিয়াজী তার ফৌজদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে উড়াল দিয়েছেন। এটি সরাসরি তার প্রকাশ্য ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলায় তিনি তিক্ত হয়ে উঠলেন। ১০ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিনি হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হন আর লাউঞ্জে প্রথম যে লোকটিকে দেখতে পান, তাকেই বলেন, "কোথায় সেই বিবিসি-র ব্যাটা? আমি তাকে বলতে চাই যে, খোদা-তায়ালার অশেষ রহমতে আমি এখনও পূর্ব পাকিস্তানেই আছি।



আমি কখনই আমার ফৌজদের ছেড়ে যাব না।" এই ঘোষণা দেয়ার পর তিনি তার হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসেন।

যা হোক, জেনারেল নিয়াজীর উপস্থিতি বিদেশীদের এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারল না যে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবেন। তারা ডুবন্ত জাহাজ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়াতেই আগ্রহী ছিল। ৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ তাদের জন্য বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু রানওয়েতে তখনও অনেক গর্ত ছিল, আর ভারতীয় বিমান বাহিনী দিনে কমপক্ষে তিনবার করে এয়ারফিল্ডে আক্রমণ চালাত। ভারতীয় ও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা নিয়ে তারা কয়েক দিন পর পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে সক্ষম হল।

অনিশ্চয়তা আর নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি শুধুমাত্র পলায়নরত বিদেশী আর অবরুদ্ধ বেসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমিত ছিল না, সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের মনেও ঢুকে পড়েছিল। তাদের দু'জন, যারা তাদের কাঁধে বেশ ভালো পরিমাণেই ধাতব তারকা পরেন, আমার কাছে এসে বলেছিলেন, "তোমার তো জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাওয়া-আসা আছে। তুমি তাকে একটু বাস্তবধর্মী হতে বল না কেন , নইলে তো আমরা সবাই কুকুরের মত মারা পড়ব?" আমি এই পরামর্শ এড়ানোর জন্য বললাম যে যুদ্ধের মত এত স্পর্শকাতর বিষয়ে একজন কোর কমান্ডারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করাটা একজন প্রেস অফিসারের পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। জেনারেল নিয়াজীর সাথে আমি আর কথা বলিনি।

৮নিয়াজীর ট্যাক্টিক্যাল হেডকোয়ার্টারের ই ডিসেম্বরের রাতে জেনারেল৯/ সীমানার দেয়ালের কাছে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে এই অফিসারদের অনুভূতির কথা জানাই। তিনি বললেন , "হ্যাঁ, গভর্নরও এই ব্যাপারটা জানেন। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যাই হোক, আমরা এ ব্যাপারে কিছু একটা করব। "

পরদিন, গভর্নর রাষ্ট্রপতির কাছে একটি সাংকেতিক বার্তা পাঠালেন যেখানে অন্যান্য আরও অনেক কিছুর সাথে লেখা ছিল , "(আমিআরও একবার আপনার কাছে আর্জি (করছি, জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমঝোতার কথা ভেবে দেখুন। " ইয়াহিয়া খান আবারও তা উপেক্ষা করলেন কারণ তার কাছে নির্ভরযোগ্য সামরিক



রিপোর্ট হাতেনাতে দেয়ার মানুষটি ছিলেন জেনারেল নিয়াজী। যতদিন তিনি - আত্মবিশ্বাসী আছেন, ততদিন রাজনৈতিক যষ্টি খোঁজার দরকার নেই। অবশেষে ৯ই ডিসেম্বর সকালে ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার প্রথমবারের মত স্বীকার করল যে পরিস্থিতি 'চরম ভয়াবহ'। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সাংকেতিক বার্তা পাঠানো হল:

একআকাশপথে শত্রুদের কর্তৃত্বের জন্ :য পুনরায় দল গঠন করে পুনঃসজ্জা করা সম্ভব না। জনগণ চরম শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছে আর শত্রুদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। বিদ্রোহীদের তীব্র অ্যামবুশের কারণে রাতের বেলা কোন কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্রোহীরা শত্রুদেরকে ফাঁকফোকর আর পাশ- দিয়ে আসার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে। এয়ারফিল্ড ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গত তিনদিনে কোন মিশন চালানো যায়নি আর ভবিষ্যতেও চালানো সম্ভব না। এমন কি উদ্ধারকাজও খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। দুইশত্রুর আকাশপথে আক্রমণের : ফলে ভারী অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফৌজরা খুব দৃঢ়ভাবে লড়াই করলেও চাপ আর ধকলের ফলে লড়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। গত ২০ দিন ধরে কেউ ঘুমায়নি। তারা অনবরত বিমান, আর্টিলারী ও ট্যাংকের গোলাবর্ষণের মধ্যে আছে। তিনপরিস্থিতি : চরম ভয়াবহ, আমরা লড়ে যাব ও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। চারএই থিয়েটারে : শত্রুদের সকল এয়ার বেজের উপর অবিলম্বে আক্রমণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্ভব হলে ঢাকা প্রতিরক্ষার জন্য আকাশপথে ফৌজ পাঠানো হোক।

জেনারেল নিয়াজীর এই টেলিগ্রাম গভর্নর মালিকের আশংকাকে নিশ্চিত করল। তাই রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির গভীরতা অনুধাবন করে প্রাদেশিক গভর্নরকে প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃপক্ষ করে তাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বললেন। একই রাতে গভর্নর ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের কাছে পাঠানো রাষ্ট্রপতির টেলিগ্রামের মূল কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে গভর্নরকে পাঠানো হল ও ইস্টার্ন কমান্ডকে পুনরাবৃত্তি করা হল। আপনার আকস্মিক বার্তা পাওয়া গিয়েছে ও পুরোপুরি বোঝা গিয়েছে। আমাকে দেয়া আপনার প্রস্তাবগুলোর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনাকে আমি অনুমতি দিলাম। আমি আন্তর্জাতিকভাবে সব ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছি এবং নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যেহেতু আমরা একে অন্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আছি, পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে



সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আপনার সুচিন্তা ও সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম। আপনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন আমি তাই অনুমোদন করব আর আমি জেনারেল নিয়াজীকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তিনি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন।

এই বার্তার পরপরই জেনারেল নিয়াজীর কাছে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের আরেকটি বার্তা পৌঁছায়। এতে রাষ্ট্রপতির টেলিগ্রামের মূল কথাগুলোই আবার পুনরাবৃত্তি করে জেনারেল নিয়াজীকে বলা হয় যেন তিনি গভর্নরকে অপারেশনাল পরিস্থিতি নিয়ে তার খোলাখুলি পর্যালোচনা বর্ণনা করেন যাতে গভর্নর সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। হামিদ তাকে বেশির ভাগ অস্ত্রসরঞ্জামাদি - ধ্বংসের পরামর্শও দেন যাতে সেগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে। ১০ই ডিসেম্বর সকাল সকাল পাঠানো জেনারেল হামিদের এই টেলিগ্রামে নিচের বার্তাটুকু লেখা ছিল:

সেনাবাহিনীর সিওএসনোএর পক্ষ থেকে কমান্ডারের জন্য। গভর্নরের কাছে পাঠা- রাষ্ট্রপতির সাংকেতিক বার্তার যে নকল আপনাকে পাঠানো হয়েছে, সে প্রসঙ্গে। রাষ্ট্রপতি আপনার সাথে গভর্নরের একান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গভর্নরের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। যেহেতু আর কোন বার্তাই পরিস্থিতির গুরুত্বের ব্যাপকতা সঠিকভাবে দিতে পারবে না, এজন্য হাতে নাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমি শুধুমাত্র আপনার উপরই ছেড়ে দিতে পারি। যদিও এটি স্পষ্ট যে এসব এখন শুধু সময়ের ব্যাপার, যখন শত্রুরা যারা সংখ্যায় ও অস্ত্রশক্তিতে অনেক বেশি তারা বিদ্রোহীদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পুরোপুরি রাজত্ব করবে। এদিকে বেসামরিক জনগণের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আর সেনাবাহিনীতে বড় ধরণের হতাহতের ঘটনা ঘটছে। যদি পারেন তো আপনাকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা নির্ধারণ করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে আপনি গভর্নরকে খোলাখুলি আপনার পরামর্শ দিবেন আর গভর্নর তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন, যে দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি তার উপর ন্যস্ত করেছেন। যখনই আপনার কাছে প্রয়োজন বলে মনে হবে, আপনি বেশির ভাগ সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস করে ফেলবেন যাতে তা শত্রুর হাতে না পড়ে। আমাকে খবর জানাতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।

এখন যেহেতু গভর্নর এ এম মালিকের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন? তার সামনে খুব



বেশি রাস্তা খোলা ছিল না। জেনারেল নিয়াজী যদি লড়াই চালিয়েই যেতে পারতেন, তাহলে উপরের ঐ টেলিগ্রাম বিনিময়ের কোন দরকারই ছিল না। নিয়াজী যদি মনোবল হারিয়ই ফেলেন তাহলে তার সেই পতনশীল মনোবলকে পুনরুজ্জীবিত করতে গভর্নরের তেমন কিছু আর করার থাকে না। এজন্য , ডাএ এম : মালিক, রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়ে আসতে যুদ্ধবিরতির কথা ভাবলেন যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাহিনীর সেনা প্রত্যাহার। এই কাজের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নেয়া হল জাতিসংঘের সহকারী সাধারণ সচিব, জনাব পল মার্ক হেনরীকে, যিনি তখন ঢাকায় ছিলেন।

জনাব হেনরীকে যখন বার্তাটি হস্তান্তর করা হল তখন গভর্নরের সাথে ছিলেন গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ফরমান আলী এবং মুখ্য সচিব জনাব মুজাফফর হোসেন। এই অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকেও অবগত করা হয় , ১০ই ডিসেম্বর ডামালি :কের পাঠানো সাংকেতিক বার্তায়:

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির জন্য। যেহেতু চূড়ান্ত ও চরম সিদ্ধান্তটি নেয়ার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, আমি নিম্নলিখিত বার্তাটি আপনার অনুমোদনের পর সহকারী সাধারণ সচিব জনাব পল মার্ক হেনরীর কাছে হস্তান্তর করছি। বার্তা শুরুপূর্ব পা :কিস্তানের মাটিতে পুরোদস্তুর যুদ্ধে নিজেদেরকে জড়ানো কখনই পশ্চিম পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। তারপরও, এমন পরিস্থিতির উদয় হয়েছে যে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধে নামতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সবসময়ই ছিল যেন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারগুলি নিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, যে কারণে আপোসবাহিনী আলোচনা চালু ছিল। সশস্ত্র - বীরের মত কঠিন চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং এখনও তা চালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু আরও রক্তপাত ও নিরীহ লোকের প্রাণনাশের ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আমি নিচের প্রস্তাবগুলো রাখছি। যেহেতু এই সংঘাত শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে , এর শেষও হতে হবে রাজনৈতিক সমাধান দ্বারা। সেজন্য, আমি যেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি, এখন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আহ্বান করছি যেন তারা ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সরকার গঠন করেন। এই প্রস্তাব রাখতে গিয়ে আমি নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করছি এই বলার জন্য যে পূর্ব পাকিস্তানের



জনগণের ইচ্ছানুসারে তাদের দেশের মাটি থেকে ভারতীয় বাহিনীও অবিলম্বে সরে যাওয়ার দাবী রাখে। এজন্য আমি জাতিসংঘকে আহ্বান করছি যেন ক্ষমতা ও অনুরোধের শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে। এক অবিলম্বে : যুদ্ধবিরতি। দুই : শ্চিম পাকিস্তানে সসম্মানেপাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর প প্রত্যাবাসন। তিনপশ্চিম : পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক সকল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তির প্রত্যাবাসন। চার : সাল থেকে ১৯৪৭পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সকল ব্যক্তির নিরাপত্তা। পাঁচপূর্ব পাকিস্তানের : কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেয়ার নিশ্চয়তা। এই প্রস্তাব রাখতে গিয়ে, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এটি ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি বিবেচনা করা হবে না আর প্রশ্নও ওঠে না এবং এই প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় তাহলে সশস্ত্র বাহিনী রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। বার্তা শেষ। জেনারেল নিয়াজীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি নিজেকে আপনার নেতৃত্বে সমর্পণ করেছেন।

জাতিসংঘের সামনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব একবার চলে আসার পর , এটি সারা বিশ্বের কাছে আর গোপন রাখা গেল না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিদেশী কেন্দ্র এর বিষয়গুলো প্রচার করে দিল। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে জাতিসংঘের কাছে পাকিস্তানের মামলাটি দুর্বল হয়ে পড়ল, যেখানে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী (মনোনীতজেড এ ভুট্টো আমাদের মামলাটি (নিয়ে সুবিধাজনক সিদ্ধান্তের জন্য ওকালতি করছিলেন। এর জের ধরে, রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারী মুখপাত্র ১৩ই ডিসেম্বর একটি সংবাদ সম্মেলনে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে সরাসরি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করছি, যদি কেউ পারে তো এমন কোন দলিল বা বক্তব্য দেখাক যেখানে আত্মসমর্পণের সামান্য ধারণার কথাও প্রস্তাবিত হয়েছে।) ''পাকিস্তান টাইমস, রাওয়ালপিন্ডি, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।(ঢাকাতেও এমনটা জানানো হয় যে আপনার প্রস্তাবগুলো খুব বেশি '' বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছেআপনি অভিন্ন পাকিস্তানের কাঠামো অনুসারে সিদ্ধান্ত '' আর '' নিবেন বলে আশা করা হয়েছিল।''

মেজর জেনারেল ফরমান আলী, যাকে সাধারণত এসব প্রস্তাবের লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়, পরে আমাকে বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য যাতে আ''মাদের কমান্ডাররা তাদের বাহিনীর পুনঃসজ্জা করে তাদের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দের নিয়ে সরকার



বলতে আমরা যা বুঝিয়েছি তা হল ১৯৭০এর নির্বাচনে কিংবা পরবর্তী- নির্বাচনে যে সকল পাকিস্তানপন্থী বাঙালী এমএনএ আর এমপিএ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হবে। ভারত যদি একে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে ধরে নিয়ে আবারও শত্রুতা শুরু করত, তো আমরা নতুন উদ্যমে তার মোকাবিলা করতাম।"

এই প্রস্তাবগুলোর মূল সারমর্ম যাই হোক, রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারী মুখপাত্রের দ্বারা এগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় যুদ্ধবিরতির বিষয়টি কিছু সময়ের জন্য ধামাচাপা পড়ে রইল। সম্ভবত, ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোকে আরও সময় দিতে চাইছিলেন যাতে বিশ্বনেতাদের সামনে তার কুটনৈতিক দক্ষতা প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন।

নিয়াজীর মনোযোগ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে তার মনোবল বাড়ানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডি এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল। তাকে বলা হল যে বাইরে থেকে 'নৈতিক ও বস্তুগত সাহায্য' আনা হচ্ছে বিশেষ করে - পাকিস্তানের দুই পাশে হস্তক্ষেপ করার জন্য 'উত্তর থেকে হলুদরা আর দক্ষিণ থেকে সাদারা' আসছে। ঢাকা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিল যে এখানে ভারতের সোভিয়েত সাহায্য নিষ্ক্রিয় করতে চীনা ও আমেরিকানদের কথা বলা হচ্ছে। এই 'সুখবরটি' সকল ফৌজের কাছে ছড়িয়ে পড়তে দেয়া হল, যারা সবগুলো সেক্টরে কঠিন চাপের মুখে ছিল। এই খবর ফাঁস করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের ঝিমিয়ে পড়া উদ্দীপনাকে পুনঃজাগরণ করা। পিছু হটে আসা ৯৩ ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার কাদিরের অধীনে) টাঙ্গাইলের কাছে একজন ভারতীয় প্যারাট্রুপকে নামতে দেখে একই বিভ্রান্তিতে পড়ল। প্রায় একই সময়, ট্যাকটিকাল হেডকোয়ার্টারে একজন ব্যাটম্যানকে দুই ব্যান্ডের ট্রানজিস্টর রেডিওর সাথে আঠার মত লেগে থাকতে দেখলাম। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তার মোচড়ানো টুপিটা ঠিক করতে করতে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করল। আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম, "খবর কী?" সে ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, "চীনা বা আমেরিকান সাহায্যের ব্যাপারে কোন খবর নেই।"

রাওয়ালপিন্ডির এই ধাপ্পাবাজীর কিছুটা অস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল। সৈন্যরা আকাশ তাকিয়ে থাকত আর (আমেরিকানদের জন্য) আর সমুদ্রের দিকে (চীনাদের জন্য) কিছু সময় বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করত যাতে এই বন্ধুরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু কেউই এল না।



ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সর্বশেষ খবর জানতে রাওয়ালপিন্ডির গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলোতে অধৈর্য্য হয়ে ফোন করা হচ্ছিল। সবাই বলছিল এটি 'শীঘ্রই' ঘটতে যাচ্ছে। যখন কোন ইতিবাচক অগ্রগতি ছাড়াই কঠিন আটচল্লিশটি ঘন্টা পার হয়ে গেল, রাওয়াপিন্ডিতে তখন আরও একবার ফোন করা হল। জেনারেল হেডকোয়ার্টার আবারও জবাবে বলল 'শীঘ্রই'। এক স্টাফ অফিসার এই কথোপকথন শুনতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, "জিজ্ঞেস কর, তাদের এই 'শীঘ্রই' কত শীঘ্র আসবে?"

ঢাকায় চীনা ও আমেরিকার কুটনৈতিক প্রধানদের সাথেও পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হল। তারা জানাল যে তাদের নিজ নিজ সরকারের এমন কোন পদক্ষেপের ব্যাপারে তাদের জানা নেই। জেনারেল নিয়াজী এই গুজব নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া কিংবা জেনারেল হামিদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিলেন। অবশেষে, ইস্টার্ন কমান্ড রাওয়ালপিন্ডিকে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক করে বলুন, এই 'বন্ধুদের' জন্য আমাদের আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?" জবাব এল, "আরও ছত্রিশ ঘন্টা।নতুন " সময়সীমা স্থির হল ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

এদিকে, অপারেশনাল পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল। ৯ ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড হার্ডিঞ্জ সেতু পার হয়ে এসেছিল। ১৬ ডিভিশনকে চূড়ান্তভাবে দুই অংশে ভাগ করে ফেলা হয়েছিল। ১৪ ডিভিশন সিলেট ও ভৈরব বাজারে আটকা পড়ে গিয়েছিল। ৩৯ অ্যাড হক ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের অস্তিত্বই হারিয়ে গিয়েছিল। ৩৬ অ্যাড হক ডিভিশনের একমাত্র ব্রিগেডটি ঢাকায় সরে আসার সময় ছিন্নভিন্ন হয়ে-গিয়েছিল। সবগুলো ডিভিশনাল সেক্টর, সাবসেক্টরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল যার ফলে শত্রুরা ঢাকা দখল করতে নতুন ফৌজ প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত ফাঁক ফোকর পেয়ে-গিয়েছিল।

যা হোক, বাহ্যিকভাবে দেখলে, শত্রুরা তখনও 'ঢাকা বোল'-এর বাইরে ছিল। তাদের শুধুমাত্র নরসিংদীতে একটি হেলিকপ্টারে আসা বাহিনী আর টাঙ্গাইল এলাকায় একটি প্যারা ব্যাটেলিয়ন ছিল। এই দুই বিচ্ছিন্ন বাহিনী প্রাদেশিক রাজধানীর উপর গুরুতর হুমকী সৃষ্টি করতে পারত না, যদি না স্থল বাহিনী মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র কিংবা গঙ্গা (যমুনা) পার হয়ে তাদের সাথে যোগ দিত। (পদ্মা) ভারতকে নিজেদের এলাকা থেকে অতিরিক্ত



ফৌজ আনতে হত, ঢাকার দিকে ট্যাংক, আর্টিলারী ও ভারী সরঞ্জামাদি পরিবহন করে নিয়ে আসতে নদীর উপর সেতু নির্মাণ করতে হত অথবা নৌযানের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হত। এছাড়া, নদীপথের বাধার মোকাবিলা করতে তাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগরদুর্গও নিষ্ক্রিয় করতে হত, যেগুলো তখনও টিকে ছিল। কম করে ধরলেও, ভারতের রাষ্ট্রদখল করার জন্য পর্যাপ্ত বাহিনী একত্র করতে আরও কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় লেগে যেত।

ইস্টার্ন কমান্ড এইজন্য ধৈর্য্য হারায়নি যে তারা ঢাকার চারদিকে শত্রু বাহিনীর কোন ভারী দলের মুখোমুখি হয়েছে। তারা এইজন্য ভয়ে কাঁপছিল কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে এই 'লিঞ্চপিন' প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকায় কোন নিয়মিত ফৌজ নেই। আমি দেখেছি ব্রিগেডিয়ার বকর মরিয়া হয়ে সকল বাহিনীর কাছে অনুরোধ করছেন যেন ঢাকা প্রতিরক্ষার জন্য একটি ব্রিগেড, বা অন্তত একটি ব্যাটেলিয়ন বাঁচিয়ে রাখে। তিনি ব্রিগেডিয়ার আতিফকে বলেছিলেন যেন কুমিল্লা নগরদুর্গ ছেড়ে দিয়ে ঢাকার পূর্ব দিকে পুনরায় নিযুক্ত হয় , কিন্তু আতিফ মনে করলেন এই নিরাপদ আশ্রয়ে তার সতর্কভাবে তৈরি করা প্রতিরক্ষা ছেড়ে পিছু হটে আসাটা বোকামী হবে। মেজর জেনারেল কাজীকে ভৈরব বাজার থেকে সরে আসতে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি 'নৌপথে পর্যাপ্ত পরিবহনের অভাবে' তা করতে পারেননি। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহকে অনুরোধ করা হল যাতে ৫৭ ব্রিগেডকে পাঠিয়ে (ডিভিশনের ৯মূলত) দেন, কিন্তু তিনি পাঠাননি। তিনি একটি ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটি যমুনা পার হতে ব্যর্থ হয়।

এই ছিল পরিস্থিতির সেই পর্যায় যখন মেজর জেনারেল জামশেদ ৯৩ ব্রিগেডকে নির্দেশ দেন যেন তারা জামালপুর-ময়মনসিংহ এলাকা থেকে পিছনে সরে এসে ঢাকার উত্তর সীমানায় পুনরায় নিযুক্ত হয়। তিনি ব্রিগেডিয়ার কাদিরের সাথে ফোনে কথা বলা এড়িয়ে গেলেন যাতে তিনিও তার নির্দেশ অমান্য করার জন্য কোন ছুতো না বের করেন। ব্রিগেডিয়ার কাদির ছিলেন একমাত্র কমান্ডার যিনি তার উর্ধ্বতনের ইচ্ছানুসারে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু পথে তার বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যদিও দেশের পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল, জেনারেল নিয়াজী তখনও বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে দৃঢ়ভাব বজায় রেখেছিলেন। ১১ই



ডিসেম্বর তিনি তার হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে স্থানীয় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ও ঢাকা বিমানবন্দরের অ্যান্টিএয়ারক্রাফট প্রতিরক্ষা পরিদর্শনে- গেলেন। আমি তার সাথে ছিলাম। হাসপাতালে তার সামনে আধ ডজন পশ্চিম পাকিস্তানী সেবিকা এসে আকুল আবেদন জানালো যাতে 'বর্বর মুক্তি বাহিনী'-র হাত থেকে তাদের রক্ষা করা হয়। তিনি তাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করলেন কারণ বড় ধরণের সাহায্য আসার পথে আছে। আর যদি সাহায্য না আসে, তিনি বললেন, "মুক্তির হাতে পড়ার আগে আমরা নিজেরাই তোমাদের মেরে ফেলব।"

সেখান থেকে তিনি এয়ারফিল্ড এলাকায় গিয়ে কিছু গান পজিশন পরিদর্শন করলেন। তিনি সেনাদের উৎসাহব্যঞ্জক কথা শোনালেন, কিন্তু বললেন, "তোমাদের পজিশনের সামনের ডেড গ্রাউন্ডের দিকে খেয়াল রেখ। নিজেদের ব্যক্তিগত অস্ত্র প্রস্তুত রেখ। " ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে ফেরার জন্য গাড়ি ঘোরাতেই তিনি দেখলেন ঢাকা বিমানবন্দরের বাইরে বিদেশীদের বড়সড় ভিড়-, সবাই অপেক্ষা করছে ব্যাংককের ফ্লাইটের জন্য। তিনি ভাবলেন তার পালিয়ে যাওয়ার গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এদের সামনে 'দেখা দেয়ার' এটিই মোক্ষম সুযোগ। ভিড়ের মধ্যে থাকা সাংবাদিকরা তাকে কৌতুহলী প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল। তার উত্তরগুলো ছিল ঝটপট, তিক্ত আর ছলনাময়। প্রশ্নোত্তরগুলোর কিছু কিছু ছিল এরকম :

প্র: ভারত দাবী করে যে তার বাহিনী ঢাকার দোরগোড়ায় চলে এসেছে। তারা কত দূরে আছে?

উ: যাও নিজে গিয়ে দেখে আসো।

প্র: আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী কী?

উ: আমি রক্তের শেষ বিন্দু, গুলির শেষ রাউন্ড পর্যন্ত লড়ে যাব।

প্র: ঢাকা থেকে ভারতীয়দের দূরে রাখার জন্য আপনার কি পর্যাপ্ত বাহিনী আছে ?

উ: ঢাকার পতন হবে শুধুমাত্র আমার লাশের উপর দিয়ে। তাদেরকে [নিজের বুক দেখিয়ে] এর উপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে যেতে হবে।



প্রশ্নের বন্যা লাগামহীনভাবে চলতে থাকল। কিছুর উত্তর দিয়ে , বাকীগুলোর সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে, তিনি দ্রুত পালিয়ে গেলেন আর তার ভূ-গর্ভস্থ হেডকোয়ার্টারে সেঁধিয়ে গেলেন। ১০ থেকে ১৩ই ডিসেম্বরের আশাপূর্ণ সময়টুকুতে আমি জেনারেল নিয়াজীর মেজাজে সামান্য পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তিনি তখনও দুশ্চিন্তায় ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েননি। তার ঠাট্টাতামাশা বিলুপ্ত হলেও-, তার ফোঁপানোও বন্ধ ছিল। তিনি পৌরুষদীপ্তভাবে তার বিকারগ্রস্ততাকে আটকে রেখে নিজের উপর ভালো নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, ফাঁকা বুলি হওয়া সত্ত্বেও, এর প্রভাব ঠিকই ফেলেছিল।

অবশ্য, নিয়াজীর মেজাজের এই পরিবর্তন, অপারেশনাল পরিস্থিতির উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। ১০ই ডিসেম্বর দেয়ালের লিখন থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে মেজর জেনারেল জামশেদ ঢাকা প্রতিরক্ষায় তার দায়িত্ব পালন শুরু করে দিয়েছেন। এভাবে জেনারেল নিয়াজীকে আরও নেপথ্যে সরিয়ে ফেলা হল।

অপারেশনস রুমের পশ্চিম দেয়ালে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অপারেশনাল মানচিত্র পিন দিয়ে টাঙানো ছিল। ঢাকার দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষার- ব্যবস্থা করার জন্য জামশেদ সেখানে একটি পরামর্শসভার আয়োজন করলেন। তার ডেপুটি, ব্রিগেডিয়ার বশির আহমেদ ঢাকার চারপাশে ডিম্বাকৃতির রেখা টেনে নতুন প্রতিরক্ষা নির্দেশ করছিলেন। দাগগুলো মানচিত্রের উপর ভারী চিত্তাকর্ষক দেখাচ্ছিল। এগুলো দেখতে কুন্ডলী পাকানো গোখরা সাপের মত লাগছিল , মনে হচ্ছিল যে এরা শত্রুদের ছোবল মারবে যদি তারা এদেরকে স্পর্শ করারও দুঃসাহস করে।

কাগজেকলমের বন্দোবস্ত অনুসারে ঢাকার ভিতরের ও বাইরের পরিসীমায় - প্রতিরক্ষা থাকার কথা ছিল। বাইরের স্তর, বা রক্ষাকারী ফৌজের থাকার কথা ছিল উত্তরপশ্চিমে - মানিকগঞ্জ, উত্তরে কালিয়াকৈর, উত্তরপূর্বে নারায়ণগঞ্জ-, পূর্বে দাউদকান্দি ও দক্ষিণ-পূর্বে মুন্সিগঞ্জের সীমানায়। আশা করা হচ্ছিল যে ৯৩ ব্রিগেড (ময়মনসিংহ), ২৭ ব্রিগেড (ব বাজারভৈর), ১১৭ ব্রিগেড (কুমিল্লা৩৯এবং (অ্যাড হক ডিভিশন (চাঁদপুর) পিছিয়ে এসে যথাক্রমে কালিয়াকৈর, নরসিংদী, দাউদকান্দি ও মুন্সিগঞ্জে অবস্থান নিবে। যদিও, এই আশা কোনদিনই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। ভিতরের প্রতিরক্ষা গড়ার কথা



ছিল মিরপুর সেতু, টঙ্গী, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জ বরাবর। কর্নেল ফজলে হামিদ, ব্রিগেডিয়ার কাসিম ও ব্রিগেডিয়ার মনসুরকে ঢাকার এই পশ্চিম , উত্তর ও পূর্বদিকের প্রবেশপথের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, আর ব্রিগেডিয়ার বশিরের মূল শহর দেখাশোনা করার কথা ছিল।

যেহেতু ঢাকায় কোন সংগঠিত বাহিনী ছিল না , মানচিত্রের চিহ্নিত পজিশনগুলো পূরণ করতে বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের সংগ্রহ করার চেষ্টা চালানো হল। আরেকটি পরামর্শসভা বসানো হল আর বিভিন্ন বাহিনী, বিভাগ ও আধাসামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদেরকে তাদের ব্যবহারযোগ্য ফৌজের শক্তির বিবরণ দিতে বলা হল। পদাতিক বাহিনী, প্রকৌশলী, আইনজীবী, সাংকেতিক বার্তাপ্রেরক, তড়িৎ ও যন্ত্র প্রকৌশলী এবং সেনাবাহিনীর সার্ভিস কোরের প্রতিনিধিদের মিলিয়ে মোট লোকবল দাঁড়াল বারোটি কোম্পানীর সমান। এদের সাথে যোগ করা হল প্রায় ১,৫০০ ইপিসিএএফ, ১,৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ বিশ্বস্ত রাজাকার সর্বমোট লোকবল ।(আল বদর) দাঁড়াল প্রায় ৫,০০০এ। এই জগাখিচুড়ি বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে বিভিন্ন অফিস - থেকে উদ্বৃত্ত ষ্টাফ অফিসারদের নিয়ে আসা হল।

এদের বেশির ভাগের কাছে ছিল পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি রাইফেল। অতিরিক্ত গোলাগুলির শক্তি দিতে বিভিন্ন উৎস থেকে ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন, তিনটি মর্টার (ইঞ্চি-৩), চারটি রিকয়েললেস রাইফেল, দুটি ছয়পাউন্ডার গান আর অল্প- কিছু লাইট মেশিন- গান সংগ্রহ করে বিভিন্ন দিকে ভাগ করে দেয়া হল। এই'ভারী অস্ত্রগুলো' মূলত কালিয়াকৈরটঙ্গ-ী পথে বসানো হল যেহেতু এই দিক থেকেই ভারতীয় প্যারা ব্রিগেডের আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল। গোলাবারুদের কোন কমতি ছিল না, শুধু আর্মার ও আর্টিলারী ছাড়া।

মানুষ ও অস্ত্রের এই বিন্যাস কাগজে কলমে আকর্ষণীয় দেখাতে পারে-, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল একেবারেই শূণ্য। ফৌজরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল , অস্ত্রগুলোও ছিল প্রাগৈতিহাসিক, ত্রুটিযুক্ত ও অকার্যকর। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, তাদের কারুর লড়াইয়ের ইচ্ছা ছিল না। তারা তাদের জায়গায় পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিল, সামান্য ধাক্কায়ও পড়ে যাবে এমনভাবে।



১৩ই ডিসেম্বর, উত্তর সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ব্রিগেডিয়ার আমাকে তার অভেদ্য বন্দোবস্ত দেখানোর জন্য টঙ্গীতে নিয়ে গেলেন। দেখুন'', পিচ ঢালা রাস্তা এইভাবে কাটা হয়েছে মাইন বসানোর জন্য।ঐ ঢালুতে কামানের মুখটা'' '' হচ্ছে আমাদের গান পজিশন। টঙ্গীঢাকা সড়কের এই পাশে রয়েছে আমাদের- রিকয়েললেস রাইফেলগুলো। আরও সামনে ঐ গাছের সারিগুলোর কাছে রয়েছে ট্যাংক।'' এরপর আরও কাছ থেকে দেখতে আমরা জিপ থেকে নামলাম। রিকয়েললেস রাইফেলগুলো বসানো তো হয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য ভুল গোলাবারুদ বরাদ্দ করা হয়েছে। মর্টারগুলোর 'বোমা' তো আছে, কিন্তু কোন 'সাইট' নেই। একটি গান শত্রুর বিমানের আক্রমণে ধুলিস্যাৎ হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিও একই পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। শুধুমাত্র মেশিনগুলোর মানুষ গা- ও গোলাবারুদ দুটোই আছে।

কুর্মিটোলা এয়ারফিল্ডের কাছে এক তরুণ মেজরকে ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগছে তোমার?" "আমি ঠিক আছি, কিন্তু ফৌজরা একটি মাত্র মর্টার আর দুটি মেশিনগান দিয়ে শক্তিশালী ভারতীয় আক্রমণ ঠেকানোর ব্যাপারে যথেষ্ট- আত্মবিশ্বাসী না।বোকার মত কথা বলো না তো। ওদের উ'' ''ৎসাহ দাও। যুদ্ধ কখনও অস্ত্র দিয়ে জেতা যায় না।''

ওদিকে, ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে, ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী ঢাকায় সড়ক- যুদ্ধের বন্দোবস্ত করার কথা বলছিলেন। কিন্তু একজন এই ব্যাপারটি তুলে ধরলেন, "শত্রুভাবাপন্ন জনগণে ভরপুর একটি শহরে আপনি কিভাবে সড়কযুদ্ধের বন্দোবস্ত - করবেন? রাস্তায় আপনাদের একদিক দিয়ে ভারতীয়রা, আর অন্যদিক দিয়ে মুক্তি বাহিনী কুকুরের মত তাড়া করবে।ধারণাটি এখানেই '' চুপসে গেল।

শত্রুর শক্তি আমার আমাদের নিজেদের বাহিনীর দিকে তাকালে, ঢাকা প্রতিরক্ষা ছিল এক তাসের ঘরের মত। সড়কযুদ্ধের ব্যাপারে যতদূর বলা যায়, এটি সামগ্রিক অপারেশনাল কৌশলের অংশ ছিল না। হঠাৎ করেই এটি মাথায় খেলে গিয়েছিল, কোন গুরুত্ব ছিল না এর। যেমন করে একজন মানুষ ডুবে যেতে থাকলে শুধু শুধুই খড়- কুটো আঁকড়ে ধরে।



২৩শ অধ্যায়: আত্মসমর্পণ

মেজর জেনারেল রহিম, যিনি চাঁদপুর থেকে পালানোর সময় সামান্য আহত হয়েছিলেন, প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেনারেল ফরমানের বাড়িতে ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। তিনি বাড়ির একটি নির্জন ঘরে শুয়ে থাকতেন। ফরমান তার সাথে থাকতেন। ১২ই ডিসেম্বর এল, পুরোদস্তুর যুদ্ধের নবম দিন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মন দিনের সবচেয়ে কঠিন বিষয়টির প্রতিই নিবিষ্ট ছিল: ঢাকাকে কি প্রতিরক্ষা করা সম্ভব? তারা খোলাখুলি মত বিনিময় করছিলেন। রহিম এ ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন যে যুদ্ধবিরতিই একমাত্র উত্তর। রহিম যেখানে সব সময় ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘায়িত ও নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধের কথা বলতেন, সেখানে তার কাছে থেকে এমন পরামর্শ শুনে ফরমান আশ্চর্য হলেন। বিদ্রুপের সুরে তিনি বললেন, "ব্যস! দানে মুক গ্যায়ে - ইতনি জলদি" (ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললে - এত তাড়াতাড়ি!) রহিম জোর দিয়ে বললেন যে ইতোমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

এই আলোচনা চলার মাঝেই, 'আহত জেনারেলকে' দেখতে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াজী ও মেজর-জেনারেল জামশেদ ঘরে ঢুকলেন। রহিম তার পরামর্শ নিয়াজীর কাছে পুনরাবৃত্তি করলেন, যিনি কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তখন পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের প্রত্যাশা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিষয়টি এড়িয়ে, ফরমান পাশের ঘরে কেটে পড়লেন।

রহিমের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে, জেনারেল নিয়াজী ফরমানের ঘরে গিয়ে বললেন, "তাহলে রাওয়ালপিন্ডিতে সাংকেতিক বার্তা পাঠাও।" মনে হল তিনি জেনারেল রহিমের পরামর্শ মেনে নিয়েছেন, যেমনটা শান্তির সময় তিনি সবসময় করতেন। জেনারেল নিয়াজী চাইছিলেন যেন গভর্নমেন্ট হাউজ রাষ্ট্রপতিকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠায়। ফরমান বিনয়ের সাথে বললেন যে প্রয়োজনীয় বার্তাটি ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার থেকে যাওয়া উচিৎ, কিন্তু জেনারেল নিয়াজী জোর দিয়ে বললেন, "না, বার্তা এখান থেকে যাক বা ওখান থেকে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার আসলে অন্য জায়গায় কিছু জরুরী কাজ আছে, তুমি ওটা এখান থেকেই পাঠাও।" ফরমান আরেকবার 'না' বলার আগেই, মূখ্য সচিব মুজাফফর হোসেন ঘরে ঢুকলেন, আর এই আলোচনা শুনতে পেয়ে নিয়াজীকে



বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন। সাংকেতিক বার্তাটি এখান থেকেই পাঠানো যায়।" মতবিরোধের এখানেই অবসান হল।

জেনারেল ফরমান যে জিনিসটির বিরোধিতা করছিলেন সেটি স্বয়ং যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নয়, বরং এর প্রেরক কর্তৃপক্ষ কে হবে, তা নিয়ে। একই বিষয়ে তার পাঠানো আগের সাংকেতিক বার্তাটি রাওয়ালপিন্ডিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল - একবার কামড় খেয়ে দ্বিতীয়বার ঐ পথে পা বাড়ানোটা লজ্জাকর হবে। জেনারেল নিয়াজী তার 'জরুরী কাজ' ধরার জন্য উধাও হলেন, আর মুজাফফর হোসেন এই ঐতিহাসিক বার্তার খসড়া করলেন। ফরমান দেখে দেয়ার পর গভর্নরের কাছে এটি পেশ করা হল, তিনি ব্যাপারটি অনুমোদন করে ঐ সন্ধ্যায়ই (১২ই ডিসেম্বর) রাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তায় ইয়াহিয়া খানের প্রতি আকুল আবেদন করা হয় "যেন নিরপরাধ জীবন বাঁচাতে যা কিছু করা সম্ভব, সব করেন।"

পরদিন গভর্নর ও তার প্রধান সহচররা রাওয়ালপিন্ডি থেকে নির্দেশ আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন, কিন্তু দেখা গেল রাষ্ট্রপতি এতই ব্যস্ত যে সিদ্ধান্তও নিতে পারছেন না। এর পরের দিন (১৪ই ডিসেম্বর), যেজন্য উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক স্থির করা হয়েছিল, তিনটি ভারতীয় মিগ সকাল ১১:১৫-তে গভর্নমেন্ট হাউজে হামলা করল আর প্রধান হলরুমের বিশাল ছাদটি উড়িয়ে দিল। গভর্নর দৌড়ে এয়ার-রেইড শেলটারে এসে তাড়াহুড়া করে কাঁপা হাতে তার পদত্যাগপত্র লিখলেন। এই হামলায় এই বাড়ির প্রায় সবাই রক্ষা পেল, শুধু অ্যাকুইরিয়ামের কিছু মাছ ছাড়া। তারা গরম নুড়ি পাথরের উপর অস্থির হয়ে লাফাতে লাফাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

গভর্নর, তার ক্যাবিনেট আর পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক কর্মচারীরা ১৪ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসে উঠলেন, একে ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস 'নিরপেক্ষ এলাকায়' রূপান্তরিত করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী ভিআইপিদের মধ্যে ছিলেন মূখ্য সচিব, পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল, ঢাকা বিভাগের কমিশনার, প্রাদেশিক সচিব ও আরও অল্প কয়েকজন। নিরপেক্ষ এলাকায় প্রবেশাধিকার পেতে তারা 'পাকিস্তান সরকার' লেখা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছিলেন, কারণ একটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রের কারুরই রেড ক্রস সুরক্ষা পাবার অধিকার ছিল না।



১৪ই ডিসেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শেষ দিন। সরকার ও গভর্নমেন্ট হাউজের ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাংলাদেশের সিজারিয়ান জন্মদান সম্পূর্ণ করতে শত্রুকে শুধুমাত্র জেনারেল নিয়াজী ও তার বিশৃঙ্খল বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করতে হত। এতদিনে জেনারেল নিয়াজীও বিদেশী সাহায্যের সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি তার আগের সেই হতাশার মেজাজে দ্রুত ফিরে গেলেন আর তার সুরক্ষিত কুঠুরী থেকে কদাচিৎ বের হতেন। তিনি সময়ের রথে চড়ে বসেছিলেন, এর গতি বা দিকের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই।

এজন্য তিনি প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে (যিনি কমান্ডার-ইন-চিফও ছিলেন) অবগত করলেন আর নির্দেশের জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আমার উপস্থিতিতে তিনি রাতের বেলা (১৩/১৪ই ডিসেম্বর) জেনারেল হামিদকে ফোন করে বললেন, "স্যার, আমি রাষ্ট্রপতিকে কিছু প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি কি দয়া করে দেখবেন যাতে সেগুলোর ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া যায়।"

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার বহুবিধ কার্যকলাপ থেকে সময় বের করতে পারলেন আর গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজীকে পরের দিন নির্দেশ দিলেন "যেন যুদ্ধ থামিয়ে জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়।" জেনারেল নিয়াজীকে পাঠানো তার এই অগোপনীয় বার্তায় তিনি বলেন:

আমার কাছে পাঠানো গভর্নরের আকস্মিক বার্তা প্রসঙ্গে। আপনারা চরম কঠিন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করেছেন। জাতি আপনাদের নিয়ে গর্বিত ও বিশ্ব প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে আমি মানবিকভাবে সম্ভব সবকিছু করেছি। আপনারা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখান থেকে আরও প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে আর সম্ভব না বা করলেও তাতে কোন লাভ হবে না। তাতে শুধু আরও প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিই হবে। আপনাদের এখন উচিৎ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া আর সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জীবন বাঁচানো, সবাই যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গিয়েছে এবং সকল বিশ্বস্ত সেনা। এদিকে আমি জাতিসংঘকে ভারতের কাছে অনুরোধ রাখতে বলেছি যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ করে এবং সশস্ত্র বাহিনী ও অন্য সবাই যারা দুষ্কৃতিকারীদের সম্ভাব্য লক্ষ্য হতে পারে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।



এই গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি ১৪ই ডিসেম্বর দুপুর ১:৩০-এ লেখা হয় আর ঢাকায় এসে পৌঁছে বেলা ৩:৩০-এ (পূর্ব পাকিস্তানের সময় অনুসারে)।

রাষ্ট্রপতির টেলিগ্রামটি কী বোঝাতে চেয়েছিল? এটি কি জেনারেল নিয়াজীর জন্য 'আত্মসমর্পণের নির্দেশ' বুঝিয়েছিল, না কি তিনি চাইলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন? উপরের এই টেলিগ্রামটি নিজেই ব্যাখ্যা করে নিয়ে নিজস্ব মতামতে আসার ভার আমি পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম।

সেই সন্ধ্যায়ই, জেনারেল নিয়াজী যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, তিনি প্রথমে সোভিয়েত ও চীনা কুটনীতিবিদদের কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঢাকায় মার্কিন কনসাল-জেনারেল জনাব স্পিভ্যাককে বেছে নিলেন। জনাব স্পিভ্যাকের সাথে দেখা করার সময় জেনারেল নিয়াজীর সাথে থাকার জন্য তিনি মেজর জেনারেল ফরমান আলীকে বললেন, কারণ গভর্নরের উপদেষ্টা হিসেবে তিনিই বিদেশী কুটনীতিবিদদের সাথে আলোচনা করতেন। জনাব স্পিভ্যাকের অফিসে পৌঁছে ফরমান বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকলেন আর নিয়াজী ভিতরে গেলেন। স্পিভ্যাকের সহানুভূতি অর্জনের জন্য জেনারেল নিয়াজীর কোন রকম রাখ-ঢাক ছাড়া উচ্চস্বরে বলা প্রস্তাবগুলো ফরমান শুনতে পাচ্ছিলেন। যখন তিনি মনে করলেন যে 'বন্ধুত্ব' অর্জিত হয়েছে, তিনি মার্কিন কনসালকে তার হয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতা করার জন্য বললেন। জনাব স্পিভ্যাক, সব রকম আবেগ ঘৃণাভরে পায়ে ঠেলে, বাস্তব ভঙ্গীতে বললেন, "আপনার পক্ষ থেকে আমি যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করতে পারব না। আপনি চাইলে আমি শুধু একটা বার্তা পাঠাতে পারি।"

ভারতীয় চিফ অব স্টাফ (সেনাবাহিনী) জেনারেল স্যাম মানেকশকে পাঠানোর জন্য বার্তার খসড়া করতে জেনারেল ফরমানকে ডাকা হল। তিনি মুখে মুখে পুরো এক পৃষ্ঠার বার্তা বলে গেলেন যেখানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ডাকা হল, এই শর্তে যে নিচের ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করা হবে: পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা; মুক্তি বাহিনীর প্রতিশোধ থেকে বিশ্বস্ত বেসামরিক জনগণের প্রতিরক্ষা; এবং অসুস্থ ও আহতদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা।

খসড়া চূড়ান্ত হওয়া মাত্র জনাব স্পিভ্যাক বললেন, "বিশ মিনিটের মধ্যে এটি পাঠানো হবে।" জেনারেল নিয়াজী ও ফরমান ইস্টার্ন কমান্ডে ফিরে এলেন, সেনাপতির সহকারী,



ক্যাপ্টেন নিয়াজীকে জবাবের অপেক্ষা করার জন্য রেখে এলেন। তিনি সেখানে রাত ১০টা পর্যন্ত বসে রইলেন, কিন্তু কিছুই হল না। তাকে পরে 'ঘুমাতে যাওয়ার আগে' আবার খোঁজ নিয়ে দেখতে বলা হল। সেই রাতে কোন জবাবই পাওয়া গেল না।

আসলে, জনাব স্পিভ্যাক বার্তাটি জেনারেল (পরবর্তীতে ফিল্ড মার্শাল) মানেকশয়ের কাছে পাঠানইনি। তিনি এটি পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে, যেখানে মার্কিন সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি তার দুঃখভরা মন অন্য কোথাও ডুবিয়ে রাখছিলেন। পরে জেনেছিলাম যে তিনি ৩রা ডিসেম্বর থেকেই যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন আর তার অফিসেই আর আসেননি। তার সামরিক সচিব সাধারণত যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি চিহ্নিত একটি মানচিত্র তার কাছে নিয়ে যেতেন। তিনি একেক সময় এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর একবার মন্তব্য করেছিলেন: "পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমি কীই বা করতে পারি?"

১৫ই ডিসেম্বর মানেকশ এই বার্তার জবাব দিলেন যেখানে তিনি বলেন যে যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়া হবে আর বার্তায় যে ব্যক্তিদের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হবে, এই শর্তে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী "আমার অগ্রসর ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করবে"। তিনি একটি বেতার তরঙ্গও দিলেন যা দিয়ে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের আবাস, কোলকাতার সাথে বিস্তারিত সমন্বয় করার জন্য যোগাযোগ করা যাবে।

মানেকশয়ের বার্তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠানো হল। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এর জবাবে অন্যান্য আরও কথার সাথে বললেন, "পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি এই সকল শর্তে যুদ্ধবিরতি মেনে নিবেন যেহেতু শর্তগুলো আপনার দাবী মেটায়। ..... যা হোক, এটি হবে দুই কমান্ডারের মধ্যে একটি স্থানীয় বন্দোবস্ত। যদি জাতিসংঘের কাছে যে সমাধান খোঁজা হচ্ছে তার সাথে এর বিরোধ ঘটে, তাহলে এটি বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে।"

১৫ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত সাময়িক যুদ্ধবিরতি অনুমোদিত হল। পরে এটি ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ৩টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়, যাতে যুদ্ধবিরতির বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করার জন্য আরো সময় পাওয়া যায়। জেনারেল হামিদ যেখানে নিয়াজীকে 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন যাতে তিনি যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো মেনে নেন, নিয়াজী



একে 'অনুমোদন' হিসেবে ধরে নিয়ে তার চিফ অব স্টাফ, ব্রিগেডিয়ার বকরকে বললেন যেন তিনি সেনাদলগুলোর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রচার করে দেন। পূর্ণ পৃষ্ঠার এই সাংকেতিক বার্তায় ফৌজদের 'বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের' প্রশংসা করে স্থানীয় কমান্ডারদের নির্দেশ দেয়া হল যাতে তারা যুদ্ধবিরতির বন্দোবস্ত করার জন্য তাদের ভারতীয় প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। এখানে 'আত্মসমর্পণের' কথা বলা হয়নি, শুধু নিচের বাক্যটা বলা হয়েছিল, "দুর্ভাগ্যক্রমে, এর সাথে অস্ত্র নামিয়ে রাখাও জড়িত আছে।"

সাংকেতিক বার্তাটি যখন পাঠানো হল ততক্ষণে মধ্যরাত (১৫/১৬ই ডিসেম্বর) হয়ে গিয়েছে। প্রায় একই সময়ে, ৪ এভিয়েশন স্কোয়াড্রনের অফিসার কমান্ডিং, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল লিয়াকত বোখারীকে তার শেষ ব্রিফিং দেয়ার জন্য তলব করা হল। আটজন পশ্চিম পাকিস্তানী সেবিকা ও আটাশটি পরিবারকে ঐ রাতেই আকাশ পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম পার হয়ে আকিয়াবে (বার্মা) পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে বলা হল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল লিয়াকত তার স্বাভাবিক শান্তভাব বজায় রেখে নির্দেশ শুনলেন, যেমনটা যুদ্ধের সময় প্রায়ই দেখা যায়। বারোদিনের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পুরোটা সময়, মানুষ, গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র সবচেয়ে খারাপভাবে আক্রান্ত এলাকায় পরিবহন করার জন্য তার হেলিকপ্টারগুলোই ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের কাছে থাকা একমাত্র বাহন। এগুলোর একের পর এক সাহসিক অভিযান এতই উৎসাহব্যাঞ্জক যে এখানে বলে শেষ করা যাবে না।

১৬ই ডিসেম্বর গভীর রাতে দুটি হেলিকপ্টার রওনা দিল, আর তৃতীয়টি উড়ল প্রকাশ্য দিবালোকে। তারা মেজর-জেনারেল রহিম খান ও আরও অল্প কয়েকজনকে নিয়ে চলল, কিন্তু সেবিকাদের পেছনে ফেলে আসা হল কারণ তাদেরকে তাদের হোস্টেল থেকে 'সময়মত একত্র করা যায়নি'। বার্মায় সবগুলো হেলিকপ্টার নিরাপদে অবতরণ করল আর যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত করাচী পৌঁছালেন।

এদিকে ঢাকায়, চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল। টাঙ্গাইলের দিক থেকে শত্রুরা যখন এগিয়ে টঙ্গীর কাছাকাছি এল, তাদেরকে আমাদের ট্যাংকের গোলাবর্ষণ দিয়ে বরণ করা হল। টঙ্গী-ঢাকা সড়কটি ভালোভাবে সুরক্ষিত করা আছে ধরে নিয়ে, ভারতীয়রা পাশ কাটিয়ে একটি উপেক্ষিত রাস্তা ধরল যেটি মানিকগঞ্জের দিকে যায়, এখান থেকে কর্নেল ফজলে হামিদ তাড়াহুড়া করে পালিয়ে গিয়েছিলেন যেমনটা তিনি পালিয়েছিলেন ৬ই ডিসেম্বর খুলনা



থেকে। ফজলে হামিদের ফৌজের অনুপস্থিতির ফলে শত্রুরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিনা বাধায় ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ল।

ব্রিগেডিয়ার বশির, যিনি প্রাদেশিক রাজধানীর (ক্যান্টনমেন্ট বাদে) প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন, ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জানতে পারলেন যে মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক সম্পূর্ণ অরক্ষিত আছে। তিনি অর্ধেক রাত ব্যয় করলেন ইপিসিএএফ-এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্য একত্র করতে, যাদের শক্তি ছিল প্রায় একটি কোম্পানীর সমান, আর তাদেরকে মেজর সালামতের অধীনে শহরের ঠিক বাইরে মিরপুর সেতুতে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর গভীর রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডো ফৌজ শহরের দিকে চলে এল, যাদেরকে মুক্তি বাহিনী বলে রেখেছিল যে সেতুটি অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ততক্ষণে মেজর সালামতের ছেলেরা পজিশন নিয়ে ফেলেছিল আর তারা প্রবেশ করতে থাকা কলামের উপর অন্ধের মত গুলি করতে থাকল। তারা দাবী করে যে তারা শত্রুর কিছু ফৌজকে হত্যা করেছিল আর দুটি ভারতীয় জিপ আটক করেছিল।

১০১ কমিউনিকেশন জোনের মেজর-জেনারেল নাগরা, যিনি এগিয়ে আসা ফৌজের পিছন পিছন আসছিলেন, সেতুর দূরের অংশে ফিরে গেলেন আর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর উদ্দেশ্যে একটি চিরকুট লিখলেন। এতে বলা হয়: "প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি মিরপুর সেতুতে আছি। আপনার প্রতিনিধিকে পাঠান।"

সকাল ৯টার দিকে যখন জেনারেল নিয়াজীর কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে তখন তার সাথে ছিলেন মেজর-জেনারেল জামশেদ, মেজর-জেনারেল ফরমান এবং রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ। ফরমান, যিনি তখনও 'যুদ্ধবিরতির সমঝোতা' নিয়েই ছিলেন, বললেন, "উনিই (নাগরা) কি সেই সমঝোতার দল?" জেনারেল নিয়াজী কোন মন্তব্য করলেন না। স্পষ্টতই এখন প্রশ্ন ছিল তাকে কি বরণ করা হবে না কি প্রতিহত করা হবে। তিনি এর মধ্যেই ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন।

মেজর-জেনারেল ফরমান জেনারেল নিয়াজীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাছে কি বাড়তি সৈন্য আছে?" নিয়াজী আবারও কিছুই বললেন না। রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ, পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ করে বললেন: "কুচ পাল্লে হ্যায়?" (ঝোলায় কিছু আছে?) নিয়াজী ঢাকার রক্ষক জামশেদের দিকে তাকালেন, যিনি দুই পাশে মাথা নেড়ে বোঝালেন, "কিছুই



নেই।" "তাই যদি হয়, তাহলে যান, উনি (নাগরা) যা বলেছেন তা-ই করুন", ফরমান আর শরীফ প্রায় একই সাথে বলে উঠলেন।

নাগরাকে বরণ করে নিতে জেনারেল নিয়াজী মেজর-জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন। তিনি আমাদের মিরপুর সেতুর ফৌজদের বললেন যেন যুদ্ধবিরতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে নাগরাকে শান্তিপূর্ণভাবে চলাচল করতে দেয়। ভারতীয় জেনারেল হাতে গোণা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত গৌরবের সাথে ঢাকায় প্রবেশ করলেন। এটিই ছিল কার্যত ঢাকার পতন। হৃদরোগীর মতই এটি চুপচাপ পড়ে গেল। এর হাত-পাও কাটা হয়নি বা শরীরও খন্ড-বিখন্ড করা হয়নি। এটি ব্যস একটি স্বাধীন শহর হিসেবে বেঁচে থাকা বন্ধ করে দিল। সিঙ্গাপুর, প্যারিস বা বার্লিন পতনের কাহিনীর এখানে পুনরাবৃত্তি হল না।

এদিকে, ইস্টার্ন কমান্ডের ট্যাকটিকাল হেডকোয়ার্টার গুটিয়ে নেয়া হয়েছিল। সবগুলো অপারেশনাল মানচিত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রধান হেডকোয়ার্টারটি ভারতীয়দের অভ্যর্থনার জন্য ঝাড়পোঁছ করা হয়েছিল কারণ, যেমনটা ব্রিগেডিয়ার বকর বলেছিলেন, "এটি তুলনামূলক ভালো আসবাব দিয়ে সাজানো।" পার্শ্ববর্তী অফিসার্স মেসে আগে ভাগে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যাতে 'অতিথিদের' জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করে রাখে। প্রশাসনিক কাজে বকর বেশ পটুই ছিল।

মধ্যাহ্নের একটু পর, ব্রিগেডিয়ার বকর তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ, মেজর-জেনারেল জেকবকে অভ্যর্থনা দিতে বিমান বন্দরে গেলেন। এদিকে নিয়াজী তার ঠাট্টা-তামাশা দিয়ে নাগরাকে মজিয়ে রাখলেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা না করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, কিন্তু সেগুলোর কোনটিই ছাপার যোগ্য না!

মেজর-জেনারেল জেকব 'আত্মসমর্পণের চুক্তিনামা' নিয়ে এলেন যাকে জেনারেল নিয়াজী আর তার চিফ অব স্টাফ 'যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি' বলতেই বেশি পছন্দ করেন। (এই দলিলের পূর্ণ লিখিত রূপ পরিশিষ্ট ৪-এ দেয়া হয়েছে।) জেকব কাগজপত্র বকরের কাছে হস্তান্তর করলেন, তিনি সেগুলো মেজর-জেনারেল ফরমানের সামনে রাখলেন। জেনারেল ফরমান একটি অংশ নিয়ে আপত্তি তুললেন যেখানে 'ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ নেতৃত্ব' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। জেকব বললেন, কিন্তু এটা তো দিল্লী থেকে এভাবেই এসেছে।" ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি যোগ করলেন, "আরে, সেটা তো ভারত আর বাংলাদেশের নিজেদের মধ্যকার ব্যাপার।



আপনারা শুধুমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করছেন।" দলিলটি নিয়াজীর কাছে দেয়া হল, তিনি এক ঝলক দেখেই কোন মন্তব্য না করে টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে ফরমানের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। ফরমান বললেন, "কমান্ডারকেই এটি মেনে নিতে বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।" নিয়াজী কিছুই বললেন না। তার নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হল।

বিকেলের শুরুতে, জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকা বিমান বন্দরে গেলেন। তিনি সস্ত্রীক হেলিকপ্টারে এলেন। বাঙালীদের বিশাল জনতা তাদের মুক্তিদাতা ও তার স্ত্রীকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতে ছুটে এল। নিয়াজী তাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে হাত মেলালেন। এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ছিল এটি। বিজেতা ও বিজিত উভয়েই বাঙালীদের চোখের সামনে ছিল, তারা অরোরা ও নিয়াজীর প্রতি যথাক্রমে ভালোবাসা আর ঘৃণার চরম আবেগ প্রকাশে কোনরকম রাখ-ঢাক করছিল না।

চিৎকার আর স্লোগানের মধ্য দিয়ে তারা রমনা রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এলেন যেখানে আত্মসমর্পণের ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মঞ্চ সাজানো হয়েছিল। বিশাল সেই উদ্যান আবেগী বাঙালী জনতার কলনাদে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তারা অতি আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলের জনতার সামনে অপমানিত হওয়ার ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য। উপলক্ষ্যটি বাংলাদেশের জন্মের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্যও ছিল।

বিজেতাকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ছোট কন্টিনজেন্ট ঘিরে দাঁড়াল আর ভারতীয় সেনাদলের একটি বিচ্ছিন্ন দল বিজিতদের গার্ড দিল। প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী ও প্রচুরসংখ্যক বিদেশী সাংবাদিকের চোখের সামনে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরা ও লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলেন। তারপর তারা দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। ঢাকার আত্মসমর্পণের নিদর্শন হিসেবে জেনারেল নিয়াজী তার রিভলভার বের করে অরোরার কাছে হস্তান্তর করলেন। এর সাথেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে হস্তান্তর করলেন!

যতক্ষণ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় ভারতীয় ফৌজ উপস্থিত না হয় ততক্ষণ মুক্তি বাহিনীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢাকা গ্যারিসনকে ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখার



অনুমতি দেয়া হল। ১৯শে ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ক্যান্টনমেন্টের গলফ কোর্সে গ্যারিসন আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল। স্থানীয় কমান্ডারদের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সুবিধাজনক তারিখে ১৬ থেকে ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার বাইরের ফৌজরা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

১৪ই ডিসেম্বর থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও আসন্ন আত্মসমর্পণের খবর প্রচার শুরু করে দিয়েছিল। এতে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের অবাঙালী জনতার ভিতর আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের বেশির ভাগই ঘরবাড়ি ছেড়ে পাকিস্তানী সেনাদের পরিণতি ভাগাভাগি করে নিতে ক্যান্টনমেন্টে সরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক মুক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ও প্রাণ হারায়। এই নৃশংসতার রোমহর্ষক কাহিনীগুলো আমি শুনেছি। রক্ত হিম করে দেয়ার জন্য এগুলো যথেষ্ট আর সংখ্যায় এত বেশি যে এখানে তালিকা দেয়া যাবে না।

এই নিরপরাধ জীবনগুলো রক্ষার করার মত সময় ভারতীয়দের ছিল না। তারা তাদের বিজয়ের মালামাল ভারতে লুট করে নিতেই ব্যস্ত ছিল। ট্রেন আর ট্রাকের বিশাল বিশাল বহর সামরিক সরঞ্জাম, খাবার জিনিস, শিল্পপণ্য আর ফ্রিজ, কার্পেট, টেলিভিশনসহ ঘরবাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছিল। বাংলাদেশের রক্ত এমনভাবে সম্পূর্ণ শুষে নেয়া হয়েছিল যে 'স্বাধীনতার' ভোরকে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্য শুধু একটি কংকাল অবশিষ্ট ছিল। এক বছর পর, বাঙালীরাও তা উপলব্ধি করেছিল।

বাংলাদেশের সম্পদ যতটুকু পারে নিজেদের এলাকায় স্থানান্তর করার পর ভারতীয়রা পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবিরে পাঠানো শুরু করল। এই প্রক্রিয়া ১৯৭২-এর জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলল। তবে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াজী, মেজর-জেনারেল ফরমান, রিয়ার-অ্যাডমিরাল শরীফ ও এয়ার কমোডর ইনাম-উল-হকসহ ভিআইপিদেরকে ২০শে ডিসেম্বর বিমানে করে কোলকাতায় নেয়া হয়েছিল। আমি তাদের সাথে ছিলাম।

২০শে ডিসেম্বর বেলা ৩:৩০-এ যখন শেষবারের মত ঢাকা বিমানবন্দর ছেড়ে গেলাম, আর ১৯৭০-এর জানুয়ারীতে যখন প্রথম সেখানে অবতরণ করেছিলাম, কত আলাদা দুটি দৃশ্য! পাকিস্তানী সৈন্যদের খাকীর জায়গায় এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবুজ ইউনিফর্ম। বাঙালীরা তখনও হতবুদ্ধি হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সমস্ত কার্যকলাপ



দেখছে। হয়তো তারা এই পরিবর্তনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যা নতুন ও আরও নিকৃষ্ট শাসনের যুগ সুচনা করতে পারে। তারা কি শুধুমাত্র গোলামীটাই বদলালো?

কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছামাত্র আমি জেনারেল নিয়াজীর সাথে পিছনে তাকিয়ে এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নিলাম, পাকিস্তানের তদন্ত কমিশনের জন্য তার যুদ্ধের বিবরণ পুনরায় প্রস্তুত করার সময় পাওয়ার বা প্রয়োজনবোধের আগেই। তিনি খোলাখুলিভাবে তিক্ততার সাথে কথা বলছিলেন। কোনরকম বিবেকের দংশন বা অনুশোচনা প্রকাশ করলেন না তিনি। পাকিস্তান বিভাজনের দায়ভার তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে এজন্য দোষারোপ করলেন। আমাদের কথোপকথনের কিছু টুকরো অংশ এখানে দিলাম:

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি কখনও ইয়াহিয়া খান কিংবা হামিদকে বলেছিলেন যে আপনাকে যে বাহিনী দেয়া হয়েছে তা আপনার উপর অর্পিত মিশন সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত না?" "তারা কি বেসামরিক? তারা কি জানে না অভ্যন্তরীণ আর বাইরের বিপদ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য তিনটি পদাতিক ডিভিশন যথেষ্ট কি না?" "সে যাই হোক, ঢাকা রক্ষার এই ব্যর্থতা আপনাকে একজন থিয়েটার কমান্ডার হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে লাল কালির দাগ হয়ে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে যদি নগরদুর্গ প্রতিরক্ষার ধারণাই একমাত্র উপায় হবে, তাহলেও তো আপনি ঢাকাকে নগরদুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেননি। এর কোন ফৌজই ছিল না।" "সব দোষ রাওয়ালপিন্ডির। তারা নভেম্বরের মাঝামাঝিতে আমাকে আটটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন পাঠাবে বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু পাঠিয়েছে মাত্র পাঁচটি। বাকী তিনটি পৌঁছানোর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্ট খুলে দেয়া হয়েছিল - আমাকে আগে থেকে না জানিয়েই। আমি বাকী তিনটি ব্যাটেলিয়ন ঢাকায় রাখতে চেয়েছিলাম।" "কিন্তু আপনি যখন ৩রা ডিসেম্বর জানতে পারলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কিছুই আসতে পারবে না, আপনি নিজের বাহিনী থেকে বাড়তি সৈন্য মজুদ করলেন না কেন?" "কারণ একসাথে সবগুলো সেক্টর চাপের মুখে পড়ে গিয়েছিল। ফৌজরা সব জায়গায় নিয়োজিত ছিল। বাড়তি কিছুই বের করা যায়নি।" আমি পরামর্শ দিলাম, "ঢাকায় আপনার কাছে সামান্য যা ছিল তা দিয়েই তো আপনি যুদ্ধ আরও কিছু দিন দীর্ঘায়িত করতে পারতেন।" তিনি জবাব দিলেন, "কী জন্য করব? ওতে শুধু আরও প্রাণহানি আর ক্ষয়ক্ষতিই হত। ঢাকার নালাগুলো আটকে বন্ধ হয়ে যেত। রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তুপ হয়ে যেত। নগরজীবনের সুবিধাদি পর্যুদস্ত হত। প্লেগ আর অন্য সব



রোগ ছড়িয়ে পড়ত। তারপরও পরিণতিটা সেই একই হত। ৯০,০০০ বিধবা আর ৫ লাখ অনাথের মুখোমুখি হবার চেয়ে আমি বরং পশ্চিম পাকিস্তানে ৯০,০০০ যুদ্ধবন্দী নিয়ে যাব। এই প্রাণ উৎসর্গের কোন মূল্যই থাকত না।" "পরিণতিটা সেই একই হত। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাসটা অন্যরকম হত। সামরিক অভিযানের ঐতিহাসিক আখ্যানে এটি একটি উৎসাহব্যঞ্জক অধ্যায় লিখে রাখত।" জেনারেল নিয়াজী কোন জবাব দিলেন না।



পরিশিষ্ট - ১

ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭

ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সার্বভৌম (মুসলিম) ভারত ও (হিন্দু) শাসনের রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়। ভারতের উত্তরপূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর- দিকের দুটি মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। উত্তরপূর্বাঞ্চলের এলাকা ছিল পূর্ব - অংশ গঠিত পশ্চিম-বাংলা নিয়ে আর উত্তর হয় সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তরপশ্চিম - ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ নিয়ে। হিন্দুরা যারা, অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা হিসেবে, বৃটিশদের চলে যাওয়ার পর ক্ষমতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা করেছিল, তারা পাকিস্তানের সৃষ্টি পছন্দ করেনি। বিখ্যাত হিন্দু নেতা, গান্ধী, এই বিভাজনের নাম দেন, "পবিত্র গরুর দেহ ব্যবচ্ছেদ"; আর হিন্দু মহাসভা বলেছিল, "ভারত এক ও অবিভাজ্য, এবং যতদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলো ফিরিয়ে এনে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জোড়া না লাগানো হয় ততদিন শান্তি আসবে না।"

২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৭

ভারত মুসলিম প্রধান প্রদেশ জম্মু ও কাশ্মির জবরদখলের জন্য ফৌজ পাঠায়। কাশ্মিরীরা পাকিস্তানী উপজাতিদের সহায়তায় তাদের বাধা দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, যারা তখনও ভ্রূণাবস্থায় ছিল, ১৯৪৮এর মে মাসে যুদ্ধে যোগ- দেয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৪৯লা জানুয়ারী যুদ্ধবিরতি ধার্য১এর - করে, এই প্রতিজ্ঞা দিয়ে যে কাশ্মিরীদের ইচ্ছা নির্ধারণ করতে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই গণভোট আর কখনই অনুষ্ঠিত হয়নি আর কাশ্মির সমস্যা সেই থেকেই ভারত-১ পাকিস্তান সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। কাশ্মির থেকে,৬০০ কিলোমিটার দূরের



পূর্ব বাংলা, এই সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের মত এতটা আবেগ নিয়ে কখনই জড়িত ছিল না।

২১শে মার্চ, ১৯৪৮

পাকিস্তানের জনক ও এর প্রথম গভর্নরজেনারেল-, কায়েদআজম মোহাম্ম-এ-দ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় এক সফরে এসে ঢাকায় ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই মন্তব্যের ফলে বাঙালী যুবসমাজের মধ্য থেকে তীব্র বিরোধিতা আসে যারা একে অপমান হিসেবে নেয়যেহেতু :, পাকিস্তানের চুয়ান্ন শতাংশ জনগণ তাদের ভাষা বাংলায় কথা বলে। শেখ মুজিবর রহমান, যিনি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এই আন্দোলনের স্লোগান তোলায় অন্যতম একজন ছিলেন এবং তাকে আটক করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে বাংলা ভাষার সমর্থনে ছাত্রসভাগুলোর মূল কেন্দ্রবিন্দু।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

কায়েদবাংলার জেনারেল হন পূর্ব-আজম মারা যান। তার উত্তরসুরী গভর্নর -এ- বাঙালী মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন। শোকসন্তপ্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রীর- দায়িত্ব চালিয়ে যান কায়েদআজমের একজন কাছের বিশ্বস্ত লোক-এ-, জনাব লিয়াকত আলী খান।

মার্চএপ্রিল-, ১৯৪৯

এক বিখ্যাত বাঙালী নেতা, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা (আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর তিনজন সহকারী সাধারণ সচিবের একজন হন শেখ মুজিবর রহমান। দলটি শক্তি অর্জন করে উ ৎসাহী বাঙালীদের নিয়ে আর অসন্তুষ্ট প্রবীণ রাজনীতিবিদদের নিয়ে যারা স্বাধীন দেশে ক্ষমতার কোন ভাগ পাননি। সেপ্টেম্বরে, উত্তরর প্রদেশে পীর মানকি শরীফপশ্চিম ফ্রন্টিয়া- একই নামে আরেকটি দল গঠন করেন। ১৯৫০এর ফেব্রুয়ারীতে-, দুটি দল একজোট হয়। জনপ্রিয়



বাঙালী নেতা এইচ এস সোহরাওয়ার্দী নতুন এই দলের সভাপতি হন , যার নাম হয় পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১

রাওয়ালপিন্ডিতে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় জনাব লিয়াকত আলী খান নিহত হন। খাজা নাজিমউদ্দিন এক ধাপ নিচে নেমে রাষ্ট্রপতি পদে তার স্থলাভিষিক্ত হন। এক উচ্চাভিলাষী সরকারী চাকুরে, জনাব গোলাম মোহাম্মদ সফলভাবে ষড়যন্ত্র করে সর্বোচ্চ পদের খালি আসনটি দখল করে নেন।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫২

পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদের মূলনীতির নির্বাহী সভা তাদের প্রস্তাবগুলো ঘোষণা করে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে এটাও বলা হয় যে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে হবে উর্দু। এর ফলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে।

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫২

বাঙালীরা ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করতে থাকে, সর্বশেষ যে পদক্ষেপটির বিরুদ্ধে তা হল, "ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারআওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রধান ।" মাওলানা ভাসানীও এসব সমাবেশে বক্তৃতা দেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে একটি সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়, যেদিন বাজেট অধিবেশনের জন্য পূর্ব বাংলা সংসদের বসার কথা।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

জনাব নুরুল আমিনের আইন প্রয়োগে সরকারী নিষেধ সত্ত্বেও , সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় ও মিছিল বের করা হয়। পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয় এবং তিনজন ছাত্র ও



আরও অনেক লোক নিহত হয়। তাদের এই জীবন বলিদানের স্মৃতি ধরে রাখতে শহীদ মিনার (স্মৃতিস্তম্ভগড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে এই (স্মৃতিস্তম্ভগুলো বাঙালীদের একাত্মতার প্রতীক ও প্রাদেশিক গভর্নর ও রাজনীতিবিদদের জন্য তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়ায়।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৩

জাতীয় সংসদের মুখোমুখি হবার সুযোগ না দিয়েই, গভর্নরজেনারেল গোলাম-মোহাম্মদ, খাজা নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রী পরিষদকে বাতিল করে দেন। এটি বাঙালীদের আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে, তারা একে 'বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' বলে ধরে নেয়। গোলাম মোহাম্মদ তড়িঘড়ি করে আরেক বাঙালী, জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব থেকে ডেকে এনে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দেন। জনাব বগুড়ার পূর্ব বাংলায় কোন ক্ষমতার জোর ছিল না, এজন্য তিনি তার পাঞ্জাবী পৃষ্ঠপোষক, গোলাম মোহাম্মদের হাতের পুতুল হয়ে বসে থাকেন।

এপ্রিল, ১৯৫৩

আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দেখাতে তাদের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়। প্রবীণ মুসলিম লীগের নেতারা দল থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাদের আসনগুলো পূরণ করা হয় বিত্তশালী হিন্দু নেতাদের দিয়ে যারা পরবর্তীতে দলের নীতিনির্ধারণে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

শেরবাংলা মোলভী ফজলুল হক-এ-, যিনি ১৯৪০শে মার্চ পাকিস্তান২৩এর - প্রস্তাব উথাপন করেছিলেন, ঢাকায় তার নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর নাম ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও কেএসপি র- প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ,



একদিকে যেমন মুসলিম লীগের আধিপত্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তেমন অন্যদিকে প্রদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরও প্রতিফলন ঘটায়।

৮ই মার্চ১১-, ১৯৫৪

স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত পূর্ব বাংলার আইন প্রণয়নকারী সংসদের - জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আধিপত্যকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ, কেএসপি ও অন্যান্য দলগুলো মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের প্রথম দফাই ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী। মুসলিম লীগ ৩১০ আসনের সভার মাত্র ৯টি আসন জেতে আর মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন যুক্তফ্রন্টের নবিশ মনোনীত প্রার্থীর কাছে হেরে যান।

৩০শে মার্চ, ১৯৫৪

যুক্তফ্রন্টকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করা হয়। তিন দিন পর , নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে, যেখানে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের একজন ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান।

৩০শে মে, ১৯৫৪

কয়েকদিন আগে কলকাতা বিমান বন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কথিত রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্যের কারণে গভর্নরজেনারেল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল- করে দেন। শেখ মুজিবর রহমানকেও কারারুদ্ধ করা হয়। প্রদেশে গভর্নরের শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। মধ্যপন্থীরা নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে পৃথকভাবে আওয়ামী লীগ ও কেএসপির করুণা লাভের চেষ্টা করতে থাকে।-



২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৪

গভর্নরজেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সাংবিধানিক সংসদ ভেঙে দেন। সংসদ ছাড়াই-মোহাম্মদ আলী বগুড়ার নতুন সরকার গঠিত হয়, তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন সেনাবাহিনীর কমান্ডারচিফ জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান।-ইন-

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৫

প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে নতুন আশি সদস্যের সাংবিধানিক সংসদ-গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ ও কেএসপি তাদের মনোনীত প্রার্থীদের পাঠায় -জাতীয় রাজনীতিতে এ ছিল এক নতুন অধ্যায়।

জুন, ১৯৫৫

পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন তুলে দেয়া হয়। কেএসপি , যারা রাজধানীতে মুসলিম লীগের সহযোগিতা করছিল, ঢাকায় সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়।

৬ই আগস্ট, ১৯৫৫

দুর্বল চক্রান্তকারী জনাব গোলাম মোহাম্মদ অবশেষে পদত্যাগ করেন। রাজনীতির বাইরের একজন ধূর্ত ব্যক্তি জনাব ইস্কান্দর মির্জা , ৭ই সেপ্টেম্বর গভর্নরজেনারেল -হিসেবে শপথ নেন। তিনি মুসলিম লীগের একজন মনোনীত প্রার্থী , চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেন, যদিও আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে এইচ এস সোহরাওয়ার্দী সরকার গঠনের অধিকার দাবী করেছিলেন। বাঙালীরা একে বাঙালীদেরকে ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার আরেকটি ষড়যন্ত্র হিসেবে নেয়।



৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বলেনল পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি এখানে মুসলিম লীগ গোষ্ঠীর মনোভাব হ " :, ভাষা, সাহিত্য আর সবকিছুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন। প্রকৃতপক্ষে , স্যার আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের সমান অংশীদার ভাবা তো দূরের কথা , মুসলিম লীগের নেতারা মনে করে যে আমরা তাদের প্রজা গোষ্ঠী আর তারা আমাদের শাসক গোষ্ঠীর লোক।"

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৫

পশ্চিমাংশের প্রদেশগুলো, পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ-, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু একজোট হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি ইউনিট হয়। সপ্তাহ দু'য়েক আগে, দুই অংশের মধ্যে সমতার যুক্তিসম্পন্ন ভিত্তি দিতে পশ্চিম পাকিস্তান বিল পাশ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পূর্ব বাংলা, একে বাঙালীদেরকে আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নতুন কার্যক্রম বলে ধরে নেয়।

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সংসদ দেশের প্রথম সংবিধান পাশ করে। তিন সপ্তাহ পর শে২৩)মার্চএটি কার্যকর করা (হয়। সংবিধানে 'সমতার নীতি' অনুযায়ী আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়, অর্থাৎ সংসদে সমান সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পাকিস্তান একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হয় এবং গভর্নরজেনারেল হন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি।- রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়।

২০শে আগস্ট, ১৯৫৬

বিগত চৌদ্দ মাস যাবৎ কোনরকম প্রাদেশিক আইনের সম্মুখীন না হয়েই কেএসপি সরকার পূর্ব পাকিস্তানে টিকে ছিল, তাদেরকে এবার জোর করে পদত্যাগ করানো হয়।



এক হিন্দু নেতা বি কে দাস ও তার কংগ্রেস দলের সমর্থনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। জনাব আতাউর রহমান মুখ্যমন্ত্রী হন।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করেন (ই সেপ্টেম্বর৮), তার জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী। তাকে সমর্থন দেন রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জার নতুন রাজনৈতিক শক্তি, রিপাবলিকান পার্টি।

৩০শে জুন, ১৯৫৭

আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক প্রধান, মাওলানা ভাসানী দলের সভাপতি হিসেবে পদত্যাগ করেন, কারণ ছিল এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর পশ্চিমপন্থী নীতি, এর মধ্যে ছিল সুয়েজ সমস্যার ব্যাপারে 'সাম্রাজ্যবাদীদের' প্রতি তার সমর্থন, যা দলের নির্বাচনী ইশতেহারের পরিপন্থী।

২৬শে জুলাই, ১৯৫৭

মাওলানা ভাসানী, যিনি তার পিকিংপন্থী মনোভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। এরাও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে পার্থক্য ছিল যে এদেরকে সমর্থন দিয়েছিল বামপন্থীরা।

১২ই অক্টোবর, ১৯৫৭

রিপাবলিকান সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন জনাব আই আই চুন্দ্রীগড় কিন্তু তাকেও দুই



মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে হয়। ডিসেম্বরে তার উত্তরসুরী হন জনাব ফিরোজ খান নুন।

১৮ই জুন, ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের জোট সরকার পূর্ব পাকিস্তান সংসদে হেরে যায়। জনাব আতাউর রহমান পদত্যাগ করেন। দুই দিন পর, কেএসপি তার সরকার গঠন করে, কিন্তু কোনমতে তিন দিন চালাতে পারে। আবারও সেই, গভর্নরের শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়।

২৬শে আগস্ট, ১৯৫৮

গভর্নরের শাসন তুলে দেয়া হয় এবং আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

পূর্ব পাকিস্তান সংসদের সদস্যরা এক অধিবেশনে স্পিকারের 'পক্ষপাতিত্ব' নিয়ে একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বহু সদস্য গুরুতর আহত হন। ডেপুটি স্পিকার, জনাব শহীদ আলী, নিহত হন।

৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮

জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সমর্থনে, রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জা সংবিধান রদ করেন, সংসদ ভেঙে দেন এবং দেশে মার্শাল ল জারি করেন। চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন জেনারেল আইয়ুব খান। এই 'বিপ্লব' বাঙালীদের সকল আশার পথ রুদ্ধ করে দেয় যারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার দাবী করতে চেয়েছিল।



২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৮

জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জাকে সরিয়ে দেন, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ফিল্ড মার্শালের র‍্যাংকে অধিষ্ঠ হন। তিনি সযত্নে বাছাই করা গভর্নরদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করা শুরু করেন। যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালীদের প্রতিনিধিত্ব খুবই সামান্য ছিল, তারা অনুভব করে যে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য করা হয়। মার্শাল লএর দমনন-ীতির মধ্যে প্রাদেশিকতার অনুভূতি লালিত হয়।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৯

আইয়ুব খান 'প্রাথমিক গণতন্ত্র' প্রণয়ন করেন, এটি ছিল স্থানীয় সরকারের একটি নতুন পদ্ধতি যা দ্রুতই ইলেক্টোরাল কলেজে রূপান্তর করা হয়। আশি হাজার মৌল গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত করবে। বাঙালীরা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের বেশির ভাগই ধরে নেয় এটি হল একনায়কতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ছদ্মবেশ।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

আইয়ুব খান আশি হাজার মৌল গণতন্ত্রবাদীদের কাছ থেকে আস্থা ভোট আহ্বান করেন, তাদের মধ্যে ৭২,২৮৩ জন তাকে তার রাষ্ট্রপতির অফিসে থাকা নিশ্চিত করে। দুই দিন পর, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম 'নির্বাচিত' রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।



এপ্রিল, ১৯৬০

লেফটেন্যান্টজেনারেল আজম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা - হয়। তিনি বাঙালীদের সমর্থন জয় করতে কঠোর পরিশ্রম করেন। এই করতে গিয়ে তিনি আইয়ুব খানের সমর্থন হারান এবং পদত্যাগে বাধ্য হন।

৮ই জুন, ১৯৬২

আইয়ুব খান দেশের উপর তার নিজের সংবিধান চাপিয়ে দেন। এর মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার, যার ভিত্তি হল মৌল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এতে সমতার নীতি বহাল থাকে, জাতীয় সংসদে প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিদের ব্যাপারে। এই দলিল জনপ্রিয়তা ও সমর্থন পায়নি।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৬২

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন এক বাঙালী, মোনেম খান। তিনি ১৯৬৯এর - আইয়ুব শুরুতে আইয়ুব খানের পতনের সময় পর্যন্ত এই অফিস ধরে রাখেন। খানের প্রতি তার চরম বিশ্বস্ততা, বাঙালীদের কাছে তার সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায়, যারা তাকে 'পাঞ্জাবীদের দালাল' হিসেবে ঘৃণা করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা তার হাত থেকে ডিগ্রি নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

২৯শে মে, ১৯৬৩

জাতীয় সংসদের একজন বাঙালী সদস্য, জনাব মাহবুবুল হক, এক অধিবেশনে ফ্লোর পেয়ে বলেনপশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তান এত বেশি " : সাহায্য দিয়েছে যে, গত পনের বছরে কম আমদানী আর বেশি বেশি রপ্তানী করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের এক হাজার কোটি রুপী ভেসে গিয়েছে। এই দিয়ে, স্যার, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন হয়েছে আর এই লাখ লাখ একর জমির সৃষ্টি হয়েছে। এই যে বড় বড় মানুষেররা এত বড় গলায় বলে পূর্ব পাকিস্তানকে বের" : করে দাও, আমরা



নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারব আজ এই ষোলতম বছরে পশ্চিম "।..... পাকিস্তানকে গড়তে গড়তে আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছি; আর কি না আমাদেরকে বলা হয়, "বাছারা তোমরা বেরিয়ে যাও, তোমাদের জন্য আমাদের কাছে কিছুই নেই , তোমাদেরকে আমাদের আর দরকারও নেই।"

২রা জানুয়ারী, ১৯৬৪

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কায়েদআজমের -এ- বোন, মিস ফাতেমা জিন্নাহ। সকল বিরোধী দল তাকে সমর্থন দেয়। বাঙালীরা সর্বাত্মকরণে তাকে সমর্থন জানায় যেহেতু তারা ধরে নিয়েছিল যে একজন একনায়ককে ক্ষমতাচ্যুত করার এই সুযোগ , আর এতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করার রাস্তা খুলে যাবে। যদিও আইয়ুব খান আশি হাজার মৌল গণতন্ত্রবাদীদের বেশির ভাগের সমর্থন জিতেছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্নায়ুকেন্দ্র, ঢাকায় ৯র-শতাংশ ভোটে মিস জিন্নাহ ৮. কাছে হেরে যান।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

কাশ্মির সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান আবারও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যেখানে এটি ছিল জীবন মরণ-ব্যাপার, পূর্ব পাকিস্তান সাধারণত একে এমন এক সংঘাত হিসেবে দেখত যা তাদের দোরগোড়া থেকে অনেক দূরে। মাঝে মাঝে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জেটের ঢাকায় আগমন শুধুমাত্র তাদের বিচ্ছিন্নতা আর অসহায়ত্বের অনুভূতিই বাড়িয়ে দিত।

১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬

আইয়ুব খান তাশখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানকে সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ, যারা এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে



বলে বিশ্বাস করত, এই ঘোষণার ফলে তাদেরকে ঠকানো হয়েছে বলে ধরে নেয়। এটি আইয়ুব খানের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দেয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

শেখ মুজিবর রহমান লাহোরে তার বিখ্যাত ছয় দফা ঘোষণা করেন। সারকথায় বলতে, ছয় দফা এমন এক রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পরামর্শ দেয় যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নিয়ে কাজ করবে, কর স্থাপনের কোন অধিকার তার থাকবে না। মুজিব এই কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী হিসেবে, ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ একে ধরে নেয় বিভক্ত হবার কার্যক্রম হিসেবে।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৬৭

আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভা থেকে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বরে তিনি তার নিজের দল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি গঠন করেন।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৮

'আগরতলা ষড়যন্ত্র' জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। এতে শেখ মুজিবর রহমান ও আরও বাইশজন বাঙালী জড়িত ছিলেন যারা ভারতীয় সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলে অভিযুক্ত হন। ১৯৬৮-এর-জুলাইয়ে ঢাকায় যখন এর শুনানি শুরু হয়, এর ফলে বাঙালীদের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মামলার বাদী যেখানে মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে, বাঙালীরা তাকে বীর বানিয়ে দেয়। এই মামলা মুজিবকে এত জনপ্রিয়তা এনে দেয়, যা হয়তো এমনিতে অর্জন করতে তার সারা জীবন লেগে যেত।



১০ইশে অক্টোবর২৪-, ১৯৬৮

আইয়ুব খান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনিতেই তাশখন্দ ঘোষণার ফলে তিনি রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তার এই অসুস্থতা তাকে শারীরিকভাবেও রোগা করে দেয়। তার উত্তরসুরী নতুন শক্তিগুলো, রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়ই, সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৮

১৯৫৮-এর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছর জুড়ে চলা উ -ৎসব তুঙ্গে ওঠে। এই শাসনামলের অর্জনগুলোর, মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের, যে স্থূল প্রচারণা করা হয়, তা জনগণকে শুধু তাদের অর্থনৈতিক ক্লেশের ব্যাপারেই সচেতন করে তোলে। এটি আইয়ুবের বিরুদ্ধে জনগণের সুপ্ত আক্রোশকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে, যিনি অসদুপায়ে নিজের পরিবারের ভাগ্য গড়ে তুলেছেন বলে প্রতিবেদন করা হয়।

৭ই নভেম্বর, ১৯৬৮

রাওয়ালপিন্ডিতে পুলিশের গুলিতে এক ছাত্র নিহত হয়। এর ফলে আইয়ুববিরোধী -বিক্ষোভের আগুনে নতুন করে ঘি ঢালা হয়। ছাত্ররা জনাব জেড এ ভুট্টোর মাঝে তাদের আন্দোলনের নেতাকে খুঁজে পায়, তিনি এই আন্দোলনকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যান যেখানে আইয়ুব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পূর্ব পাকিস্তানীরাও আইয়ুব-শ নেয়বিরোধী দাঙ্গায় অং, এই আশায় যে একনায়কের পতন হলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে থাকাকালীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের একজন, সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাঙালীরা



এই ঘটনাকে তাদের 'বীরকে' ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধরে নেয়। আইয়ুববিরোধী অনুভূতি তুঙ্গে ওঠে। -বিরোধী ও পশ্চিম পাকিস্তান-

১০ই মার্চ১৫-, ১৯৬৯

বিরোধী দলগুলোর প্রধান দাবীগুলো মেনে নিয়ে রাস্তার জনগণের শান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় আইয়ুব রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোল টেবিল বৈঠক বসান। কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা জোর দেন যে মুজিব যাতে এই বৈঠকে অংশ নিতে পারেন সেজন্য তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া উচি ৎ। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়া হয়। ১০ই মার্চ ঢাকায় জনতার সামনে মুজিব ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের কাছে এই সমতা আর গ্রহণযোগ্য না। এখন তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে (শতাংশ ৫৬) প্রতিনিধিত্ব চান। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

২৫শে মার্চ, ১৯৬৯

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, যিনি দেশে মার্শাল ল জারি করেন। চব্বিশ ঘন্টার ভিতর রাস্তার আন্দোলন থামিয়ে দেয়া হয়।

২৬শে মার্চ, ১৯৬৯

চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্য প্রচারিত তার প্রথম ভাষণে, কথা দেন যে গণতন্ত্র শীঘ্রই ফিরিয়ে আনা হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।



২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯

জেনারেল ইয়াহিয়া খান একব্যক্তি-, একভোট নীতির প্রতি তার অনুমোদন- ঘোষণা করেন। স্পষ্টতই এটি ছিল মুজিবকে তোষামোদ করে তার কাছে থেকে সুবিধা আদায়ের পন্থা, কিন্তু এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ক্ষুব্ধ হয় যারা আশংকা করছিল যে এর ফলে বাঙালীরা আধিপত্য বিস্তার করবে। তিনি 'এক ইউনিট'ও ভেঙে দেন ও পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ পুনঃবহাল করেন।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭০

বছরের শেষে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে রাজনৈতিক কার্যক্রমের অনুমতি দেয়া হয়।



পরিশিষ্ট-২

ছয় দফা

ছয় দফা দলিলের মূল লিখিতরূপ যা শুরুতে প্রকাশিত হয় ও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সংশোধন করা হয়।

দফা ১

মূল: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান অনুযায়ী সত্যিকার অর্থে ফেডারেশন অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত হবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যেখানে আইনসভার প্রাধান্য - থাকবে।

সংশোধিত: সরকারের প্রকৃতি হবে ফেডারেল ও সংসদীয় , যেখানে ফেডারেল আইন-সভার নির্বাচন হবে সরাসরি এবং-সভা ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর আইন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইনসভার- প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

দফা ২

মূল: ফেডারেল সরকার শুধুমাত্র দুটি বিষয় নিয়ে কাজ করবে , এগুলো হল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়, এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয় ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোর উপর ন্যস্ত থাকবে।

সংশোধিত: ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব থাকবে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় এবং নিম্নোল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী (৩), মুদ্রার ব্যাপারে।



দফা ৩

মূল: ১। দুই অংশের জন্য দুটি ভিন্ন কিন্তু অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করা যেতে পারে,

অথবা ২। পুরো দেশের জন্য একটি মুদ্রা রাখা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার রোধে সাংবিধানিক শর্ত আরোপ করতে হবে। পৃথক ব্যাংক রিজার্ভ তৈরি করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রয়োগ করতে হবে।

সংশোধিত: প্রতিটি অংশের প্রতিটি এলাকার জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা থাকবে যা হবে পরস্পর অবাধে বিনিময়যোগ্য, অথবা বিকল্প হিসেবে একই মুদ্রা ফেডারেল রিজার্ভ প্রক্রিয়া গড়ার জন্য থাকবে, এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে যেগুলো এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে সম্পদ স্থানান্তর ও মূলধন পাচার রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দফা ৪

মূল: করারোপ ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেলের এমন কোন ক্ষমতা থাকবে না। খরচের প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্রীয় করের একটি ভাগ ফেডারেশন পাবে। এই নির্দিষ্ট ফেডারেশন তহবিল আসবে সকল রাষ্ট্রীয় করের নির্দিষ্ট অংশের খাজনা থেকে।

সংশোধিত: রাজস্ব নীতির দায়িত্বে থাকবে ফেডারেটিং ইউনিটগুলো। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের জন্য প্রয়োজন মেটাতে ফেডারেশন সরকারকে আবশ্যকীয় রাজস্ব সম্পদ দেয়া হবে, যে রাজস্ব সম্পদ সংবিধানে প্রণীত প্রক্রিয়া অনুযায়ী নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেডারেল সরকার দ্বারা অনুমোদিত হবে। এই সাংবিধানিক প্রণয়ন এটি নিশ্চিত করবে যে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের চাহিদা সবসময় পূরণ হচ্ছে, এই উদ্দেশ্যে যে সরকার ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর রাজস্ব নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়েছে।



দফা ৫

মূল: ১। দুই অংশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য দুটি পৃথক হিসাব থাকতে হবে। ২। পূর্ব পাকিস্তানের আয় থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেরটা থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ৩। ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা, হয় দুই অংশ সমানভাবে অথবা নির্দিষ্ট কোন হারে মেটাবে। ৪। অভ্যন্তরীণ পণ্যের দুই অংশের মধ্যে শুল্কবিহীন বিনিময় হবে। ৫। সংবিধান ইউনিট সরকারগুলোকে বহিঃদেশের সাথে বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে এবং বাণিজ্যচুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে বাণিজ্য মিশন স্থাপন করার ক্ষমতা দিবে।

সংশোধিত: সংবিধান প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খোলার ক্ষমতা দিবে, যেগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে যার যার ফেডারেটিং ইউনিটের সরকার। সংবিধান প্রণীত প্রক্রিয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারের ভিত্তিতে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সরকার ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাবে। সংবিধান অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের সম্পর্ক করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের, যা হবে দেশের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো অনুযায়ী, এর দায়িত্ব থাকবে ফেডারেশন সরকারের উপর।

দফা ৬

মূল: পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

সংশোধিত: জাতীয় প্রতিরক্ষায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সরকারকে মিলিশিয়া বা আধাসামরিক বাহিনী রাখার ক্ষমতা দেয়া হবে।



পরিশিষ্ট - ৩

অপারেশন সার্চলাইট

পরিকল্পনার বুনিয়াদ

১। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও প্রতিক্রিয়াকে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং যারা তাদের সমর্থন করে বা মার্শাল লএর কার্যক্রম অমান্য করে তাদের- সাথে শত্রুপক্ষ হিসেবে আচরণ করতে হবে।

২। যেহেতু আওয়ামী লীগের সমর্থন বহুবিস্তৃত , এমন কি সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের মধ্যেও ব্যাপক, তাই এই অপারেশন চালাতে হবে খুবই ধূর্ততা, আকস্মিকতা, প্রতারণা আর গতির মাধ্যমে যার সাথে থাকবে প্রচন্ড সংঘর্ষের অভিযান।

সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয়াদি

৩। পুরো প্রদেশ জুড়ে একসাথে এই অপারেশন চালাতে হবে।

৪। বেশির ভাগ রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতা এবং শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে চরমপন্থীদের গ্রেফতার করতে হবে। শুরুর ধাপে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও শীর্ষ ছাত্রনেতাদের অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে।

৫। ঢাকায় অবশ্যই এই অপারেশনের শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে তল্লাশী চালাতে হবে।

৬। ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যারা ক্যান্টনমেন্টে হামলা করার দুঃসাহস করবে তাদের উপর আরও বেশি করে অবাধে গুলি চালাতে হবে।

৭। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল যোগাযোগের মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বেতার, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাথে ট্রান্সমিটারগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।



৮। পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজদের দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ন্ত্রণ ও প্রহরার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানী ফৌজদের নিষ্ক্রিয় করতে হবে। পিএএফ ও ইপিআরএর - জন্যও একই ব্যবস্থা নিতে হবে।

আকস্মিক আক্রমণ ও প্রতারণা

৯। উচ্চ পর্যায়ে, রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করা হবে যে তিনি মুজিবকে ঠকিয়ে হলেও তার বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ভেবে দেখতে পারেন, যে জনাব ভুট্টো রাজী নাও হতে পারেন জেনেও তিনি ২৫শে মার্চ আওয়ামী লীগের দাবী মেনে নেয়ার ঘোষণা দিবেন, ইত্যাদি।

১০। কৌশলগত পর্যায়ে

ক) যেহেতু এখানে গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ , এজন্য ইতোমধ্যেই যে সকল ফৌজ শহরে অবস্থান করছে তারা নিম্নলিখিত প্রাথমিক অপারেশনগুলো চালাবে:

* মুজিবের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করা। বাড়িটি ভালোমত প্রহরা দেয়া হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

* বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ হলগুলো ঘেরাও করা - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল।

* টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেয়া।

* যেসব বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা আছে সেগুলো আলাদা করা।

খ) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ না করা পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ফৌজরা কোন কিছু করবে না।

গ) অপারেশনের রাতে ১০টার পর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কাউকে বাইরে যেতে দেয়া হবে না।



ঘ)কোন না কোন অজুহাতে রাষ্ট্রপতি ভবন, গভর্নরস হাউজ, এমএনএ হোস্টেল, বেতার, টেলিভিশন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এলাকাগুলোতে শহরের ফৌজদের মোতায়েন করা হবে।

ঙ)মুজিবের বাড়িতে অপারেশনের জন্য বেসামরিক গাড়ি ব্যবহৃত হতে পারে।

কার্যক্রমের পরম্পরা

১১। ক) এইচ আওয়ার - রাত ১:০০।

খ) কাজে নামার সময়সুচী

* কমান্ডো (একটি প্লাটুন) - মুজিবের বাড়ি - রাত ১:০০।

* টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ - রাত ১২:৫৫।

* বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাওয়ের জন্য ফৌজ চিহ্নিত করা - রাত ১:০৫।

* শহর থেকে ফৌজদের রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য থানায় গমন - রাত ১:০৫।

* নিম্নলিখিত স্থানগুলো ঘেরাও - রাত ১:০৫।

মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি, রোড-২৯ এবং

বাড়ি-১৪৮, রোড-২৯।

* কার্ফ্যু জারি - রাত ১:১০-এ সাইরেন (বন্দোবস্ত করা) এবং লাউডস্পিকারের মাধ্যমে। ব্যাপ্তিকাল - শুরুতে ৩০ ঘন্টা। শুরুর ধাপে কোন পাশ দেয়া হবে না। শুধুমাত্র প্রসব ও গুরুতর হৃদরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। অনুরোধে সেনাবাহিনী দিয়ে এদেরকে সরানো হবে। এটিও ঘোষণা করা হবে যে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন খবরের কাগজ বের করা হবে না।

* ফৌজরা নির্দিষ্ট মিশন নিয়ে যার যার সেক্টরে যাবে - রাত ১:১০। (ফৌজদের সতর্ক করতে ড্রিল করা হবে।) হলগুলো দখল করে তল্লাশী করা হবে।



* ফৌজরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাবে - ভোর ৫:০০।

* রোড ব্লক ও নদীপথে প্রতিবন্ধক তৈরি - রাত ২:০০।

গ) দিনের বেলায় অপারেশন

* ধানমন্ডির সন্দেহজনক বাড়িগুলোতে এবং পুরনো ঢাকার হিন্দু বাড়িগুলোতেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে তল্লাশী (তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে)।

* সকল ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ (টি এন্ড টি) এবং ফিজিকাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের সকল ছাপার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

*কঠোরভাবে কার্ফ্যু জারি।

* অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার।

১২। ফৌজদের কার্যবন্টন

বিস্তারিত ব্রিগেড কমান্ডার ঠিক করবেন তবে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে:

ক) পূর্ব পাকিস্তান ইউনিটের সকল অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি নিয়ে নিতে হবে, সংকেত প্রেরণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিটসহ। শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের অস্ত্র দিতে হবে।

ব্যাখ্যা: আমরা পূর্ব পাকিস্তানী ফৌজদের বিব্রত করতে চাইনি এবং তাদেরকে এমন কাজে ব্যবহার করতে চাইনি যা তাদের জন্য সুখকর নাও হতে পারে।

খ) থানাগুলোকে নিরস্ত্র করতে হবে।

গ) ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর ডিজি (মহাপরিচালক)-কে তার অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) সকল আনসারের রাইফেলগুলো আটক করা হবে।



১৩। প্রয়োজনীয় তথ্য

ক) নিম্নিলিখিতদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য:

* মুজিব

* নজরুল ইসলাম

* তাজউদ্দিন

* ওসমানী

* সিরাজুল আলম

* মান্নান

* আতাউর রহমান

* প্রফেসর মুজাফফর

* অলি আহাদ

* মিসেস মতিয়া চৌধুরী

* ব্যারিস্টার মওদুদ

* ফয়জুল হক

* তোফায়েল

* এন এ সিদ্দিকী

* রউফ

* মাখন

এবং অন্যান্য ছাত্রনেতারা।

খ) সকল থানা ও রাইফেলের অবস্থান।



গ) শক্তিশালী কেন্দ্রসমুহ ও শহরের অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদের বাড়িসমুহ।

ঘ) প্রশিক্ষণ শিবির ও এলাকা ইত্যাদির অবস্থান।

ঙ) সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর অবস্থান যেগুলো সামরিক প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছে।

চ) প্রাক্তন সার্ভিস অফিসারদের নাম যারা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ আন্দোলনে সহযোগিতা করছেন।

১৪। কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ

দুটি কমান্ড গঠন করা হয়েছে:

ক) ঢাকা এলাকা

কমান্ডার - মেজর-জেনারেল ফরমান

স্টাফ - ইস্টার্ন কমান্ড স্টাফ / অথবা মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার

ফৌজ - ঢাকায় অবস্থান করা ফৌজ।

খ) প্রদেশের বাকী অংশ

কমান্ডার - মেজর-জেনারেল কে এইচ রাজা

স্টাফ - ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার

ফৌজ - ঢাকা বাদে বাকী ফৌজ।

১৫। ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা

ফেজ-ওয়ান থেকে ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছে। পিএএফ-সহ সকল অস্ত্র জমা করা হয়েছে।

১৬। যোগাযোগ

ক) নিরাপত্তা।



খ) বিন্যাস।

ফৌজদের কার্যবন্টন

ঢাকা

কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ: মেজর-জেনারেল ফরমান, হেডকোয়ার্টার - এমএলএ জোন-বি।

ফৌজ:

হেডকোয়ার্টার - ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেডের ফৌজ, অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (কমান্ডিং অফিসারের স্থলাভিষিক্ত হবেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল তাজ, জিএসও ওয়ান (ইন্ট)), ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট অ্যাক-অ্যাক রেজিমেন্ট, ৩ কমান্ডোর একটি কোম্পানী (কুমিল্লা থেকে)।

করণীয় কার্য:

১। ২ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের হেডকোয়ার্টার (২৫০০), রাজারবাগে রিজার্ভ পুলিশ (২০০০)-কে নিষ্ক্রিয় করতে নিরস্ত্রীকরণ।

২। এক্সচেঞ্জ এবং ট্রান্সমিটারসমুহ, বেতার, টেলিভিশন, স্টেট ব্যাংক।

৩। আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার - বিস্তারিত তালিকা ও ঠিকানা।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমুহ, ইকবাল, জগন্নাথ, লিয়াকত (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫। শহরকে রুদ্ধকরণ, সড়ক, রেল ও নদীপথসহ। নদী প্রহরা।

৬। গাজীপুরের কারখানাগুলো এবং রাজেন্দ্রপুরের গোলাবারুদের ডিপো প্রতিরক্ষা।

বাকীরা: মেজর-জেনারেল কে এইচ রাজা ও ১৪ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের অধীন।

যশোর

ফৌজ:



হেডকোয়ার্টার - ১০৭ ব্রিগেড, ২৫ বালুচ, ২৭ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্টের অংশ, ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

করণীয় কার্য:

১। আনসারদের অস্ত্র বাজেয়াপ্তসহ ১ ইস্ট বেঙ্গল ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণ।

২। যশোর শহর প্রতিরক্ষা ও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার।

৩। এক্সচেঞ্জ ও টেলিফোন যোগাযোগ।

৪। ক্যান্টনমেন্ট, যশোর শহর ও যশোর-খুলনা সড়ক, এয়ারফিল্ড ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি।

৫। কুষ্টিয়ার এক্সচেঞ্জ অকার্যকর করা।

৬। প্রয়োজন হলে খুলনায় শক্তিবৃদ্ধি করা।

খুলনা

ফৌজ:

২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স।

করণীয় কার্য:

১। শহরের নিরাপত্তা।

২। এক্সচেঞ্জ ও বেতার কেন্দ্র।

৩। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের উইং হেডকোয়ার্টার, রিজার্ভ কোম্পানী ও রিজার্ভ পুলিশের নিরস্ত্রীকরণ।

৪। আওয়ামী লীগ, ছাত্র ও কম্যুনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার।

রংপুর-সৈয়দপুর



ফৌজ:

হেডকোয়ার্টার - ২৩ ব্রিগেড, ২৯ ক্যাভালরি, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

করণীয় কার্য:

১। রংপুর-সৈয়দপুরের নিরাপত্তা।

২। সৈয়দপুরে ৩ ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্রীকরণ।

৩। সম্ভব হলে দিনাজপুরে সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও রিজার্ভ কোম্পানী নিরস্ত্রীকরণ অথবা সীমান্ত চৌকিগুলোতে শক্তিবৃদ্ধি করে রিজার্ভ কোম্পানীকে ছত্রভঙ্গ করা।

৪। রংপুরে বেতার কেন্দ্র ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

৫। রংপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের।

৬। বগুড়ায় গোলাবারুদের ভান্ডার।

রাজশাহী

ফৌজ:

২৫ পাঞ্জাব।

করণীয় কার্য:

১। বালুচের কমান্ডিং অফিসার - শাফকাতের বরখাস্ত।

২। রাজশাহীর এক্সচেঞ্জ ও বেতার কেন্দ্র।

৩। রিজার্ভ পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেক্টর হেডকোয়ার্টার নিরস্ত্রীকরণ।

৪। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ।

৫। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা।

কুমিল্লা



ফৌজ:

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১.৫ মর্টার ব্যাটারী, স্টেশন ফৌজ, ৩ কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন (কোম্পানী বাদে) ।

করণীয় কার্য:

১। ৪ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের উইং হেডকোয়ার্টার, রিজার্ভ জেলা পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণ।

২। শহর প্রতিরক্ষা এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্রদের গ্রেফতার।

৩। এক্সচেঞ্জ।

সিলেট ফৌজ:

৩১ পাঞ্জাব (কোম্পানী বাদে)।

করণীয় কার্য:

১। বেতার কেন্দ্র, এক্সচেঞ্জ।

২। সুরমা নদীর উপর কিন সেতু।

৩। এয়ারফিল্ড।

৪। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা।

৫। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেকশন হেডকোয়ার্টার ও রিজার্ভ পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণ। সিকান্দারের সাথে লিয়াজোঁ।

চট্টগ্রাম

ফৌজ:



২০ বালুচ, অ্যাডভান্স পার্টি বাদে; ৩১ পাঞ্জাবের কোম্পানী, সিলেটে যারা উপস্থিত তারা বাদে; কুমিল্লা থেকে সড়কপথে একটি মোবাইল কলামের নেতৃত্ব দিবেন ইকবাল শাফী এবং ডি-ডে-র স্থানীয় সময় রাত ১:০০ (এইচ-আওয়ার)-এ শক্তিবৃদ্ধি করবেন।

মোবাইল কলাম: ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শাফীর সাথে থাকবে ট্যাকটিকাল হেডকোয়ার্টার ও কমিউনিকেশন; ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স; হেভি মর্টার ফৌজ; ফিল্ড কোম্পানী প্রকৌশলী; ডি-ডে-র সন্ধ্যায় ফেনীর দিকে অগ্রসর হওয়া কোম্পানী।

করণীয় কার্য:

১। ইবিআরসি, ৮ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেকশন হেডকোয়ার্টার, রিজার্ভ পুলিশদের নিরস্ত্রীকরণ।

২। কেন্দ্রীয় পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র (বিশ হাজার) বাজেয়াপ্ত।

৩। বেতার কেন্দ্র ও এক্সচেঞ্জ।

৪। পাকিস্তান নৌবাহিনী (কমোডর মমতাজ)-এর সাথে লিয়াজোঁ।

৫। শায়গ্রী ও জানজুয়া (৮ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার)-এর সাথে লিয়াজোঁ, যাদেরকে ইকবার শাফী না আসা পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে আদেশ করা হয়েছে।

৬। শায়গ্রী ও জানজুয়া যদি তাদের সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে নিশ্চিত বোধ করে তাহলে তাদেরকে নিরস্ত্র করো না। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে শুধু ক্যান্টমেন্ট থেকে শহরে আসার পথে রোডব্লকে বসিয়ে রেখো, প্রতিরক্ষা অবস্থানে একটি কোম্পানী রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে ইবিআরসি ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল যদি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে তো তারা যেন আটকা পড়ে।

৭। আমি আমার সাথে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নি চ্ছি। ডি-ডে-র রাতে চৌধুরী (ইবিআরসি-র সিআই)-কে গ্রেফতার করো।

৮। উপরের কার্যগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার।



পরিশিষ্ট - ৪

আত্মসমর্পণের দলিল

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড বাংলাদেশে সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ইস্টার্ন থিয়েটারে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছে। সকল পাকিস্তান স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এবং সকল আধাসামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এই আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীগুলো তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখবে এবং বর্তমানে যে যেখানে আছে সেখানকার নিকটবর্তী নিয়মিত ফৌজ যারা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বের অধীন তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

এই দলিল স্বাক্ষর হওয়া মাত্র পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নির্দেশের অধীনে চলে আসবে। নির্দেশের অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্তসমুহের লঙ্ঘন বলে ধরে নেয়া হবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও রেওয়াজ অনুযায়ী তার ব্যবস্থা নেয়া হবে। আত্মসমর্পণের শর্তসমুহের অর্থ বা ব্যাখ্যা নিয়ে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই আনুষ্ঠানিক আশ্বাস দিচ্ছেন যে , যে সকল ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে, জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সেসব সৈন্যদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে এবং তিনি সকল পাকিস্তান সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করছেন। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বের অধীন বাহিনী দ্বারা বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের প্রতিরক্ষা করা হবে।



স্বাক্ষর:

জগজিৎ সিং অরোরা

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ

ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনী

ইস্টার্ন থিয়েটার

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বাক্ষর:

আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল

মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর

জোন বি ও কমান্ডার

ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান)

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

OXFORD PAKISTAN PAPERBACKS

Witness to Surrender

SIDDIQ SALIK

